Anjali

2025

HEARTIEST FELICITATIONS ON DURGA MATA POOJA CELEBRATIONS

ICIJ ESTB. 1921

公益社団法人 在日インド商工協会

THE INDIAN COMMERCE AND INDUSTRY ASSOCIATION JAPAN

MORE THAN 100 YEARS OF DEDICATED SERVICE

Established in 1921, ICIJ is the oldest association representing the Indian diaspora in Japan. Its membership includes several of the largest corporate groups operating in the region. As the apex body, ICIJ plays a leading role in organizing India-related trade fairs, exhibitions, seminars and symposia. The organization also hosts dynamic monthly seminars focused on a wide range of topics, including India-Japan startups, global investment opportunities, finance, mergers and acquisitions, wealth management, taxation, visa regulations and Japan's labor and legal systems.

To support the next generation, ICIJ has established a dedicated Youth Group for young Indian residents in Japan. Additionally, ICIJ has signed a comprehensive cooperation agreement wilh the Edogawa City Office and the Tokyo Chamber of Commerce, Edogawa Chapter.

President: Mr Jagmohan Chandrani, **Chairman:** Mr Ryuko Hira,
Vice president: Mr Subramania Natarajan,
Directors: Mr Satish Thiagarajan, Mrs Popi Kuroda, Mr Nitin Hingarh,
Mr Vashdev Rupani, Mr Debendra Mohanta, Mr Markus,
Internal auditor: Mr S. K Rangwani, **Auditor:** Mr VeerasureshKumar Veerappan.

EIGHT SPECIALISED COMMITTEES:

Information and communication: Mr Debendra Mohanta, Mr Satish Thiagarajan, Subramania Natarajan; **Food & agriculture:** Mr Nitin Hingarh; **Indian restaurants:** Mrs Popi Kuroda; **Legal & regulatory affairs:** Mr VeerasureshKumar Veerappan; **Indian jewellers:** Mr Alok Rakyan; **Merchandise trading:** Mr V B Rupani; **Tourism:** Mr Markus; **Youth Group:** Mr Sanjeev Gupta **Regional representatives: Kansai:** Mr Kiran Sethi; **North Japan:** Mr Dilip Mansukhani.

B-1 Yamaman Building, 6-1, Nihonbashi-Koamicho, Cho-Ku, Tokyo 103-0016, Japan
Tel: 03-3249-1080 Fax: 03-5614-0971 Web: www.icij.site Mail: info@icij.site

Durga Puja Program
September 28, 2025

Puja	*11:30 AM*
Anjali	*12:30 PM*
Prasad & Lunch	*01:00 PM*
Cultural Program	*02:30 PM*
Bisorjon and Boron	*04:30 PM*

Cultural Program

“বাংলার উৎসব, বাংলার রঙ”

To portray Bengal’s textiles, traditions through Bengal’s festivals

বাংলা মানেই উৎসবের দেশ,
এখানে প্রতিটি ঋতু, প্রতিটি মাস,
নিয়ে আসে আনন্দ আর মিলনের বার্তা।
তাই তো আছে—
বারো মাসে তেরো পার্বণ।
প্রতিটি পার্বণই আমাদের জীবনকে রাঙিয়ে তোলে।
এই তেরো পার্বণের ভেতর লুকিয়ে আছে—
আমাদের হাসি, খুশি, রঙ, আর পরম্পরা।

Participating members: Bengali Association Tokyo, Japan’s members

Program compered by Chandrima Kundu & Sangeetha Krishnamoorthy

Program coordinated by Rita Kar

Venue: Ota Ward Civic Hall Aprico, Exhibition Hall(B1F)
5-37-3 Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0052

© Bengali Association of Tokyo, Japan (BATJ). All rights reserved.
Disclaimer: The articles compiled in this magazine are personal opinion of the authors and in no way represents any opinion of BATJ

(Digital version of Anjali 2025 will be available on digital platforms & BATJ website.)

भारत के राजदूत
AMBASSADOR OF INDIA

भारत का राजदूतावास
Embassy of India
2-2-11 Kudan Minami, Chiyoda-ku
Tokyo 1020074

सत्यमेव जयते

MESSAGE

It is with great joy that I extend my warm greetings to Bengali Association of Tokyo in Japan (BATJ) in keeping up with the tradition of celebrating Durga Festival in Japan which entering into 36th Year of its continuous celebration. This festival, which celebrates the triumph of good over evil, brings together families, friends, and communities in a spirit of devotion, cultural pride, and joyous celebration.

Durga Puja is not only a time for reflection and worship but also a vibrant expression of India's rich cultural heritage. Festivals like these strengthen our bonds, foster unity, and remind us of the values of courage, resilience, and compassion that Goddess Durga embodies.

During my stay in Japan Embassy of India has taken numerous initiative to celebrate and share our rich cultural heritage with the people of Japan. I am delighted to see the enthusiasm and dedication with which the Indian community in Japan celebrates this festival every year.

I would also like to appreciate the sincere efforts taken by BATJ in releasing annual literary e-magazine "Anjali". I wish that it serve as a lasting source of inspiration, fostering connection and promoting our cultural heritage for future generations in Japan.

On this festive occasion, I extend my heartfelt wishes for happiness, peace, and prosperity to all. May the divine blessings of Maa Durga illuminate your lives with hope, strength, and joy.

(Sibi George)

Tokyo
22 August 2025

Telephone: +81-3-3265-5036; Fax: +81-3-3262-2301; E-mail: amb.tokyo@mea.gov.in; amboffice.tokyo@mea.gov.in

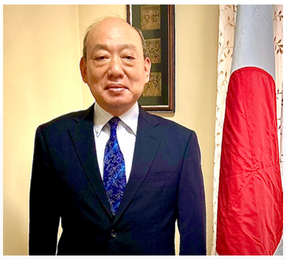

CONSULATE GENERAL OF JAPAN
55, M. N. SEN LANE, TOLLYGUNGE,
KOLKATA - 700 040

Mr. Syamal Kar, President
Bengali Association of Tokyo, Japan (BATJ)

August 14, 2025

Message

I take this opportunity to extend my heartfelt appreciation to Bengali Association of Tokyo, Japan for organizing Durga Puja celebrations in Japan for 36 years. The BATJ's Durga Puja showcases the rich cultural heritage of Bengal and highlights the talents of the artists.

BATJ has been a cornerstone of the Bengali community in Japan, promoting cultural exchange and preserving Bengali heritage. For over three decades, this association has been hosting Durga Puja events, bringing together the Bengali community and fostering a sense of belonging.

I have assumed my office here as the Consul General of Japan in May and am eagerly looking forward to visit the puja pandals and experience the flavor of Durga Puja in Kolkata.

Durga Puja has been regarded as an UNESCO Intangible Cultural Heritage due to its cultural significance and role in fostering community engagement, artistic expression, and social inclusion. This recognition highlights festival's ability to bring people together across different social and cultural backgrounds, promoting collective participation and a sense of community.

The Bengali Association of Tokyo, Japan plays a key role in preserving Bengali culture and promoting community engagement through its Durga Puja celebrations. The association's efforts have created a sense of belonging among the Bengali community in Japan, and its cultural programs have enriched the lives of many.

Japan and India are strengthening their bilateral relationship through various activities at the Expo 2025, Osaka, Kansai, Japan. Discussions on tourism, cultural exchange and economic cooperation are taking place, highlighting the growing partnership between the two nations.

I wish BATJ every success of Durga Puja celebrations, which I believe will strengthen the cultural relations between Japan and India.

Sincerely,

ISHIKAWA Yoshihisa
Consul General

সম্পাদকীয়

শরতের সোনালি আর রক্তিম আবরণে টোকিও যখন সাজতে শুরু করে, তখন ঢাকের আওয়াজ আর ধূপের গন্ধ আমাদের মনে করিয়ে দেয়—আবার এল দুর্গাপুজো। শতাব্দী আগে দেবীর আগমনী উৎসব হিসেবে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা আজ বিশ্বজুড়ে সংস্কৃতি, সহনশীলতা এবং মিলনের এক মহোৎসবে রূপ নিয়েছে। আমাদের মতো প্রবাসীদের কাছে জাপানে দুর্গাপুজো কেবল আচার-অনুষ্ঠান নয়—এটি আমাদের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার পাশাপাশি নতুন বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন গড়ারও এক অসাধারণ সুযোগ।

এই একই সংযোগের চেতনায়, এ বছর ভারত-জাপান সম্পর্কও নতুন মাত্রা পেয়েছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আর শান্তিপূর্ণ ইন্দো-প্যাসিফিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে, দুই দেশ প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্যে সহযোগিতা আরও গভীর করেছে। ভারতের উন্নয়নযাত্রায় জাপানের ভূমিকা—হাই-স্পিড রেল থেকে শুরু করে সবুজ জ্বালানির উদ্যোগ—আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হলো সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫, যেখানে জাপানের উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি মিলিত হচ্ছে ভারতের বৈশ্বিক সেমিকন্ডাক্টর হাব হয়ে ওঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে। এটি কেবল অর্থনৈতিক সাফল্য নয়; বরং এ অংশীদারিত্ব আজকের অস্থির বিশ্বে স্থিতিশীলতার এক শক্তিশালী প্রতীক।

তবু, যখন বন্ধুত্ব দৃঢ় হচ্ছে, তখন বৃহত্তর বিশ্ব অস্থিরতার মধ্যে পথ খুঁজছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এখনও চলছে, যা ইউরোপের জ্বালানি নিরাপত্তাকে নতুনভাবে রূপ দিচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য বারবার সংঘাতে কাঁপছে, যার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে বৈশ্বিক বাজারে। দক্ষিণ চীন সাগর রয়ে গেছে উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু, যা আন্তর্জাতিক নিয়মকে বারবার পরীক্ষা করছে। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জলবায়ু সংকট—যার তীব্রতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এশিয়ার বন্যা, উত্তর আমেরিকার দাবানল, রেকর্ড ভাঙা তাপপ্রবাহ, আর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে প্রকৃতির ক্রোধ কোনো ভূরাজনৈতিক ঝড়ের চেয়েও ভয়ংকর হতে পারে।

তবুও, এই অনিশ্চয়তার মাঝেও আশা রয়ে গেছে। নবায়নযোগ্য শক্তি, সবুজ হাইড্রোজেন আর চক্রাকার অর্থনীতিতে বিনিয়োগ আমাদের সামনে আলো দেখায়, প্রমাণ করে যে মানবজাতির উদ্ভাবনী ক্ষমতা এখনো অপরিসীম। ভারতও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মহাকুম্ভ মেলা ২০২৫—যা বিশ্বের বৃহত্তম মানবসমাগম—বিশ্বাস ও ঐক্যের এক অনন্য প্রতীক হয়ে উঠেছে, এমন এক সময়ে যখন পৃথিবী তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অনুভব করছে।

এ বছর জাপানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এক্সপো 2025 ওসাকা, যেখানে বিশ্বের দেশ গুলোকে একত্রিত করেছে "Designing Future Society for Our Lives" থিমের অধীনে। এখানে উদ্ভাবন আর উন্নয়ন একসঙ্গে মিলিত হবে—যা দুর্গাপুজোর চিরন্তন বার্তার সাথেই মিলে যায়: নবীকরণ, সহনশীলতা আর আশা। অনেক দিক থেকেই আজকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগ যেন আধুনিক রূপে সেই পুরনো যুদ্ধ—অসুর আর দেবীর সংঘাত। বেপরোয়া শক্তি আর প্রজ্ঞার লড়াই। আজ আমরা কিভাবে এআই-কে গড়ে তুলব, তাই নির্ধারণ করবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভাগ্য।

দুর্গাপুজো আমাদের শেখায় যে, শুভ শক্তির জয় আর অসুরের পরাজয় কেবল পুরাণের গল্প নয়—এটি এক চিরন্তন আহ্বান, সাহস আর সহনশীলতার প্রতীক। দেবীর বিজয় উদযাপনের এই সময়ে আমরা প্রার্থনা করি, মা দুর্গা যেন আমাদের শক্তি দেন বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়, প্রজ্ঞা দেন শান্তি রক্ষায়, আর সৃজনশীলতা দেন মানবতার মঙ্গলের জন্য উদ্ভাবনে।

আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই সকল বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ীদের। দুর্গাপুজো আনন্দ বয়ে আনুক আপনাদের পরিবারে, সাফল্য আসুক আপনাদের প্রচেষ্টায়, আর সমন্বয় বিরাজ করুক আমাদের সমাজে, পৃথিবীর সর্বত্র।

শুভ শরদীয়া!

Anjali 2025

Table of Contents

12 CENTENARY COMMEMORATION OF BHAGAWAN SRI SATHYA SAI BABA
-Ryuko Hira, Srivats Aiyer,Sai Aditya Mosalakanti

15 স্মৃতি
-পূর্ণিমা ঘোষ

16 আজকের বাঁশি
- তপন কুমার রায়

17 'আশি'র পর যাদের আঠেরো হল
- বাণীব্রত গোস্বামী

20 প্রকৃতি ও ঈশ্বর
- সঞ্চিতা ভট্টাচার্য সেনগুপ্ত

23 দোপাটির বীজ
- তন্ময় ঘোষ

24 মাথার ব্যায়াম
- চন্দ্রিমা কুণ্ড

25 ভারতের অবদান
- আশা দাস

26 চিরস্থায়ী প্রেম
-সমর মুখোপাধ্যায়

28 চলবে চলবে
- শঙ্কর বসু

28 ছেলেবেলা
- অভিজিৎ রায়

29 পেতলের পরী
- ইমরোজ নাওয়াজ রেজা

30 আনো শান্তির বাণী
- বিশ্বনাথ পাল

31 পথের রহস্যে আতঙ্কিত ক্ষুদ্দা
- অনুপম গুপ্ত

33 ভারত তীর্থ
- মিত্রা মুখার্জি

34 প্রার্থনা
- মানিকচন্দ্র ঘোষ

35 আমাদের দুর্গা
- শুভা কোকুবো চক্রবর্তী

36 একলা চলো রে
- জলি চক্রবর্তী শীল

40 চখাচখী
- নয়ন বসু

46 দাদামশায়ের স্বর্গলাভ
- শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

50 ভরা থাক স্মৃতি সুধায়
- রাজা মুখার্জ্জী

53 If the Purpose of Your Becoming a Monk Is Pumpkin-cutting....
- Swami Medhasananda

55 They alone live, who live for others
- Swami Divyanathananda

58 Reflecting on our past and looking ahead
- Sudeb Chattopadhyay

63 Lotus Viewing at Sankeien: A Garden in Yokohama for All Seasons
-Rita Kar

64 The cherry tree grows on you
-Ambassador Sanjay Bhattacharyya

66 Devi Sukta of Rig Vida
- Devajyoti Sarkar

68 The Power Of Miracles -
-Shoubhik Pal

70 Healing
- Shruti Upadhaya

72 Ridges, ravines and valleys
- Subhajit Deb

75 To My Mother
- Mita Mukhopadhaya

77 Proposal to install the Bust of Shri RashBehari Bose
-Rohan Agrawal

79 Rash Behari Bose & the Nakamuraya's Curry ~ Bringing A New Flavour to Our History ~
- Ashok Karmokar

81 Can we provide clean air for the residents of India and South Asia
- Prabir K Patra

83 Ritwik Ghatak: Cinema and Life
- Kalaswan Datta

85 Down the Rabbit Hole
- Joyita Basu Datta

87 Sisterhood
- Udita Ghosh

88 A Bench 'Mark'
-Piali Bose

89 Twenty-five years of Tokyo (2000-2025)
- Sulata Maheshwari (Maiti)

91 Whither Vishvaguru
- Viswa Ghosh

94 Moments and Memories from Osaka
- Anindita Datta

97 HIROSHIMA: THE PHOENIX CITY
- Dr. Suchandana Bhattacharyya

98 Bordi
- Sougata Mallik

101 Ma Durga, Mahishasura, and the Making of Modern Bengal's Grandest Festival
- Ishita Roy

103 **Kids Article**

119 ルンギー
- ロイ れい子

120 身近に感じるインドの味
- 神田 みつ子

122 防災視点で考える風呂敷きの使い方
- しずくまゆみ

123 タゴールと津田梅子
- 佐々木 理香

124 कुछ ग़ज़लें
- मनमोहन साहनी

127 यादों का गुलदस्ता
- त्रिभुवन खन्डेलवाल

128 विश्व प्रदर्शनी एक्स्पो
- शाँग्रीला जैन

130 **Art Work**

135 **Kids Brush Work**

140 **Photograpghy**

Editorial

As the autumn breeze drapes Tokyo in shades of gold and crimson, the sound of the dhaak and the fragrance of dhunuchi gently remind us that Durga Puja is here once again. What began centuries ago as a festival of the Goddess's homecoming has, over time, blossomed into a global celebration of culture, resilience, and togetherness. For us in Japan, Durga Puja is more than rituals—it is a way to carry forward our heritage while building new bridges of friendship in the land we now call home.

In that same spirit of connection, this year has also been remarkable for India–Japan relations. The two nations, guided by shared democratic values and a vision of a peaceful Indo-Pacific, have deepened their collaboration in technology, defense, and trade. Japan's role in India's growth story—whether through high-speed rail projects or green energy initiatives—has been pivotal. A shining example is Semicon India 2025, where Japan's expertise in advanced manufacturing meets India's ambition to become a global semiconductor hub. This convergence is not just an economic milestone; it also reflects how our partnership is shaping global stability at a critical time.

Yet, while friendships strengthen, the wider world continues to face turbulence. The Russia–Ukraine war grinds on, reshaping Europe's energy security. The Middle East struggles with recurring conflicts that ripple across global markets. The South China Sea remains a flashpoint, testing international order. And layered upon these challenges is the climate crisis—unrelenting in its urgency. Record-breaking heat waves, floods in Asia, wildfires in North America, and rising sea levels remind us that nature's fury can be as disruptive as any geopolitical storm.

Amid this uncertainty, there are still reasons for optimism. Investments in renewables, green hydrogen, and circular economies offer glimmers of hope, showing that humanity has the capacity to innovate its way forward. India, too, has been stepping up with confidence. The Maha Kumbh Mela 2025, the largest gathering of humanity, stood as a powerful symbol of faith and unity at a time when the world needs it most.

This year, the spotlight also turns to Japan, where Expo 2025 in Osaka will bring nations together under the theme of "Designing Future Society for Our Lives." It will be a platform where innovation and sustainability converge—echoing the very essence of Durga Puja: renewal, resilience, and hope. In many ways, the age of Artificial Intelligence feels like a modern version of the age-old battle between asur and devi—between reckless power and enlightened wisdom. The choices we make today in shaping AI will define the destiny of generations to come.

Durga Puja, at its heart, reminds us that the triumph of good over evil is not just a mythological tale but a timeless call for courage and resilience. As we celebrate the Goddess's victory, may Maa Durga bless us with the strength to face global challenges, the wisdom to nurture peace, and the creativity to use innovation for the benefit of humanity.

With these thoughts, we extend our warmest wishes to all devotees, friends, and well-wishers. May this Puja bring joy to your families, success to your endeavors, and harmony to our communities across the world.

Shubho Sharodiya!

A3K
BIRTHANNIVERSARY OF TAGORE- 2025
BENGALI ASSOCIATION OF TOKYO, JAPAN (BATJ)

CENTENARY COMMEMORATION
OF
BHAGAWAN SRI SATHYA SAI BABA
1926-2026

Ryuko Hira
Srivats Aiyer
Sai Aditya Mosalakanti

As we celebrate the Centenary of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba's advent as Poorna Kaliyuga Avatar, we bow in reverence to the divine life and teachings of Lord Sai who walked among us as Love incarnate.
Born on November 23rd, 1926, in Puttaparthi, India, Bhagawan Baba's life was dedicated to the spiritual upliftment of humanity through selfless service, love, and unity of all faiths.
Sri Sathya Sai Baba declared his advent in 1940, at the age of 14. Since then, he has called upon mankind to LOVE ALL, SERVE ALL and HELP EVER, HURT NEVER!
Today, millions of devotees have been touched and transformed by Bhagawan Baba. Each devotee has a unique connection with Baba.

To a spiritual aspirant, He is the Divine Master; to a rationalist, He is the most inspiring humanitarian on earth; to thousands of modern youth, He is the leader with a dynamic vision and a colossus of inspiration; to a devotee, He is simply divinity in human form; and to everyone who has had the opportunity to behold Him, He is embodiment of Pure Love.

The decades that have rolled by since Baba's declaration of his mission at 14 years of age have been witness to the grand manner in which His vision has taken shape.

The world-class super-speciality hospitals that offer medical care, free of charge; schools and colleges that impart free values-based education, the mammoth drinking water supply projects and numerous other service projects are Bhagawan's blessings of Love to the world.

The Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences (SSSIHMS) in Puttaparthi was inaugurated in 1991 by then Prime Minister P. V. Narasimha Rao, followed by the opening of the Whitefield (Bengaluru) branch in 2001 by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. These state-of-the-art hospitals offer world-class tertiary care in cardiology, neurology, urology, ophthalmology, and orthopaedics—entirely free of cost.

Together, they have served over 5 million patients and performed more than 100,000 major surgeries, standing as a testament to Bhagawan Sri Sathya Sai Baba's vision of compassionate and accessible healthcare for all. However, even more, significant than these activities have been His tireless efforts towards spreading the message of spirituality and inculcating love and brotherhood throughout the world.

The Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning (SSSIHL), (Website: www.sssihl.edu.in) established in 1981, has a 44-year legacy of academic excellence, integrating ethics and values as the undercurrent of every subject taught at the university. Its annual Convocation is graced by esteemed dignitaries, including the Presidents, Prime Ministers, and other prominent Indian luminaries.

The Sri Sathya Sai Drinking Water Supply Projects, launched across drought-prone regions in Andhra Pradesh, Telangana, and Tamil Nadu, have brought safe, clean drinking water to over 10 million people. These massive infrastructure efforts, executed without seeking government aid, stand as a silent revolution in rural upliftment and public health, embodying Bhagawan's love in action.

Baba declares:
There Is Only One Religion, The Religion Of Love;
There Is Only One Language, The Language Of The Heart;
There Is Only One Caste, The Caste Of Humanity;
There Is Only One God, He Is Omnipresent.

While Bhagawan Sri Sathya Sai Baba's main Ashram is in Prashanthi Nilayam in the city of Puttaparthi in Southern India, His divine love and universal message has drawn devotees from all over the world. Today there are over 120 Sri Sathya Sai global missions in more than 100 countries.

The Sathya Sai Organization in Japan (SSOJ) (Website - https://www.sathyasai.or.jp/) was established 50 years ago in May 1975 with the blessings of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. It began with regular bhajans and devotional activities in Kobe, while spiritual literature like the Sanathana Sarathi and 37 Volumes of Sathya Sai Speaks lectures, were translated in Japanese which are placed in the National Diet and other public libraries throughout Japan.

Soon, the Organization grew steadily across the country. Over the years, conferences, public meetings, study circles, value-based dramas, and Sadhana camps like Bal Vikas, Youth Group and Sai Ladies Group were being held held to deepen spiritual understanding and unity.

Today, there are 27 active Sai Centres and Groups in the major cities of Japan. The Organization functions to spread Bhagawan's Divine Message of Sanathana Dharma to devotees in Japan. The Organization functions in both English and Japanese, with a dedicated website, publications, and Bhajan and Vedam resources. Special efforts to promote Japanese bhajans have led to widespread participation and growing devotion among members.

To this day, SSOJ continues Baba's work through voluntary activities such as preparing and distributing food for the homeless, organizing blood donation camps, offering aid during natural disasters, and holding regular bhajan sessions and commemorating festivals.
In fact, Bhagawan has lovingly showered his blessings upon Japan by way of a miracle.

In preparation for the Maha Shivaratri Akhanda Bhajan 2024 in Tokyo, alumni-devotees of Bhagawan's University in India residing in Japan prayed for Bhagawan's benediction of a 'Sai Shiva Lingam' for Japan, pledging daily worship and sanctity. On February 21st, 2024, at 08:00 AM IST, their sealed prayer letter was placed at a pious family altar in Mumbai. On February 22nd, 2024, at 05:00 PM IST, a flash of golden light pierced the transparent, sealed box, accompanied by a resounding sound.

The Sai Shiva Lingam manifested, so large it broke open the cover. Three Golden Shiva idols appeared, followed by a mound of holy Vibhuti within which Divine Golden Padukas emerged. Eight more Shiva idols formed around the Padukas, four on each side, as powerful vibrations of His Presence pervaded. The box was finally showered with Vibhuti from the Lingam's crest—a symbol of Baba's love for Japan.

The Shiva Lingam is currently placed at the Tokyo Sai Center and daily worship at 07:00 AM every morning. As part of the Centenary celebrations, a group of Japanese devotees visited Prasanthi Nilayam in April 2025 to offer their love and gratitude at the Divine Lotus Feet on the occasion of Japan Day.

Sri Sathya Sai Japan Day was commemorated on April 3rd, 2025, at Prashanthi Nilayam to mark: Centenary Year of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba; 50th Anniversary of the Sathya Sai Organization Japan and ;10th Anniversary of the MoU between SSSIHL and Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST).
His Excellency, Keiichi Ono, Ambassador of Japan to India attended the event in-person at Prashanthi Nilayam.

The devotees offered a cultural presentation and a drama called 'The Golden Bridge' depicting the miraculous materialization of the Sai Shiva Lingam, which deeply touched the hearts of all present.

On April 22nd, 2025, New York City Mayor Eric Adams officially proclaimed April 24th, 2025, as 'Sri Sathya Sai Baba Centennial Celebrations Day', honouring His message of universal love and selfless service. The Mayor also acknowledged the impactful contributions of Sai volunteers in the U.S. and the leadership of the Sri Sathya Sai Central Trust. This recognition reflects Bhagawan's vision of global unity, service, and spiritual harmony.

To mark the Birth Centenary of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, the Government of India issued a ₹100 Commemorative Coin on April 22nd, 2025. The coin features a portrait of Baba with the years 1926–2026 and honours His legacy of love and service. Made of a silver alloy, it was officially notified by the Ministry of Finance (The Gazette of India - CG-DL-E-22042025-262606) and adds to India's prestigious centenary releases.

As part of the Centenary commemorations, on June 20th, 2025, an INDIA-USA-JAPAN Medical Seminar was held in Tokyo, Japan, featuring Dr. V. Jeevanandam, from the University of Chicago Medicine, Dr. Anil Kumar Mulpur and Dr. D.C. Sundaresh from the Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences. They spoke on promoting medical collaboration and highlighted how Bhagawan's hospitals in India provide high-quality medical care completely free of cost, serving as a model of compassionate healthcare for the world.

As we joyfully celebrate the Centenary of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, we also commemorate the 50th anniversary of the Sri Sathya Sai Organization in Japan. Through selfless service, devotion, spiritual education, and unity, we continue to walk on the path shown by Baba — to Love All And Serve All.
Sai Ram!

স্মৃতি

পূর্ণিমা ঘোষ

শরতের শীতল বাতাস, যখন ছুঁয়ে যায় আমায়,
স্মৃতিগুলো নড়ে ওঠে, টলমল শিশিরের মতো হয়ে।
সেই ছেলেবেলার মুখ গুলো সব
ভেসে ওঠে মনে ছায়াছবির মতো,
উদাস করে আমায়।
সেদিনের পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্ব,
ছন্নছাড়া হাসি, কান্না, ব্যার্থতা, সফলতা,
ছড়ায় সুবাস, শিউলির মতো আমার হৃদে।
সে সব ক্ষণস্থায়ী মহূর্ত্ত, চিরস্থায়ী মোর স্মৃতিপটে।

ফিরে পেতে চাই, যদিও জানি, ফিরবে না সে অতীত।
সে ছেলেবেলা, সে ছেলেখেলা,
সেদিনের অর্থহীন দ্বন্দ্ব, ফিরবে না কিছুই,
পাবো না ফিরে, সে তুচ্ছ অমূল্য অনুভূতি।
সে দিনের সবাই কে কোথায়? জানিনা।
শুধু জানি, সে অতীত অমৃতসম, অমর,
চিরসজীব, প্রাণবন্ত, নিস্পাপ নিষ্কলুষ।

ফিরে না পাওয়া, সে মধুর বিদুর দিনগুলো,
স্বজন হারানো বেদনার সমতুল।
তাই, প্রশ্ন জাগে, স্মৃতি কি শুধুই বেদনার?
উত্তর জানিনা, জানিনা, স্মৃতিচারণ অর্থহীন কিনা?
তবুও স্মৃতি কেই আঁকড়ে ধরি;
সে যে আমার একান্ত নিজের, নিজের ইতিহাস,
তাই বুঝি, সে আমার কাছে মূল্যাতীত।

আজকের বাঁশি

তপন কুমার রায়

হ্যারিসন রোডে এক ভোরবেলা
দোয়েল কোকিল আর শালিখের আখড়ায়
হতবাক হরিপদ
রাস্তা হারিয়ে খুঁজে ফেরে
'লোহার গরাদ দেওয়া'
একতলা বাড়ি।
ভুলে যাওয়া ঠিকানাটা
ঝপ করে মনে পড়ে
কিনু গোয়ালার গলিতে-----।।

শালিকের ঝাপটানি
থেমে যায়
কোকিলের ডাকে
থমকে দাঁড়িয়ে দেখে হরিপদ ---
ভিস্তির জল দেওয়া
চকচকে রাস্তার পিচে
গম খাওয়া পায়রা-রা
গুলতানি করে ।।

হরিপদ কেরানির একতলা ঘরে
তালা দেওয়া
দরজার ফাঁকে
ঘোরে ফেরে বেড়ালের দল –
টিকটিকি বিনা অধিকারে
দেয়াল দখল নেয়,
একলাটি ঝুলে থাকে
গনেশের পট
মুখ ভার করে ।।

জল ঝরা বর্ষায়
আপিসের ট্রামে
মাইনেতে জরিমানা দেওয়া
ফুটো ছাতা বগলেতে নিয়ে
হরিপদ বসে থাকে জানলার ধারে।
পেছনে রইল পড়ে
মরে যাওয়া বেড়ালের ছানা
কাঁঠালের ভুতি মেখে
ডাস্টবিনে গলিটার কোণে ।।

সকালটা সরে গেলে
এক লাফে
দুপুর বিকেল
পেছনে রইল পড়ে
এক থালা রোদ্দুর
বেচারার মত --
সরে পড়ে গুটি গুটি
চোরের মতন
সন্ধ্যের আগে ।।

রাস্তার গ্যাসবাতি সন্ধ্যের মুখে
আঁধার বাড়িয়ে জ্বলে ওঠে
কান্ত বাবুর ঠোঁটে
কর্ণেটে বেহাগের সুর ।
বেরসিক গোপিকান্ত, আপিসের সাজে
রং করা চুল নিয়ে টেরি কেটে
বসে থাকে
এক বাটি মুড়ি মাখা
রসিকতা নিয়ে।।

কিনু গোয়ালার গলি
স্তব্ধ হয়
মাঝ রাতে কুকুরের ডাকে –
হরিপদ চলে যায়
স্বপ্নের দেশে
আকবর বাদশার পাশে
তানসেন সুর ভাঁজে
বারোয়াঁর রাগে ।।

যমুনা ধলেশ্বরী
ছেঁড়া ছাতা – রাজছত্র
একাকার বিরহের রাগে –
নহবত থেকে
ভেসে আসে
একটানা বেহাগের সুর ।
হরিপদ বাঁশি নিয়ে
নৌকার দাঁড়ে
টান দিয়ে চলে যায়
দূর বহু দূর ।।

‘আশি’র পর যাদের আঠেরো হল

বাণীব্রত গোস্বামী

আমাদের বেড়ে ওঠা আশির দশকে সুনীল গাঙ্গুলী’র সাহিত্যের হাত ধরে। আবার মন খারাপ হলে বা কখনও খুব প্রেম পেয়ে গেলে, জয় গোস্বামীর কবিতার সুতো ধরেও আকাশে উড়েছি। বিরহের ব্যথা প্রশমিত করেছি সেইসব কবিতার ঘরে। সে এক অদ্ভুত সাহিত্য ভাঙার দিন। মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ছেড়ে কবিতা বেরিয়ে আসছে, এক অন্য জগতে। যেখানে ভাবই শেষ কথা। তার অর্থের মধ্যেই ছন্দ। শব্দচয়ন আর ভাবনার মধ্যেই ছন্দমিল। সাহিত্য নেমে এসেছে বাস্তবের মাটিতে। মনে হত, যেন পাশের বাড়ির গল্প। যেন চেনা কোনো প্রেম! বড় মাটির কাছাকাছি চলে এল সাহিত্য। একইসাথে রাজনীতির হাত ধরে পাল্টাতে লাগল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট। দিক বদলানো চাঁদের মত রাতকে দিন করে দিল নতুন স্বপ্ন। সাধারণ মানুষ যেন মনে করল, সে শাসকের দলে, শাসনের একটা অংশ। একটা অদ্ভুত বিশ্বাস জন্মাল গণতন্ত্রের ওপর। মানুষকে এক ইন্দ্রজালের আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে বোঝানো হল ডানদিকটাই এখন বামদিক। সেই স্বপ্নেই বুঁদ হয়ে কেটে গেল দু-দশক। আমরা বড় হয়ে গেলাম। দলে দলে মানুষ মফঃস্বল ছেড়ে কোলকাতামুখী হয়ে উঠল। সবার চোখেমুখে একটা উন্নয়নের উচ্চাশা। শহুরে শিক্ষায় ছেলেমেয়েকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যাশা। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরেজি পড়ে এক পঙ্গু শিক্ষাব্যবস্থার সামিল হয়ে গেলাম আমরা। মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ অন্য ভাষাকে অবহেলা করা নয়। ফল যা হবার তাই হল। বন্ধ হল ভিনরাজ্য বা বিদেশের দরজা। বাড়ল বেকারত্ব। চওড়া হল ঘুনপোকাদের মিছিল। সমাজবাদ শক্তিশালী হল। কিন্তু হায়! ঘরে বাইরে সমাজটাই ভেঙে গেল। সেই কথা নিয়েই আজকে লিখব।

আমরা বড় হয়েছি উত্তর কোলকাতায়। সেখানে দু’রকম যৌথ পরিবার দেখেছি। এক হল বনেদী বাড়ির একান্নবর্তী পরিবার। আর অপরটি অনাত্মীয়দের মধ্যে পাঁচ ভাড়াটের বাড়িতে এক অদ্ভুত ভালোবাসার টান। পাতিয়ে নেওয়া মাসি পিসি। গড়ে তোলা সব কাকা মামা। তারা যে নিজের রক্তের নয়, সেটা যে বয়সে গিয়ে বুঝলাম, তখন তারা মনের এত গভীরে চলে গেছে, যে সেটা রক্তের সম্পর্কের উর্দ্ধে। আমরা থাকতাম সেরকমই এক পাঁচ ভাড়াটের বাড়িতে। মাঝখানে উঠোন। তার চারপাশ দিয়ে ঘর। আজকের ফ্ল্যাটে যখন দেখি স্বামীর আর স্ত্রীর টয়লেট আলাদা। মনে মনে হাসি। দরজায় লেখা ‘হি’ আর ‘সী’। একই জীবনে আর কত কী দেখব! তখন আমাদের ‘বাথরুম’ ছিল ‘কলতলা’। একদম সকালে যে জলটা আসত, সেটাকে ডালে’র জল বলতাম। তাতে ডাল ভালো সেদ্ধ হত। একই কলতলায় বাড়িশুদ্ধ সব লোক যেত। টিনের দরজায় ধাক্কাধাক্কি-ও প্রচুর হত। ত্যাগের জায়গায় বেশি খরচ করাটা সেকালে অপচয় মনে করত মানুষ। অনেক স্বচ্ছল বাড়িতেও দেখেছি নারকেল তেলের কৌটো কেটে স্নানের মগ। অথচ তাদের কোনো ব্যাঙ্ক লোন্ বা ক্রেডিট কার্ড ছিল না। এখন সব উল্টো। ফানুসের মত। ক্রমশ ওপরে উঠছে, অথচ নীচে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। ফাঁকা কলসীর আওয়াজের মত। সব আছে, অথচ কিছুই নেই। আসলে সেই গাড়ীর মত, যার হর্ণ ছাড়া সবই বাজে।

আবার ফিরে আসি সেই ভাড়াটে বাড়ির কথায়। দোতালায় যারা থাকত তারা সব ওপরের মাসি, ওপরের পিসি। কোণার ঘরে কোণা কাকি। এছাড়াও লজেন্স দাদু, আচার দিদা আরও কত সম্পর্ক সেকালে ছিল। এসব আজকের সমাজে অচল শব্দ। আর সব পাড়াতেই একটা আন্তর্জাতিক মামা বা কাকা থাকত। বাবা-ও মামা বলে, ছেলেও বলে। কিন্তু সব মিলিয়ে পারস্পরিক বন্ধনটা ছিল মজবুত। মোবাইল ছিল না, তবু খবর ছড়াতো বাতাসের আগে। কেউ মারা গেলে একটা ম্যাটাডোরে হত না। এখন তো কাচের গাড়িতে কে যাবে, সেই নিয়ে ঠেলাঠেলি হয়। মানুষ অনেক সরে গেছে মানুষের থেকে। মানুষের পাশে মানুষ হয়ে দাঁড়ানোর আর কেউ নেই। সেটা আরও ভালো বুঝলাম, যখন বিশের পাশে বিশ বা বিষ এসে দাঁড়াল। এখন hbd আর rip’র যুগ। আমরা এদিন আগে দেখিনি। প্রতিটা পাড়ার রক আর চায়ের দোকান ছিল সংস্কৃতির পীঠস্থান। সাহিত্য, নাটক, গান, খেলা, রাজনীতি সব নিয়ে এক জমজমাট বৈঠক বসত। অনেক তাবড় সেমিনার-ও তার কাছে হার মানবে। মনে হত শুধু দেশ কেন? সারা পৃথিবী এরা চালাতে পারবে। আমরা এসব শুনতাম দোকানে যাওয়ার পথে। তখন আমাদের দোকানে যাওয়ার খুব আগ্রহ ছিল। কারণ দোকানে গেলেই ঘুষ পেতাম। সে লজেন্স হোক বা হজমী, ঐ অল্পেই ভীষণ খুশি হতাম। কোনো অল্পবয়সী এ-লেখা পড়লে ভাববে, মিথ্যে কথা। বলবে, দূর...! এ আবার হয় নাকি? কিন্তু সত্যিই রোল, চাউ, এসবের নাম শুনিনি আমরা আশির দশকে। আর ক্যাডবেরি, দামী আইসক্রিম, কেক, পেস্ট্রি কোনো সময় ধর্মতলায় ঠান্ডা কাচের ওপারে দেখেছি। জানতাম যারা শুধু গাড়ি চড়ে, তারা ওগুলো খায়। তবে হ্যাঁ, পুজোর সময় চপ, কাটলেট, ফিসফ্রাই এসব খেয়েছি। এখন পাড়ায় পাড়ায়, অলিগলিতে যেভাবে বিরীয়ানির দোকান গজিয়ে উঠেছে, মোগলরা দেখে গেলে সত্যি-ই খুব খুশি হতেন। আমাদের ভালো-মন্দ বলতে ছিল, খাসির মাংস, ভেটকি মাছ, ইলিশ, চিংড়ি, চিতল এইসব। রসিয়ে কষিয়ে রান্না। আর তার সাথে জমিয়ে আড্ডা। মহাষ্টমীর সকালে লুচি ফুলকপি ছিল স্ট্যাটাস্ সিম্বল্। জন্মদিনের স্নেহ ছিল, মায়ের হাতের পায়েসে। কোনদিন কেক্ কেটে মায়ের কাছে হ্যাপি বার্থ-ডে শুনিনি। কিন্তু জন্মের সময় জীবনে হয়তো একবারই মা আমার কান্না শুনে হেসেছিলেন। তারপর যতদিন বেঁচে ছিলেন, কোনদিন কাঁদতে দেন নি। যেদিন চলে গেলেন, সেদিন আবার কেঁদেছিলাম। সেইসব মায়েদের ক্যাডবেরি ঘুষ দিয়ে মাতৃত্ব আদায় করতে হত না। তাদের রান্নায় অপত্য স্নেহ ছিল, গায়ের গন্ধে ‘মা’ কথাটা লুকিয়ে থাকত। তারা চোখের ভাষা পড়তে পারত। আবার একটা অদ্ভুত মমতা-মাখা কঠিন শাসন-ও ছিল। জ্ঞান ছিল কম, কিন্তু ভরসা দেবার ক্ষমতা ছিল অসীম। ‘মা’ অর্থ ছিল এক আত্মবিশ্বাস, এক নির্ভয় আশ্রয়। আবার সবকিছু স্বীকারোক্তির জায়গাও বটে। তবে বাবা তখনও বন্ধু হয়ে ওঠেনি। সেকালের বাবারা একটু দূরত্ব রেখেই চলতেন। সন্তানদের ওপর প্রচন্ড ভালোবাসার টান থাকত, কিন্তু বুঝতে দিতেন না। মাসমাইনের দিন হাতে করে ভালো খাবার, মানে সিঙাড়া, মিষ্টি এসব নিয়ে আসার চল ছিল তখন। আর মেজাজ খুব ভালো থাকলে, মানে মাইনে বাড়লে বা প্রমোশন হলে, মোগলাই, কবিরাজি-ও আনতে দেখেছি।

এবার আসি পারিপার্শিক কথায়। কত মানুষের কোলে পিঠে চড়ে যে বড় হলাম তার হিসেব নেই। তাদের ভুলি কী করে! ভেসে ওঠে সেসব মুখ। মনে পড়ে, স্কুলের মাঠে খেলার পর রক্তাভ মুখ মুছিয়ে দিয়েছিল সন্তান-স্নেহে কোনো এক বন্ধুর মা। তাঁর জন্যও কখনও চোখ ভেজে। কোনও বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে অতি তুচ্ছ খাবার যে পরম আদরে খেয়েছি, তার স্বাদ আজকের সমাজে বিরল। নতুন শতাব্দীর মেকি লৌকিকতায় এসব দুষ্প্রাপ্য। সন্ধের পর রাস্তায় বেরোলে, পাড়ার জ্যাঠা কাকারা-ও প্রশ্ন করত। তবে শুধু শাসন নয়, বিপদে পড়লে তারা বুক দিয়ে আগলাতো। বাটি করে তরকারি চালাচালি হত। ভাড়াটেরা আবার একজন আরেকজনের কাজে অনেক সময় হাত লাগিয়ে দিত। দুঃখ আনন্দ সব অনাত্মীয় হলেও ভাগ করে নিত সমানভাগে। আমরা ছোটরা সব ভাড়া বাড়িতে ভাইবোনের মত বড় হয়েছিলাম। আমাদের ঘুম ভাঙত আকাশবাণীর সুরে। মনে পড়ে শতরঞ্জিতে বসে চিত্রহার, চিত্রমালা আর শনি রবিবারের সিনেমা। টিভিতে কোনো 'অথবা' ছিল না। তবু আনন্দ ছিল। এখন অগুন্তি চ্যানেল। মানুষ তা-ও বসে শুধু সংবাদ মাধ্যমে ঝগড়া দেখে। বন্ধুদের পরিবার আত্মীয় হয়ে উঠেছিল। অনেক গোপন কথা পরস্পরকে বলে হালকা হত তারা। এত ব্যক্তিগত জীবন তখন ছিল না। সবটাই সামাজিক।

বনেদী বাড়িতে আবার অন্য এক চিত্র। সকলেই কিছু না কিছু ত্যাগ করে, এক হাঁড়িতে থাকার আনন্দ উপভোগ করতো। বাড়ির বৌরা হয়তো সকালে ঝগড়া করল, তারপর দুপুরে গোল হয়ে বসে ঠাট্টা-তামাশা করত। তবে একটু পরচর্চা, পরনিন্দা-ও হত। ওটাই তখন তাদের বেঁচে থাকার রসদ ছিল। এসবের মধ্যেই হঠাৎ ঢুকে পড়ল কম্পিউটার। তার সঙ্গে উচ্চাশা আর প্রতিষ্ঠা পাওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। পরবর্তী প্রজন্মকে মানুষ করতে হলে, ছোট পরিবার নাকি প্রয়োজন। এই বীজ সবার মধ্যে বপন হতে লাগল। এক বিচিত্র ধ্যান-ধারণা। 'মানুষ' কথাটা অনেক বড়। সেই 'মানুষ' হওয়া কী অত সহজ! মানুষের থেকে দূরে সরে গিয়ে কি মানুষ হওয়া যায়? একটা শৈশব শুধু বাবা-মাকে দেখে বড় হয়ে ওঠা। এ অসহ্য! এতো এ্যাকোরিয়ামের মাছ। কোনদিন জীবন সমুদ্রে সাবলীল হতে পারবে না। যে যার নিজের মত গুছিয়ে নিতে লাগল। ভাঙল একান্নবর্তী সংসার। পাঁচ ভাড়াটের বাড়ি ছেড়ে লোকে ছোট্ট গন্ডীর ভাড়া বাড়ি খুঁজতে লাগল। ওতেই নাকি সংসারের মঙ্গল। চিরকালের মত হারিয়ে গেল কত অনাত্মীয়ের হাসি, আদর, বকুনি আর অপার স্নেহ। তাতে হয়তো সুখের মুখ দেখল, কিন্তু দারিদ্র-বিলাস আর থাকল না। কষ্ট করে মিলেমিশে থাকার একটা আনন্দ ছিল। সেখানেও প্রেম বাসা বাঁধত। ভালোবাসা তো চিরন্তন। সব পরিবেশেই সে সজীব। শুধু তার রূপ আলাদা।

তবে সে আজকের তরঙ্গবাহিত ডিজিটাল প্রেম নয়। সে প্রেম কখনও আসত লোডশেডিং-এ বা কোনো সরস্বতী পুজোর সকালে। কোনসময় হয়তো চার-চোখ এক হত অষ্টমীর অঞ্জলিতে। আজকের দিনের মত উদ্দাম নয়। হাত ধরাধরি করে ঠাকুর দেখা। অথচ পায়ে নতুন জুতোর অকারণ অস্বস্তির ঘর্ষণ। রক্তক্ষরণ। তবু মুখে হাসি। আরামের কথা চালাচালি। সে প্রেম ভোগের নয়। সহ্যের, ত্যাগের। তখন তো কো-এড় স্কুল ছিল না। ছেলেদের কাছে মেয়েরা ছিল এক ভিন্ন গ্রহের প্রাণী। মেয়েরা যে ভালো বন্ধু হতে পারে, সেটা যবে বুঝলাম, পাতানোর বয়স পেরিয়ে গেছে। মেয়েরাও যে হাসে, গল্প করে, দুষ্টুমি করে, সে-সব ছিল আমাদের জ্ঞানের বাইরে। মেয়ে মানে আমরা বুঝতাম, চারটে বই ব্যাগে আর দুটো বই বুকের সামনে ধরে হেঁটে যাওয়া কিছু গম্ভীর মানুষ। ফলে চোখাচোখি হলেও সরাসরি কথা বলার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। তবে তার মধ্যেও দু'চারজন সাহসী প্রেমিক থাকত, যারা হয়তো রবীন্দ্রজয়ন্তী বা পাড়ার বিজয়া সন্মীলনীর দিন কোনো জুঁই ফুল জড়ানো খোঁপার দিকে ছুঁড়ে দিতে পারত বেসুরো রবীন্দ্রসঙ্গীতের দু'একটা কলি। তবে তাতে কাজ কতটা হত, বলা মুশকিল। তাই প্রেমে, বাধ্য হয়ে ভরসা করতে হত পত্রবাহকের ওপর। সেটা যে ছেলে বা মেয়ে হত তারা অনেকটা সাঁকোর মত। কিছু মেয়ে বরাবরই থাকত, যারা ছোটবেলা থেকেই একটু ডানপিটে। ছেলেদের সাথেই খেলাধুলো করত, গাছে চড়ত, পুকুরে এপার ওপার সাঁতরাতো। তারাই সাধারণত যোগাযোগের সূত্রটা হত। আবার কিছু ছেলেও ছিল, যারা ছেলেদের সাথে খেলত না। রবীন্দ্রজয়ন্তীতে তবলা বাজাত বা কোমর উঁচু করে মেয়েদের সাথে নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করত। তারাই মূলত পত্রবাহক হত। এরা আবার কম পুরুষালি হলেও মেয়েদের সঙ্গে গল্প করায় ওস্তাদ ছিল। ক্যালেন্ডারের লাল কালির গল্প-ও অবলীলায় এরা মেয়েদের সাথে নাচের ক্লাসে করতে পারত। তবে সমস্যা ছিল পাড়ার কিছু মাসীমা। সিসি টিভির বাবা! এদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া খুব মুশকিল। আর কোনো আইবুড়ো ছেলে-মেয়ে কথা বলা মানেই তখন প্রেম। শুধু একবার চোখে দেখলেই, পাল্টিঘর কিনা, সেটাও হিসাব-নিকাশ শুরু হয়ে যেত। তবু প্রেম আসত, পাকত, তারপর অনেক সময় বিয়ের ফুল হয়ে ফুটত-ও। মাথায় সিঁদুরের শীলমোহর পড়ত। আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রেমের কুঁড়ি, ফুটেই ঝরে যেত। তখন মেয়েরা-তো দোর দিত চিলেকোঠায়, গোসা-ঘরে। কিন্তু ছেলেদের নিয়ে হত তার বন্ধুদের সমস্যা। কেউ নিত দেবদাসের পথ, কেউ আবার বিবেকানন্দের। সন্ন্যাসী হয়ে যাবেই। কিছুতেই আটকানো যেত না। তখন তো মনোবিদ আসে নি। মনোবিকাশ কেন্দ্র-ও নেই। বন্ধুরাই মনের ফুটোফাটা মেরামত করার চেষ্টা করত। ঘাড় থেকে ভূত তাড়াতে চাইত। সময় লাগত। ধীরে ধীরে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনতে। তারপর ব্যর্থ প্রেমিক দু-চারটে কবিতা লিখে সে যাত্রায় ক্ষান্ত দিত।

আর যে প্রেমের কুঁড়িগুলো বিয়ের ফুল হয়ে ফুটত। মানে পাড়ার ট্রফি পাড়াতেই থেকে যেত। সেখানের মজাটাই আলাদা হত। ছেলের বাড়িতে ছেলের বন্ধুরা, মেয়ের বাড়ি মেয়ের দাদার বন্ধুরা স্ট্রাইকারে খেলত। কোমরে গামছা বেঁধে নেমে পড়ত পরিবেশনে। সেসব মেনু-ও ছিল আলাদা। ঝুড়ি করে লুচি, বোঁটাশুদ্ধ বেগুনভাজা, দু-তিনরকম মাছ, পাঁঠার মাংস আর ঘরের ভিয়ানে তৈরী নানারকম মিষ্টি। সারা পাড়া মেতে উঠত সেইসব বিয়েবাড়িতে। ওসব মজা চিরকালের মত হারিয়ে গেল।

সেই সমাজজীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে এল আন্তর্জাল আর মোবাইল। কেড়ে নিল রক্, থেমে গেল আড্ডা, হারিয়ে গেল বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিজয়ার প্রণাম, ঘুগনি, নাড়ু, হাতে তৈরি মিষ্টি। হারিয়ে গেল সেইসব বুক ধুকপুক চিঠি। যার ভেতর রবীন্দ্রনাথ থাকত, জীবনানন্দ বেঁচে ছিল, আবার কোনসময় হাতে-গরম সুনীল-ও স্থান পেত। হয়তো দুর্গাপুজোর চিঠির উত্তর আসত সরস্বতী পুজোয়। কত গোপনে! কত অপেক্ষার পর। কিন্তু তাতেও কী গভীর টান ছিল! ‘ব্রেক-আপ’ তখনও বাঙালি শোনে নি। প্রথমে পাড়ায় মা-জেঠিমারা একটু ঘোঁট পাকাতো। তারপর যখন সব বাধা টপকে, সানাই বেজে উঠত তারাই আবার আনন্দ-নাড়ু পাকাতে বসত। এসব রূপকথার গল্প, এখন অবিশ্বাস্য। মুখে পানের খিলি দিয়ে চলত সেই প্রেমের পোস্টমর্টেম। সেই বউভাতের বগি থালা-ও আর নেই, সারি সারি কাঁসার বাটি-ও নেই, কড়ি খেলা নেই, বাসরের গান নেই, শালিদের উৎপাত নেই, নতুন বউয়ের আড়ষ্টতা নেই, ল্যাটা মাছ ধরা নেই, ফুলশয্যায় জড়তা নেই। সব মেকি, সবটাই এখন লৌকিকতা। আমাদের গেছে সেসব দিন। আর বিশ বড়জোর তিরিশ বছর, এর ধারক বাহকরা এই পৃথিবীতে থাকবে। দেখা হলে আওড়াবে নিজেদের মধ্যে এইসব কথা। মনে পড়বে খাতার শেষ পাতা ছিঁড়ে নৌকো বা রকেট বানানো। জীবনে সব কিছু চড়া হয়ে গেছে। বড় ইচ্ছে করে এখন ঐগুলোতে চড়তে। কাঠ কয়লার ধোঁয়ায় স্যাঁতসেঁতে তেলচিটে রান্নাঘরে সেইসব মায়েদের আবছা মুখের মত আজ তা দুষ্প্রাপ্য। সন্ধেবেলা পড়ার ফাঁকে লোডশেডিং’র ছায়াময় আলোয় দেখা পিঁপড়ের লাইন কোথায় যায়, সে গবেষণার গল্প আজ কাউকে বলার নেই। কারণ এই গল্প পরের প্রজন্ম শুনবেও না, আর শুনলেও দুঃখের বিষয় এর আবেগ কিছুতেই বুঝতে চাইবে না। এইসব হারানোর আক্ষেপ শুধু গোধূলি লগ্নে পৌঁছনো কিছু হাফ্-বুড়ো মানুষের। যেখানে ডিমের ঝোলের অর্ধেক ডিমে কুসুমের ভাগাভাগি বা এক লেপে শোওয়ার সেইসব দিনের লেপের টানাটানির আফশোস থেকে যাবে আমৃত্যু। এইসব পুরোনো নগন্য অথচ গহীন বাস্তব নিয়ে তারা স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়বে। এরমধ্যেই হয়তো মোবাইল বেজে উঠবে। আবার ছুটবে। এক অসহ্য ইঁদুর দৌড় প্রতিযোগীতায়। হয়তো অবসর কোনো সময় আপন মনেই গুনগুন করে উঠবে, ‘দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়, রইল না, রইল না, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি’।

প্রকৃতি ও ঈশ্বর

সঞ্চিতা ভট্টাচার্য সেনগুপ্ত

রথযাত্রা সম্পর্কে দু চার কথা লেখার ইচ্ছে থেকেই আমার এই প্রচেষ্টা। সবটাই আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ মাত্র। ধর্ম কথাটির অর্থ বিশাল ও ব্যাপক, সাধারণ সেভাবে তার মান্যতা দিতে আজও শেখেনি। পদবি মানুষের ধর্মীয় অবস্থান চিহ্নিত করার সাথে সাথে পরিচয়ের হাতিয়ার হিসেবে দাঁড়িয়েছে!!
কোন মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক কোন ধর্মের সাথে যুক্ত না থেকেও ধর্ম ধারণ করতে বাধা কোথায়? এই বিশাল পৃথিবীতে বহু মানুষ আছেন যারা কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু মানব কল্যাণে ব্রতী, তবে তাঁরা কি অধার্মিক?? আপনাদের মতামত কি?

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই মানুষের গায়ে সংকীর্ণ অর্থে ধর্মের ট্যাগ লাগানোর এক বিরল প্রচেষ্টা প্রচলিত হয়েছে। কোন ধর্ম ত্যাগ করে কোন নব্য ধর্মের খাতায় নাম সংযুক্তকরণ করলেন তা ধর্মীয় সংখ্যাতত্ত্ব বিশ্লেষকেরা যার পর নাই আগ্রহ ও কর্তব্য বলেই মনে করেন!!

যেসব মানুষ কোন প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিশ্বাসী নয়, তাঁদের কে নাস্তিক নামে দাগিয়ে দেওয়া হয়। অথচ খবর রাখলে জানতে পারবেন তাঁরা মানবতায় বিশ্বাস করেন, প্রকৃতি ও মানুষের মঙ্গল সাধণে ব্রতী। আপনারাই বলুন তো ওনারা অধার্মিক কাজে লিপ্ত কি!! আসলে তা নয়, ওনারা সংখ্যাতত্ত্বের আশ্রয় বা প্রশ্রয়ে বসত করেন না।
সকলই ঘোমটার তলায় খেমটা নাচ, আর কি? সংখ্যাই ধর্মীয় বিশ্বাসের ও বানিজ্যিকরণের বিশুদ্ধ হাতিয়ার। কেউ জন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মশগুল, কেউ যোগ চিহ্নের মাধ্যমে, কেউ আবার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ, সাধারণ জীবন হতে পরিত্রাণ ও মোক্ষ লাভের পথের লোভ দেখান।
আসল কথা যুগের পর যুগ ধরে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেই জান্দা খাতার যোগ চিহ্নের খেলা!! পৃথিবীটা তো গোল, ঘুরে ফিরে লোভ, আশ্রয় ও সংখ্যারা দাঁড়ায় সামনে। “ইতি হত গজ”। মান আর হুস যুক্ত মানুষের বড্ড প্রয়োজন। তাঁদেরই অপেক্ষায় আছে পৃথিবীর সভ্যতা!!

যাক এ সকল কথার থেকে দূরে থেকে রথয়াত্রার সম্পর্কে দুচার কথাই বলি।
প্রাচীন কালে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে রথ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, দ্রুতগামী যান হিসাবে ঘোড়ায় টানা রথ বা বলশালী পশুর দ্বারাই রথ টানা হত তবে বর্তমানে তা আর হয় না, কেবল প্রতীক হিসাবে কাঠের ঘোড়া রথে সাজানো থাকে মাত্র। বাস্তবতার নিরিখে রথ শব্দটি যথেষ্ট গুরুগম্ভীর ও অর্থবহ। রথ কে জীবন যাপনের প্রতীক হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, জীবনরথ বা কর্মরথচক্রের মানে তাত্ত্বিক বোধ, দেহতত্ত্বের উপর আলোকপাত করা হয়েছে লোক শিক্ষার জন্য। মানব জন্মের ও জীবন চক্রের সাথে রথের চাকা থেকে শুরু করে কাঠামোর প্রতিটি স্তর সুচারু রুপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যে জানে বোঝে এই দর্শন সে অসামান্য, যে কিছুই হৃদয়াঙ্গম করতে পরে না সে বাহ্যরূপেই মুগ্ধ।

রামায়ণ মহাভারত ছাড়াও বহু পৌরাণিক চরিত্রদের ও দেবতাদের রথের সাথে একটা কথা ও কাহিনির মতন সম্পৃক্ততা রয়েছে । ইন্দ্রের রথ, শ্রীকৃষ্ণের রথ, রাবণের রথ, মহাভারতের যুদ্ধে রথী মহারথীদের রথ, রামায়ণে মেঘনাদের মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করার রথ, এমনি বহু রথের উদাহরণ রয়েছে। সূর্য দেবের রথ নাকি আবার সাত ঘোড়ায় টানা (মানে রামধনু /রং ধনু)। আশ্চর্য লাগছে তো তাহলেই ভাবুন আমাদের অখন্ড ভারত ভূমি সে যুগে ও কারিগরি শিক্ষায় কতটা উন্নত ছিলো!! হতবাক লাগছে... যুক্তি তর্কে কিন্তু সহমত হতেই হবে।

তবে মহা প্রভু জগন্নাথ দেবের রথ নিয়ে এত উৎসব কেন? সকল কিছুর পেছনেই আছে সাধারণের বোধগম্যময় কিছু কারণ, থাকে লোক কথা, লোকগাঁথার পরিচয়, লোক সংস্কৃতি ও শিক্ষনীয় কিছু সামাজিক বার্তা। মজার একটা কথা বলি নারদ মুনি চিরকাল স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে ঢেঁকি তে চড়ে ঘুরে বেড়াতেন কিন্তু ঐ ঢেঁকি কে কেউ রথের উচ্চতায় স্থান দেন নি। বেশ মজার বিষয় কিন্তু!!
আষাঢ় মাসেই কেন রথ যাত্রা হয়? বৃষ্টি স্নাত মাটি, জলভরা গোমড়া মুখো মেঘ জমে থাকে আকাশে, তারই মাঝে আনন্দ উৎসব কেন? রথ যাত্রার তিথির মান্যতা প্রদান করেন পন্ডিত জনেরা। তিথি, নক্ষত্র, পাঁজী, পুঁথি ইত্যাদি সকল কিছু বিচার বিশ্লেষণ করে।

মজার কথা বলি রথ যাত্রার বেশ কিছুদিন আগে ই স্নান যাত্রার মধ্যে দিয়েই সূচনা হয় প্রভুর মাসির বাড়ি যাওয়ার উৎসবের।
এখানেই আসছে শিক্ষার বার্তা বহু কথা ------

ঘড়া ঘড়া জল (সম্ভবত ১০৮) দিয়ে প্রভু জগন্নাথ দেব কে স্নান করান হয়, এতো জলে স্নান করে প্রভু প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। সকলেই চিন্তায় বৈদ্য মানে ডাক্তার বাবু কে ডাকেন, ডাক্তার বাবু ঔষধ দেন নিমের পাঁচন। নিম একটি ঔষধী গাছ, যার শেকড় থেকে পাতা, ফুলফল সব কিছুই ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, আর নিম এমন ঔষধ যা দেবতা থেকে মানুষ সকলকেই সুস্থ করে তুলতে পারে। তাই লোক শিক্ষা হলো ঔষধী গাছ কে রক্ষা করতে হবে, বেশী করে গাছ লাগাতে হবে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য। গাছ সামগ্রিক ভাবে অত্যন্ত জরুরী। গাছ যেমন কাঠ দেয় (ঈশ্বরের বিগ্রহ তৈরিতেও কাঠ লাগে), ছায়া দেয়, সুস্থতা দেয় তাই তার নিরাপত্তা মানুষকে সচেতন ভাবে করতেই হবে। এটাই ধর্মের আড়ালে লোক শিক্ষা।। যাদের হাসতে ইচ্ছে করছে একটু হেসে নিন আর কি!! এই স্নান যাত্রা ও অসুস্থতা যদি প্রতিকী হয় তবে গাছের সংরক্ষণের জন্য নিমের পাঁচনের উদাহরণ গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই তো দেবতা আর মানুষের মিলন উৎসব, দেবতা শিক্ষক আর সাধারণ শিক্ষার্থী। সবুজ ছাড়া জীবন বাঁচতে পারেনা এটাই মূল বক্তব্য।

এবার বলি আষাঢ় মাসে ই কেন রথ যাত্রা হয়।

তার পেছনেও রয়েছে প্রকৃতির খেলা। ছোট্ট বেলায় গল্প শুনেছিলাম অম্বুবাচী বলে একটি তিথি আসে এতে অনেক নিয়মাবলী আছে বটে, তবে মুখ্য বিষয় হলো ঐ তিথি চলাকালীন ধরণীর রজঃস্বলা অবস্থা চলে। তখন কোন ভূমি কর্ষণ করা, কৃষি কাজ করা, গৃহ নির্মাণ করা এমন কি গাছগাছালি, জলাভূমিকেও কোনরকম বিরক্ত করা উচিৎ নয়। ধরণীকে বিশ্রাম দিতে হয় আর রজঃস্বলা অবস্থা চলে ৩-৭দিন ধরে তিথি অনুসারে। অম্বুবাচী শেষ হলেই নাকি মাটির বুকে উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়, ঠিক নারী শরীরের মতন।

তাই কৃষি নির্ভর ভারত ভূমির বেশীর ভাগ মানুষের তখন বিশ্রামের সময়। তাই তো কবি বলেছেন, “বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ় তোমার মালা”। বৈশাখ জৈষ্ঠ্যমাসের প্রবল উষ্ণতায় কৃষকের প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থা হয়, তাই আষাঢ় আসে শান্তির জলধারা নিয়ে। মেঘছায়ে প্রাণ জুড়ায়ে কৃষকগন অবসর কালে আনন্দে মেতে উঠেন। এ গ্রাম সে গ্রামে যাতায়েত করেন, আত্মীয় স্বজনরা মিলিত হন। সংস্কৃতিচর্চা ও বিনিময় হয় সুখ দুঃখ, সাথে উন্নত বীজ, কৃষি পদ্ধতি নিয়েও মত বিনিময় করে থাকেন। এরই পিছু পিছু চলে আসে মহাপ্রভুর স্নান যাত্রা, আর স্নান যাত্রার পরই মহাপ্রভুর ভাই বোন সকল কে নিয়ে শুরু হয় রথ যাত্রা উৎসব পালন, মানে মাসির বাড়ি গুন্ডিচা মন্দির যাবার পার্বণ। ভক্তের সাথে ভগবানের মিলন উৎসব, এর মাধুর্যই অন্য মাত্রার।

প্রভু জগন্নাথ, বড় ভাই প্রভু বলভদ্র, ও দেবী বোন শুভদ্রা কে নিয়ে নিত্য পূজার মন্দির ছেড়ে বেড়িয়ে আসেন পথে জনারন্যে। সামাজিক প্রতিকূলতার জন্য যারা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারেন না তাদের সকলকে স্বচক্ষে দর্শন করেন প্রভু। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সকল কিছু মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় ভক্ত আর ভগবানের মিলন মেলায়।

রথ যাত্রা কিন্তু পারিবারিক বন্ধনের ও শিক্ষা প্রদান করেন। চিন্তা করে দেখুন যেহেতু প্রভু বলভদ্র বড় দাদা গুরুজন তাই ওনার রথ ই প্রথম পথে নামে, বড়দের সম্মান করা আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি। তার পর পথে নামেন প্রভু জগন্নাথের রথ, সর্বশেষে পথে নামে ছোট বোন দেবী সুভদ্রার রথ। চিন্তা করে দেখুন দুই ভাই মিলেই মাসির বাড়ি যেতে পারতেন আবার বোন কেন! এখানেই তো ঐক্যবদ্ধ সত্তা ও মমতার সুধাময়ী ধারা। নারীর প্রতি সম্মান। বোন কে ছাড়া মাসির বাড়ি যাওয়া তা কি করে হয়! মোদ্দা কথা ভাই বোন সকলে মিলে বছরে একবার মাসির বাড়ি গিয়ে আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা করে হৈ হৈ করে আনন্দ করে সকলের কুশল মঙ্গল খবরাখবর নিয়ে, সাংসারিক ও সামাজিক বিষয়ক বিবিধ আলাপ আলোচনা সেরে নিয়ে, ভালো মন্দ খাওয়াদাওয়া করে ৭দিন পর আবার নিজ মন্দিরে ফিরে আসেন।

এটাই তো পারিবারিক বন্ধন ও কর্তব্য বোধের শিক্ষা। এখানেই তো লোকশিক্ষার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হলো, রক্তের সম্পর্কগুলোর মূল্য অপরিসীম কোন অবস্থাতেই বিচ্ছেদ্য নয়। ভাই-বোনের সম্পর্ক চির অম্লান কেবল মায়াডোরে বিনিসূতার মালায় গেঁথে রাখতে হয়। এখানেই বৃহত্তর পরিবারের জয়মাল্য গাঁথার ইতিহাস।

লোক শিক্ষার আলোক রেনু ছড়িয়ে দিলেন প্রভু জগন্নাথ। যৌথ পরিবার ভারতীয় সংস্কৃতির আবহমান কালের ঐতিহ্য, ঐক্যবদ্ধ পরিবার আজও কাম্য।

তবে একটা মজার কথাও বলতে ইচ্ছে জাগলো।

প্রভু জগন্নাথ দেবের স্ত্রী লক্ষী দেবী তাঁকে কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে যান না মাসির বাড়ি!!

এ এক আশ্চর্য বিষয় নয় কি? একে তো স্ত্রী গৃহলক্ষী, দ্বিতীয়ত পারিবারিক রাজনীতির গন্ধ আছে বলে ও মনে হয়। মজার কথা হয়তো সবাই মিলে বাড়ি খালি করে চলে গেলে ফিরে এসে সব ঠিক ঠাক করা পরিশ্রম সাপেক্ষ বিষয়। আবার মাসির বাড়িতে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের বা ভাই-বোনদের সাথে শৈশব কৈশোরের স্মৃতি কথা আলোচনা বা পারিবারিক অতীত কিম্বা বর্তমান কোন শলা পরামর্শ করলে তা স্ত্রী জানতে পারবেন বা ফোঁড়ন ও দিতে পারেন কিম্বা ফিরে এসে কখনো কোন সাংসারিক অমত জনিত সমস্যার সৃষ্টি হলে পুরানো কথার চাবুক দিতে পারেন হয় তো! এ সমস্ত চিন্তা করেই স্ত্রী লক্ষী দেবী কে গৃহের সমস্ত দ্বায়িত্ব দিয়ে ভাই-বোনেরা রথে চেপে মাসির বাড়িতে রওনা দেন। তবে উল্টো রথে ফিরে এসে কিন্তু কম ঝক্কি সামলাতে হয় না সকলকে!! বিশেষ করে প্রভু জগন্নাথ দেবকে। স্ত্রী লক্ষী দেবীর প্রচন্ড রাগ হয়, গোসার ঠেলায় মন্দিরের দুয়ার বন্ধ করে রাখেন।

প্রথম প্রভু বলভদ্রও দেবী শুভদ্রা অনেক ডাকাডাকি অনুনয়-বিনয় অনুরোধ করা সত্বেও মন্দিরের দুয়ার খোলেন না। অগত্যা আসরে নামেন প্রভু জগন্নাথ নিজেই। বহু অনুরোধ স্তুতি বাক্য দিয়ে ও যখন লক্ষী দেবীর গোসা কমেনা, স্বামী মহাপ্রভু স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়ে বসেন। এতে লক্ষী দেবীর রাগ গলে জল হয়ে যায় মহাপ্রভু স্ত্রী কে মিষ্টি মুখ করিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন।
এখানেই তো লোকশিক্ষার কথা আসছে সংসারে মেনে নেওয়া ও মানিয়ে নেওয়ার শিক্ষা, কোন পুরুষ তার স্ত্রীর কাছে মার্জনা চাইলে তিনি কখনোই ছোট হয়ে যান না বরং প্রেম ও ভালোবাসার ভিত্তি মজবুত ও মধুময় হয়ে ওঠে ।

স্বামী-স্ত্রীর মনকষাকষি কখনোই বেশীদিন টেনে নিয়ে যাওয়া সমীচীন নয়। দুজনের মাঝে যে সমঝোতার সেতু আছে তা টলতে দিলেই সম্পর্ক টালমাটাল অবস্থায় পড়ে। লক্ষী দেবী ও সংসার পালনের তাগিদ ও প্রেমাস্পদকে হৃদয়ে ধারণ করে সকল দুঃখ ভুলে আবার সেই সংসার। এটা কি কম বড় লোক শিক্ষা।

রথের দড়ির কিছু নিজস্বতা রয়েছে। তাই দুচার কথা বলতেই হবে। জগন্নাথ দেবের রথের দড়ির নাম শঙ্খচুড়া, বলভদ্র দেবের রথের দড়ির নাম বাসুকি নাগ, শুভদ্রা দেবীর রথের দড়ির নাম স্বর্নচুড়া নাগিনী, প্রতিটি রথের দড়ির নামই কিন্তু সাপের নামে, এখানে এটাই তাৎপর্য পূর্ণ বিষয় সর্পকুল ও ধরণীর ভারসাম্য বজায় রাখতে কতোটা প্রয়োজনীয় তার প্রকাশ মাত্র। ধর্মের সাথে বাস্তবতার অসাধারণ মেলবন্ধন। সরীসৃপদের নিরাপত্তা প্রদান মানুষের কর্তব্য।

ধর্মীয় মোড়কে শিক্ষার বার্তা।।

রথের দারোয়ান বা দ্বারপাল হলেন নন্দা-সুনন্দা, জয়া-বিজয়া। নাম গুলো থেকেই বুঝতে পারছেন সম্ভবত ওনারা নারী। মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের ও প্রভু বলভদ্রের রথের দারোয়ান যদি নারীরা হন তাহলে বুঝতে পারছেন ভারতীয় সংস্কৃতি তে নারীর স্থান কোথায়। নিশ্চয়ই ওনারা যুদ্ধবিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, সেবাপরায়ণতায়, কর্মনিষ্ঠার প্রতীক এতে কোন সন্দেহ নাই। যদিও বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থা খুবই দুঃখজনক, সকলেই সব জানেন তাই বিস্তারিত বিবরণ অপ্রয়োজনীয়।

রথ কে কেন্দ্র করে এক উৎসব মুখর সপ্তাহ উপহার পায় সাধারণ। বিভিন্ন রাজ্য, দেশ বিদেশের বহু মানুষ উপস্থিত হন রথযাত্রা কে কেন্দ্র করে। এতে এক নব ঐক্যসুর ধ্বনিত হয়। সংস্কৃতির আদান প্রদান হয়, মেলা বসে। রথকে কেন্দ্র করে রন্ধন শিল্প থেকে শুরু করে সাহিত্য, ইতিহাস, লোক কথা, লোক গাঁথা প্রবাহিত হয় হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের মেলবন্ধনে। এ এক অভূতপূর্ব প্রাপ্তি জীবনের। আনন্দের কথা এই যে বেশ কিছু কাল ধরে বিদেশের মাটিতে ও রথ যাত্রা উৎসব বিদেশিদের হৃদয়কেও খুশি করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁরা ও ভালোবেসে শ্রদ্ধার সাথে রথযাত্রা পালন করেন আমোদে আহ্লাদে।

ব্যক্তি জীবনে আমার শৈশব ধরা দেয় বার বার। আমার কাছে রথ যাত্রা মানে দড়ি টানা, মেলা দেখা প্রসাদি ফল লুফে নেওয়া, পাঁপড় ভাজা ও জিলিপি খাওয়া সাথে এক গাল হাসি মাখা মুখে বন্ধুদের সঙ্গে হৈচৈ করে বাড়ির পথে পা।

গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো “মানুষ ধর্মীয় পোশাক যেভাব দেহে পরিধান করে, যদি ধর্মীয় আচরণ ও তার সারবত্তা হৃদয়ে ধারণ করতো তাহলে পৃথিবীতে এতো সংঘাত সৃষ্টি হতো না।” হয় তো আত্মায় আত্মায় মিলনের ফলে বিবাদ, সংঘাত, প্রতিশোধস্পৃহা, জাতি বর্ণ, সম্প্রদায় সকল মুছে গিয়ে নতুন মানবিক অভিধান লেখা হত। সৃজন হত নতুন পৃথিবীর। আসলে তো আত্মা হলো রথী, শরীর হলো রথ, বুদ্ধি হলো সারথী, মন হলো লাগাম। উৎসব মানে কেবল আনন্দ নয়, শিক্ষা ও নিজ চেতনা কে সমৃদ্ধ করার দিশা দর্শানোর পথ। নিত্য ও অনিত্যর দর্শন তুলে ধরার এক টুকরো প্রয়াস।

একটা দারুণ বিষয় হলো এই রথযাত্রা ই কিন্তু পরবর্তী উৎসব গুলোর শঙ্খ ধ্বনি ঘোষণা করে। লোক কথায় বলা হয় রথের রশিতে পড়লো টান, মা দূগ্গা সংসার গোছান, একটি বছর পরে বাপের ঘর আলো করে আইবো উমা মায়ের কোলে, আর কটা দিন সবুর যান।

যেন রথযাত্রা ই ঘোষণা করে যায় দেবী দুর্গার আগমনী বার্তা। আকাশ বাতাস মানবকূল বলে উঠে “আমি কান পেতে রই “

দোপাটির বীজ

তন্ময় ঘোষ

দোপাটির বীজ দেখেছ? সূচনার সময় বিন্দু তাদের ধরে রাখে একক মাতৃগর্ভে। কালস্রোত তাদের প্রথম আঘাত হানে, বিদীর্ণ হয় গর্ভের প্রাকার, ফেটে ছড়িয়ে যায় সেসব বীজ। দূরে, দূরে, অনেক দূরে। এই ছড়িয়ে যাওয়া তাদের নিয়তি। অলঙ্ঘ্য পরিণতি। বড়ো হওয়া, বড়োর আহ্বানে বেরিয়ে পড়া। ফিরব বললেই এরা আর ফিরে যেতে পারে না সেই কোমল আশ্রয়ে, যেখানে পরস্পরের সান্নিধ্য তাদের অদৃষ্ট বাঁধনে বেঁধেছিল।

যাদের কথা বলব, তারাও ঐ দোপাটির বীজ। এরা থাকত এক ইশকুলের ছাত্রাবাসে। বিদ্যালাভের বাঁধাধরা সময়টুকুর বাইরেও এদের নৈমিত্তিক অভিবাস ছিল পরস্পরকে আঁকড়ে। সাড়ে তিন দশকের কালক্ষেপ সেই সাহচর্য, আত্মবোধ ম্লান করতে পারেনি। আর পাঁচটা বিদ্যালয়ের সহপাঠীদের সাথে এরা আলাদা হয়ে থেকেছে ঐ কারণেই। পৌঁছে গিয়েছে মধ্যবয়সে, পাতলা হয়েছে চুল, রূপো ঝিকমিক। বিকেলের আলো প্রত্যেকের চোখে। আর সেই আলোর প্রতিফলন নতুনের স্বপ্নে অক্ষয় রাখতে তারা ঐক্যবদ্ধ অঙ্গীকারে, অথচ নীরবে পরিশোধ করে চলেছে সমাজের ঋণ, যে সমাজ থেকে একদিন উঠে এসেছিল তারা, মাথা উঁচু করে দখল করে নিয়েছিল জ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিষেবার জগতে উচ্চ স্থানগুলি।

দৃষ্টান্ত এক, সিধু কানু মিশন। গ্রাম ভালিডুংরি, থানা আরশা, জেলা পুরুলিয়া। অযোধ্যা পাহাড়ের পাদদেশে এক প্রত্যন্ত সীমায় একটি ছোটো প্রতিষ্ঠান। আকারে ছোটো, কিন্তু আকাশ অনেক বড়। ছেচল্লিশ জন আদিবাসী শিশু, যাদের মধ্যে একজন বাদে সকলেই অনাথ। আদিবাসী লোকগীতি শিল্পী নরেন হাঁসদার স্বপ্নজাত এই প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণ করেছে পনের বছর। পঞ্চদশী হয়ে ওঠার পথে যে কঠিন মোড় গুলি সিধু কানু মিশনকে পেরোতে হয়েছে, তার পদে পদে ছিল তীব্র অনটন। নরেনবাবু তাঁর সঙ্গীত অনুষ্ঠানের উপার্জনের সবটুকু ঢেলে শিশুগুলিকে শিক্ষা, আহার, আশ্রয় ও সর্বোপরি সঙ্গীতের আলো দেখিয়ে এসেছেন। আমাদের দোপাটির বীজেরা, যারা আজ বিকশিত পাপড়িতে, জানতে পেরে সবিনয়ে দাঁড়াতে চেয়েছে পাশে।
তৈরি হয়েছে যৌথ ভান্ডার, যে ভান্ডার আছে ভরে সবাকার ঘরে ঘরে। সৃষ্টি হয়েছে সামান্য হলেও নিয়মিত ও নিশ্চিত ফান্ড। মাত্র চারজন শিশু নিয়ে যাত্রা শুরু করা সংস্থা থেকে গত বছর পাঁচজন মাধ্যমিক পাশ করেছে, যার মধ্যে দুটি বালিকা, এবং তারা দুজনেই প্রথম বিভাগে। আলোকরেখা ছিন্ন মেঘের মধ্যে দিয়েই আসে।

দৃষ্টান্ত দুই। হুগলি জেলার একেবারে পশ্চিম প্রান্তে ছোটো জনপদ বদনগঞ্জ। জায়গাটা নিছক দুর্গম নয়, তবে রেল - মহাসড়কের সান্নিধ্যে মহানাগরিক ঝলমলানি তার অধরা। জনবিন্যাসে দারিদ্র্য আছে, তফশিলি জাতি ও উপজাতির ছাত্রছাত্রী অনেক। বদনগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম এই ছেলেমেয়েদের জন্য অসম লড়াই লড়ে আসছে সেই ১৯৯৩ সাল থেকে। দ্বারকেশ্বর-দামোদরে বয়ে গেছে অনেক ঘোলা জল, প্রতিষ্ঠান আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে, বেড়েছে সদস্যসংখ্যা। বর্ধমান কর্মকাণ্ডের পরিধিও। প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কোচিং, প্রতি মাসে পড়াশোনার সামগ্রী বিতরণ, উচ্চশ্রেণীর জন্য বৎসরান্তে বই, শিশুদের জন্য প্রতি দিন পড়াশোনার শেষে টিফিনের ব্যবস্থা, মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্য নিয়ে হাতে তৈরি মশলা প্যাকেটজাত করা ও বিক্রয়, নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষা শিবির এঁদের তালিকায়। যদিও শুভানুধ্যায়ী এঁদের অনেকেই, ব্যক্তিগত ও সমষ্টি হিসাবে যথাসাধ্য তাঁরা করেও থাকেন, তাও কখনো কখনো মহতী উচ্চাশায় সাধ ও সাধ্যের ফারাক হয়ে যায় বৈকি। আর সে ফারাক নজরে আসতেই এগিয়ে এসেছে আমাদের দোপাটির বীজের দল। এসেছে শিকড় ভুলতে না পেরে, এসেছে নিজেদের শৈশবের লড়াইকে মান্যতা দিয়ে, এসেছে মূল্যবোধ আর সুচেতনা, যুগল ডানায় ভর করে। আজ এঁদের কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তির অংশ হতে পেরে তারা গর্বিত, উদ্বুদ্ধ।

দিয়ে, এসেছে মূল্যবোধ আর সুচেতনা, যুগল ডানায় ভর করে। আজ এঁদের কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তির অংশ হতে পেরে তারা গর্বিত, উদ্বুদ্ধ।

দৃষ্টান্ত তিন। বিদ্যাসাগর শিশু শিক্ষা নিকেতন, যদুগোড়া, পুরুলিয়া। অযোধ্যা পাহাড়ের শীর্ষভূমিতে এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে একশো চল্লিশ জন ছেলেমেয়ে। দরিদ্র ও অনগ্রসর, প্রধানত আদিবাসী পরিবারের শিশুগুলিকে আলোর পথে নিয়ে যেতে দুই দশক ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন রামনাথ মুর্মু। ছাত্রছাত্রীদের অর্ধেকই এখানে আবাসিক। এই প্রতিষ্ঠানটি ও একাধিক উৎস থেকে আনুকূল্য এরাও পেয়েছে কিছু। কিন্তু যাদের নিয়ে এই কাহিনী, সেই সিংহস্বরূপ দলটির নজরে এসেছিল বড়ো সমস্যা। শিশুরা থাকত কাঁচা বাড়িতে। পাকা মজবুত ছাত্রাবাস গড়ে দিয়ে তাদের অনাবিল হাসিতে সুখ খুঁজেছে তারা। রান্নার জায়গাটি পড়েছিল ভেঙেচুরে, নতুন করে নির্মাণ করে দিয়েছে তাদের আনুকূল্য। সেখানেই শেষ নয়, মাসিক আহার্য রেশনের সিংহভাগ নিয়মিত সরবরাহ হয় তাদের সম্মিলিত ফান্ড থেকেই।

উপসংহার, দোপাটির বীজদের পরিচয়। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া থেকে ১৯৯৪ সালে মাধ্যমিক পাশ করা ছাত্ররা। ছড়িয়ে যাওয়ার তিন দশক পরেও বিনি সুতোয় গেঁথে আছে তারা। অর্থ মান যশ প্রতিষ্ঠা, এসব কিছুর ঢেউ পেরিয়ে এসে স্থিতধী মধ্যবয়স তাদের একটিই বন্ধনে অচ্ছেদ্য রেখেছে।
হৃদয়।
**
Spandan (RKMVP 1994 batch)
৪ অগস্ট, ২০২৫

মাথার ব্যায়াম

চন্দ্রিমা কুণ্ডু

রবিবারের সকাল ৬টা। ঘুম ভেঙ্গে গেলো নিত্য নিয়মে। ঘুম ভেঙ্গেছে বলেই কি উঠতে হবে না কি? আর এক ঘুম লাগানো যাবে ভেবে চোখ বুজে দিলাম। নাহ, আর আসছে না আমার সাধের ঘুম। মনে মনে ভাবলাম তাহলে কি হাঁটতে বেরিয়ে যাব, মানে মর্নিং ওয়াক।
আধুনিক জীবন, ঘরে ভর্তি যন্ত্রপাতি। রোজের কাজকর্মের চাপে শরীরে যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য কেনা দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস আর কি। কাজের চাপ তো কমে গেলো। কিন্তু শরীর কে ঠিক রাখার চাপ তো বেড়ে গেছে না কি। মা, ঠাকুমা কে কোনোদিন কারণ ছাড়া হাটতে যেতে দেখি নি। Covid কালীন প্রাপ্তি বাড়ি থেকে অফিসের কাজ। যেটুকু সময় বাঁচে সেই জায়গা পূরণ করতে স্থান নিয়েছে জিম নামক শরীর চর্চার আস্তাগার।

না না আমি এখন কোনো কাজ করব না। জিম, মর্নিং ওয়াক কিছু নয়। রবিবারের সকাল, রিল্যাক্স করতে চাই। আজকের যুগে নির্ভেজাল রিল্যাক্স মানে হাতে মোবাইল নিয়ে স্ক্রল করা। আমিও তাই শুরু করে দিলাম। চোখের সামনে একের পর এক ভিডিও এসে চলেছে। কেউ আমেরিকার খবর বলছে তো কেউ চায়নার। কেউ বাচ্চা মানুষ করার সঠিক উপায় বাতলাচ্ছে তো কেউ শরীর গঠনের। চলতে থাকল মনোরঞ্জন। কখন যে ঘড়ির কাঁটা দুবার পুরো চক্কর কেটে নিয়েছে বুঝতেই পারিনি। সম্বিৎ ফিরল যখন বাড়ির বাকি সদস্যদের ঘুম ভাঙলো। অনেক রিল্যাক্স করা হয়েছে। এবার ধীরেধীরে রোজের কাজ শুরু করে দিলাম। চা খেতে খেতে গৃহকর্তার সাথে কিছু বাক্যালাপের সময় জানালাম যে রোজের মতো আজও আমার সকাল ছটায় ঘুম ভেঙে গেছিল কিন্তু আমি মোবাইলে কিছু দেখছিলাম, তাই দিন শুরু করতে দেরি করেছি। গৃহকর্তার স্বাভাবিক প্রশ্ন, “কি দেখছিলে, কোনো মুভি? না কি অন্য কিছু?” উত্তর দিলাম ছোট করে, কিছুটা এড়িয়ে গেলাম বললে ভুল বলা হবে না।

চা শেষ করে বাড়ির বাকি কাজকর্ম শুরু করেছি। কাজ করতে করতে ভাবছি সত্যি আমি কি দেখলাম সকালের দুটো ঘন্টা?? মনে করার চেষ্টা করছি। সেভাবে কিছু তো মনে পড়ছে না। কোনোটা এক মিনিট আবার কোনো টা তারও কম, এই ছিল ভিডিওগুলোর পরিসর। কেন ভাল করে একটিও মনে পড়ছে না? খুব আশ্চর্য লাগছে। স্কুল কলেজ এর সময় টিভিতে কি দেখতাম? হ্যাঁ, মনে আছে। “Hum Paanch,” “Dekh Bhai Dekh,” “Malgudi Days,” “Jaspal Bhatti”, “Friends” আরো কত কি। বেশ কিছু এপিসোড আজও চোখের সামনে এমন ভাবে ভেসে উঠে যেন কদিন আগের দেখা। আজকাল মাথা কি আর আগের মতো কাজ করে না নাকি?

না, আর ভেবে কাজ নেই। রান্নাঘরের কাজ শেষ হলে একটা ওফিসিয়াল কাজ সেরে নিতে হবে। একটা দরকারি মেইল পাঠাতে হবে ছেলের স্কুল কর্তৃপক্ষকে। তাড়াতাড়ি হাতের কাজ শেষ করে বসে গেলাম কম্পিউটারে। কিভাবে লিখলে ভালো হয় দু পাঁচ মিনিট ভাবার চেষ্টা করে মনে হল, কি সময় নষ্ট করছি! খুলে বসলাম AI Chatbot এর একাউন্ট। আমার প্রয়োজনটা বুঝিয়ে দিলাম আমার একাউন্ট এ গিয়ে। খুব সহজেই মনের মতো লেখা পেয়ে গেলাম। যাক বাবা সময়টা বাঁচানো গেলো । স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। বিজ্ঞান এই ভাবেই কত কত নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছে আর আমাদের পরিশ্রম লাঘব করেছে।

ভাবতেই অবাক লাগে আজ বিজ্ঞানের আশীর্বাদ না থাকলে রোজের কাজের অর্ধেক ও সময়ে শেষ হতো কি? শারীরিক কাজ এর সুরাহা তো করেছেই, এখন আবার মাথার কাজ এর ভারও বিজ্ঞান অনেক সামলে দিচ্ছে। যাক বাবা এই যুগে জন্মেছি বলেই না এতো সুবিধা।
এই সব দু-চার কথা ভাবতে ভাবতেই মনে এক অদ্ভুত শঙ্কা জাগলো। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে শারীরিক পরিশ্রম লাঘব হয়েছে কিন্তু শরীরের প্রতিটি অঙ্গ ঠিকমতো চালনা না করার ফলে মানুষের শরীরে অনেক ব্যাধির ও উৎপত্তি হচ্ছে। তাই আধুনিক যুগে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে সুস্থতা বজায় রাখার তাগিদে পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠেছে অনেক শরীর সঞ্চালনের জায়গা যার আর এক নাম জিম, আর আছে যোগ ব্যায়াম কেন্দ্র। বিজ্ঞান যেভাবে মাথার কাজ সামলাতে শুরু করেছে তাতে মাথা নিয়মিত যথেষ্ট কাজ করছেনা বলে আবার মাথাকে সুস্থ রাখতে নতুন কোনো সংস্থাতে যোগদান করতে হবে না তো!

ভারতের অবদান

আশা দাস

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কত পৃথিবী, কত সূর্য, কত চন্দ্র আছে, তাহা এখনো মানুষ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই। সকলেই একটি পৃথিবী, একটি চন্দ্র ও একটি সূর্য এবং কিছু গ্রহ-নক্ষত্র দেখিয়াছে। আবার আমাদের এই পৃথিবীতে চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্র কতটুকু কাজ করে, তাহা কেউ এখনো সম্পূর্ণভাবে বলিতে পারে নাই। তবে আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহার তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল — এইরূপ নির্দেশ করা সম্ভব হইয়াছে, এবং উহাকে নতুন ও প্রাচীন নামে অভিহিত করা গিয়াছে।

প্রাচীন ভাগে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও ওশেনিয়া এই কয়টি মহাদেশ। এই এশিয়া মহাদেশে বহু দেশ রহিয়াছে, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষ একটি। এই ভারতবর্ষই আমাদের দেশ। ভরত রাজার নাম হইতে আমাদের দেশের নাম হইয়াছে ভারতবর্ষ। আমাদের দেশের মতো দেশ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। কোনো দেশেই হিমালয়ের মতো সুন্দর ও সুউচ্চ পর্বত নাই; কিংবা সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, গোদাবরী ও সরস্বতীর মতো সুন্দর নদ-নদীও নাই। প্রকৃতির সম্পদে সমৃদ্ধ ভারতের মতো স্থান আর কোথাও নাই। ভারতের যাহা নাই, তাহা পৃথিবীর কোথাও নাই।
রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি হইতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস জানা যায়। এই ইতিহাস পাঠে আমরা আমাদের দেশের অবস্থান সম্পর্কে এবং আমাদের পূর্বপুরুষ ও সতী-সাধ্বীদের সম্বন্ধে সমস্ত কথাই জানিতে পারি। উত্তরে মণিময় পর্বতরাজ হিমালয় ভারতমাতার মুকুট স্বরূপ বিরাজমান, দক্ষিণে অনন্ত রত্নাকর নীলাম্বর ভারত মহাসাগর তাহার চরণ ধুইতেছে। পশ্চিমে আরব সাগর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর — তাহার চরণারবিন্দে আত্মবিসর্জনের নিমিত্তে ছুটিয়া আসিয়াছে। মধ্যে বিন্ধ্যপর্বত মেখলার ন্যায় স্থান পাইয়াছে। সেই মেখলাই যেন তিনি দীঘির মতো বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত উত্তরভাগকে 'আর্যাবর্ত' এবং বিন্ধ্যপর্বত দক্ষিণের দেশকে 'দাক্ষিণাত্য' বলা হয়। মনে হয়, প্রকৃতিদেবী নিজের মনমতো করিয়া ভারতমাতাকে সর্বসৌন্দর্যময়ী করিয়া তুলিয়াছেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস, ভারতের সভ্যতার আদি পুরুষ আর্যগণ পাঞ্জাব প্রদেশে সিন্ধুনদের তীরে প্রথমে বসবাস করিতেন। তাহারা 'হিন্দু' নামে অভিহিত। এই হিন্দু জাতি ক্রমে ক্রমে ভারতের সর্বত্র নিজেদের সভ্যতার আলো বিস্তার করিলেন। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত সমাজ ও সংসারের সুবিধার জন্য তাহারা চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করিলেন। ইহাদের মধ্যে যারা ধর্মচিন্তা করিতেন, আত্মপ্রতিষ্ঠায় জগৎকে সচ্চিদানন্দময় করিতে চাইতেন, এবং ত্যাগ ও জ্ঞানের দ্বারা দেশকে ভাগবতরূপে গড়িয়া তুলিতেন — তাহারা হইলেন ব্রাহ্মণ। তাহাদের কর্তব্য হইল বিদ্যাচর্চা, ধর্মশিক্ষা দান এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ চিন্তা। আর যাহারা ব্রাহ্মণের আদর্শ রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন, অস্ত্র ধারণ করিয়া রাষ্ট্র ও সমাজকে রক্ষা করিলেন — তাহারা হইলেন ক্ষত্রিয়।যাহারা সমাজে পুষ্টি সাধনে, কৃষি, বাণিজ্য ও সম্পদ সঞ্চয়ে আত্মনিয়োগ করিলেন — তাহারা হইলেন বৈশ্য।আর যাহারা এই তিন জাতির কর্তব্যে সহায়তা করিলেন, তাহারা হইলেন শূদ্র।

তখন চতুর্বর্ণের সকলেই সমভাবে সমাজের কাজ করিতেন; কেহ কাহাকেও হীন বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। হিন্দুগণ প্রথমে সর্বপ্রকার বিদ্যার চর্চা করিয়া জগৎকে জ্ঞান-আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। ভারত হইল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদি জননী, ত্যাগ ও সাধনার পীঠভূমি। ভারতের বিদ্যা, ধর্ম, শিক্ষা, সত্য, সাধনা সর্বত্র গৌরবমণ্ডিত। ভারতের রমণী — অজ্ঞানতিমির-ভেদিনী, সুকৃত জননী, ব্রহ্মবাদিনী, বিভাসিত মণ্ডলী। শ্রী রামচন্দ্রের রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, ধর্মরক্ষা, কর্তব্যপরায়ণতার যে কীর্তি, তাহার তুলনা জগতে দ্বিতীয় নাই।
শ্রী রামের পত্নী সীতা সতীত্বধর্মের দ্বারা জগৎকে পরিপ্লুত করিয়াছেন। সাবিত্রী মৃত স্বামীকে বাঁচাইলেন — ভারত ছাড়া কোথায় এই দৃশ্য দেখা যায়?

কোন দেশে বেহুলা গলিতপ্রায় স্বামীর প্রাণ ফিরাইতে পারিয়াছেন? কোন দেশে সতী নিজের দেহ বাহান্ন খণ্ড করিয়া দেশময় ছড়াইয়া দিয়া সমগ্র ভারতভূমিকে একটি পুণ্যগণ্ডিতে রূপান্তরিত করিয়াছেন — যাহাতে কোনো পাপ স্পর্শ করিতে না পারে? দময়ন্তী, নীলা, সুরলা, রম্ভা দেবী, দ্রৌপদী — রাজকন্যা হয়েও চিন্তা ও সাধনার দ্বারা স্বেচ্ছায় কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। স্বামী অন্ধ বলিয়া গান্ধারী চোখে কাপড় বাঁধিয়া নিজেকেও অন্ধ সাজাইয়াছিলেন। রাজপুত রমণীগণ 'জহর ব্রত' গ্রহণ করিয়া স্বামী ও পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণের কাহিনী কে না জানে?
এই সকলের পুণ্য মহিমায় ভারত 'সতীর খনি'। যতই কাল গড়াইতেছে, যতই আমাদের শিক্ষায় ভ্রান্তি আসিতেছে, এই ভাব যদি মুছিয়া যায় — তবে সতীর স্পর্শধন্য মাটি, ভাগীরথীর পবিত্র স্রোত, চিরকালই কলুষ ধুয়ে দিবে। ধর্মজগতে ও কর্মজগতে ভারতের অবদান অনন্য ও অতুলনীয়। সনাতন ভারতবর্ষের মাতৃজাতির স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা ও আত্মত্যাগ — আজও চরিত্রের দৃঢ়তার চিরন্তন প্রতিচ্ছবি হইয়া ফুটিয়া উঠে, এবং সবাইকে বিমোহিত করে।

লেখা আমি শেষ করলাম, অনেক লেখার আশা। গুরুদেব, তুমি আমায় দিও আশীর্বাদ, দিও ভালোবাসা। লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি হলে মার্জনা করবেন ।

চিরস্থায়ী প্রেম

সমর মুখোপাধ্যায়

আজকাল এই এক জ্বালা হয়েছে পিটারের। রাত্রে কয়েক বার ঘুম ভেঙে যায়, বাথরুমে যেতে হয়। ঘুমের মধ্যে হয়তো সুন্দর একটা স্বপ্ন চলছে, টিভি সিরিয়ালের মত, তার মধ্যে উঠতে হয়। কি ঝামেলা। তারপর আরও ঝামেলা হল, বাহার ফাতোয়া জারি করে দিয়েছে, আলো জ্বালিয়ে যেতে হবে। অন্ধকারে হাঁটা একেবারেই মানা। "ধপ করে কোথায় হোঁচট খেয়ে পড়বে মুখ থুবড়ে – ব্যস, হাড় ভাঙবে, নয়তো মাথা ঠুকবে। তখন আমার হবে মরণ"। মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে মনে থাকে না পিটারের। পরে যখন মনে পড়ে, ভয়ে ভয়ে থাকে বাহার যেন টের না পায়, প্রচন্ড বকুনি লাগাবে। কিন্তু সব সময় দেখা যায়, বাহার টের পেয়েই যায়, আর পিটার দেখে ঘুমের ঘোরেই রিমোট টিপে আলোটা জ্বেলে দিয়েছে। বকুনিটা অবশ্য মুলতুবি থাকে সকালের জন্য। আজও তাই হল, ফেরার সময় দেখে আলোটা জ্বলছে। বাহার নিশ্চয় কখন জ্বালিয়ে দিয়েছে। শুয়ে পড়ল পিটার, ধোলাইটা সকালে হবে নিশ্চিত। আজ ঘুমটা আর আসছে না। গত মাসে ওদের বিয়ের তেতাল্লিশ বছর পূর্ণ হল, এখনো বাহারের বকুনি ওকে কাতর করে দেয়, যদিও ভাল মতই জানে, ওর ভালোর জন্যই বলে। আবার সেই তেতাল্লিশ বছর আগের কথা মনে পড়ে যায়।

যুবক পিটার তখন জার্মানীতে US Base এ পোস্টেড। সেবার একটানা দশ মাস কাজ করার পর বারো দিনের ছুটি পেয়েছে, যাকে বলে R&R। এ রকম ছুটি পেলেই পিটার চেষ্টা করে ইউরোপের এক একটা দেশ দেখার। কবে পোস্টিং শেষ হয়ে যায়, তার আগে যতটা পারা যায়, ঘুরে নেওয়া। আবার কবে সুযোগ আসে। এবারে ইটালি ঘুরে দেখার প্ল্যান। রোম ভাল করে দেখার পর ট্রেনে চড়ে বসেছে ভেনিস যাবে বলে। ইউরোপে এই ট্রেন সিস্টেম পিটারের খুব পছন্দ। বিশেষ করে আমেরিকা থেকে এসে। সারা ইউরোপ আরাম করে ঘুরে বেড়ান যায়, এত ভাল নেটওয়ার্ক। যে কামরায় পিটার বসেছে সেটা চেয়ার কার। কিন্তু সব সীটগুলো একদিকে মুখ করে নেই, দুটো করে রো মুখোমুখি বসানো। পিটার একটা প্যাসেজের ধারের সীটে বসেছে। কিছুক্ষণ বাইরের দৃশ্য দেখছে, কিছুক্ষণ crossword করছে, এইভাবেই সময় কাটাচ্ছিল। হঠাৎ চোখ পড়ল, কয়েকটা রো সামনে প্যাসেজের ধারের সীটে ওর দিকে মুখ করে একজন বসে আছে। পিটারের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেল। মনে হল এত সুন্দর কাউকে ও প্রথম দেখল। একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরে ওর সম্বিৎ ফিরে আসতে একটু অপ্রস্তুত হল, "কিছু মনে করে নি তো, এইভাবে তাকিয়ে ছিলাম"। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল।

মাঝে মাঝে আড়চোখে একটু দেখছিল না, তা নয়। পিটার অনুমান করতে চেষ্টা করছিল, কোন দেশীয় মেয়ে উনি। কোন মিড্‌ল ইষ্টার্ন দেশের হবে, কিন্তু ঠিক কোন দেশ বুঝতে পারল না। এইসব ভাবছে, এই সময় সে উঠে দাঁড়িয়ে এই দিকেই আস্তে লাগল। পিটারের হৃৎপিন্ড তখন তার মুখে উঠে এসেছে। তারপর ওকে পেরিয়ে চলে যেতে পিটার বুঝল বাথরুমে যাচ্ছে নিশ্চয়। যে বাথরুমে যায়, সে ফিরেও আসে। পিটার পিছন ফিরে থাকলেও বুঝতে পারল ফিরে আসছে। কিন্তু একি? তার সীটের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে যে। পিটার মুখ তুলে তাকাল, শুনল বলছে, FLORAL। পিটার অবাক হয়ে বলল, "কি বলছেন?" "26 down, আপনার crossword এ। Clue টার উত্তর হচ্ছে FLORAL।" বলে গটগট করে নিজের সীটে গিয়ে বসে পড়ল। পিটার সামনের সীট পকেটে রাখা ম্যাগাজিন থেকে crossword করছিল। এই শব্দটা কিছুতেই মাথায় আসছিল না। ছয় অক্ষরের শব্দ, ক্লু ছিল, Like some fabric pattern। L আর R নিয়ে বসে ছিল অনেকক্ষণ। Floral শব্দটা সুন্দর ফিট করে গেল। কিছুক্ষণ পরে একটু সাহস সঞ্চয় করে, আর ধন্যবাদ দেবার অজুহাত তো আছেই, পিটার গুটি গুটি গিয়ে বলল, "ধন্যবাদ, আপনি তো খুব ভাল ইংরিজী বলেন। আপনি কি করে জানলেন crossword টা?" "সব সীট পকেটেই ওই ম্যাগাজিনটা আছে। আমি আগেই করে ফেলেছি। দেখলাম আপনি আটকে গেছেন, তাই বললাম।" পিটার কিছু না ভেবে চিন্তে বলেই বসল, "আমি রেষ্টূরেন্ট কারে যাচ্ছি কফি খেতে। আপনিও আসুন না।"

ঘন্টা খানেক বসে ছিল কফি নিয়ে। ইরানের মেয়ে, কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান। নাম জানল বাহার। মানে জিজ্ঞেস করাতে শুনল, মানে হচ্ছে Spring কিংবা Bloom। পিটার স্বভাবতঃই বলে বসল, "এই নাম আপনাকে ঠিক মানায়"। বাহার মুখটা একটু "থাক খুব হয়েছে" টাইপের ভেংচে নিজের জীবনের গল্প বলতে শুরু করল। ইরানে ওদের জীবন বেশ ভাল ছিল। "আমরা ক্রিশ্চিয়ান হওয়া সত্ত্বেও কোন সমস্যায় পড়তে হয় নি। বাবা ভাল কাজ করতেন, লেখাপড়াও ভাল হয়েছে। তারপর এল ৭৮ সাল। সারা দেশে বিপ্লব। সে সব কথা তো পৃথিবীর সবাই জানে। আমার বাবা দূরদর্শী ছিলেন। আগেই বুঝে গিয়েছিলেন আমাদের পক্ষে ইরানে থাকা আর নিরাপদ হবে না। মা আর আমাকে দেশ থেকে পাঠিয়ে দিলেন। প্রথমে ইরাক, সিরিয়া হয়ে তারপর ইস্তাম্বুল। সবশেষে ইটালী।

এখানে কয়েক জায়গায় ঘুরে, পরে ভেনিসে রয়ে গেছি মা আর আমি। অনেক আগেই বাবা প্রায় সব টাকা একটা আর্ন্তজাতিক ব্যাঙ্কে সরিয়ে দিয়েছিল। সন্দেহ এড়ানর জন্য বাবা নিজে রয়ে গেছে। এখন তো আসা একেবারেই অসম্ভব। আমাদের আশা এই যে কখনো সুযোগ পেয়ে যাবে পালিয়ে আসতে। এখন পিটার লক্ষ করল ওর চোখ দুটো ছল ছল করে উঠেছে। কি বলবে এই সময়? শুধু একটা হাত টেবিলের ওপর রাখা বাহারের হাতের ওপর রাখল। "যাক গে এসব কথা, এবার তোমার কথা বল"। পিটার বলল, "তুলনায় আমার তো খুবই সাদামাটা জীবন। বাবা, মা এক ভাই, সবাই আটলান্টায় থাকে। আমি আর্মি জয়েন করেছি। বোধহয় তোমার সাথে দেখা হবার উদ্দেশ্যেই"। বাহার মুখ বেঁকিয়ে বলল, "আহা, কি কথার ছিরি। আচ্ছা বল, ভেনিসে তোমার প্ল্যান কি?" "কোন প্ল্যানই নেই। সব ট্যুরিষ্টরা যা যা করে, সেই সব আর কি"। বাহার বলল, "তোমার কোন গাইড চাইলে বোলো, এই শহরটা আমার খুব ভাল ভাবে চেনা"। পিটারের বুকটা ধক করে উঠল। এ তো দেখি, মেঘ না চাইতেই জল।

পরের চারদিন খুবই আনন্দে কাটল। বাহার রোজ সকালে ওর হোটেলে চলে আসত। সারাদিন ঘোরাঘুরি, সন্ধ্যেবেলায় ডিনার করে ওকে হোটেলে নামিয়ে বাড়ী চলে যেত। কত নামকরা জায়গা দেখাল, কত ইন্টারেষ্টিং তথ্য জানাল। লর্ড বায়রন কোন বাড়ীতে থাকতেন চোদ্দটা চাকর, দুটো বাদঁর আর একটা খেঁকশিয়াল নিয়ে, পিয়াজ্জা লা সান মার্কোসের কোন কাফেটায় বসে শেলী কবিতা লিখতেন এই সব। তা ছাড়া ডোজেস প্যালেস, মুরানো দ্বীপের কাঁচের কারখানা, রিয়ালটো ব্রীজ, গ্র্যান্ড ক্যানালে গন্ডোলা চড়া। একটা ছোট পুল যেখান দিয়ে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত লোকেদের নিয়ে যাওয়া হত, বায়রন তার নাম দিয়েছিলেন bridge of sighs ।

পিটারের ফেরার দিন এসে গেল। ইতিমধ্যে দুজনেরই মানসিক অবস্থা যা তাতে একে অন্যকে ছেড়ে থাকা অসম্ভব হয়ে গেছে। সিনেমায় যে রকম হয়, মাকে জানিয়ে বাহারও ট্রেনে উঠে বসল, যা থাকে কপালে বলে। তারপর সব কিছুই যেন একটা ঘোরের মধ্যে হয়ে গেল। বাহারের জন্য base এর কাছে একটা থাকার জায়গা ঠিক করে, বিয়ের পার্মিশনের দরখাস্ত করে দিল। আর্মি থেকে যা যা এনক্যোয়ারী করার সব করা হল, তারপর ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গেল। তারপর আর্মির কোর্টেই বিয়ে হয়ে গেল। পিটার আর বাহারের সুখের দিন শুরু হল। জার্মানির ডিউটি শেষ হতে দেশে ফেরা হল, পরপর দুটি ছেলে হল, তাদের বড় করা হল, আর্মি থেকে রিটায়ার করে নতুন চাকরি নেওয়া হল। কোথা থেকে তেতাল্লিশ বছর কেটে গেল – যেন স্বপ্নের মত। দুজন দুজনের বন্ধু, সহায়, soulmate। তার পরেই হল বিনা মেঘে বজ্রপাত।

বছর খানেক আগে। বিশ্বাস না করতে চাইলেও বিশ্বাস না করে উপায় নেই। বাহারের ক্যান্সার ধরা পড়ল। অনেকটা ছড়িয়ে গেছে। পিটারের মাথায় বজ্রপাত, ছেলেরাও আকুল। এই অবস্থায় হাল ধরল বাহার। আস্তে আস্তে পিটারকে মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত করতে লাগল, একলা থাকার তালিম। তারপর, দু দিন আগে, দু ছেলে আর পিটার পাশে, ডাক্তারের সামনে, ধীরে ধীরে চোখ বুজল। পিটারের সামনে পৃথিবীটাই যেন অন্ধকার হয়ে গেল।

দুই ছেলে যেন প্রাণ দিয়ে পিটারকে আঁকড়ে ধরে ছিল, নয়তো পিটার কি করত সে জানে না। গতকাল অন্ত্যেষ্টি সারা হয়েছে। তারপর সারা দুনিয়া খালি।

আজ ভোরবেলা এত বছরের সব কথা একটু একটু করে মনে পড়ল। আর মনে পড়ল, গত কালের শেষ কাজের কথা। কত লোকজন, কত স্মৃতি বিচারন। এসব কথা ভাবতেই, হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সোজা হয়ে বসল পিটার। কাল রাত্রে যখন ও বাথরুমে ছিল, তখন ওর জন্য আলোটা জ্বালালো কে?

চলবে চলবে

শঙ্কর বসু

কানামাছি অলিগলি এলোচুল বনমালী
হাতঘড়ি হরিলুঠ সাদাকালো হলিউড
পথ ভুলে পথ চলি রাস্তা হারিয়ে ফেলি
ভুলে যাওয়া যত কথা কানে কানে বলবে
আমাদের বেঁচে থাকা চলবে চলবে।

চিতপুর পালাগান পিলখানা রমাদান
পিকে চূনী বলরাম শুনশান ময়দান
ঘরে ঘরে বাতি নেই হাথি মেরা সাথী নেই
হারিয়েছে সময়ের ভিড়ে,
সন্দেশ দরবেশ ফেলু ঘনা ব্যমকেশ
বনলতা চোখ তাই ফিরে গেছে নীড়ে,
হেলে আসা হিমঘরে বরফ যে গলবে
এ ভাবেই বেঁচে থাকা চলবে চলবে।

মরু চাঁদ মঙ্গল যে চুলোয় বাঁধি ঘর
ফুটপাথ সংসারে হকার পুলিশ মারে
কেষ্টারা বাজিমাৎ করবে,
খোকাদের দাদাগিরি ভোটাভুটি জাদুকরি
বেগুণী কুয়াশা হয়ে কাল ভোর ভরবে,
বেলাগাম সংগ্রাম বন্ধ কলের গান
ফুতফুত চীনে বাতি ইতিউতি জ্বলবে
এভাবেই বহুদিন চলবে চলবে।

ছেলেবেলা

অভিজিৎ রায়

ছেলেবেলার স্মৃতি আজও ভেসে আসে চোখে
গভীর রাতের হটাৎ কোনো স্বপ্ন যেন দেখে,

সেই ছেলেবেলার ছিল দিনগুলো কি আজব মিষ্টি
মন নেচে উঠতো দেখে সেই মুশল ধারে বৃষ্টি ...

হাতরে বেড়াই সেই হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলা
বাড়ির উঠানে ঘাসের সবুজে কতরকম খেলা,

মন কে জিজ্ঞেস করি হারিয়ে কেন গেলো সেই দিন?
সবই আছে আজ, কিন্তু আমার প্রাণ যে নিস্তেজ আর মলিন ...

ইচ্ছে হয় মাঠের আঙিনায় ঘুড়ি উড়াই আমি
মনে আছে ঘুড়ির মতো ভোকাট্টা হয়েছিল কবির সেই "তুমি",

তাইতো হারিয়ে গেছি আজকের যাঁতাকলে নিজেই যে আমি,
এখনো কি খুঁজে বেড়ায় কবির সেই ভোকাট্টা মিষ্টি "তুমি"?

পেতলের পরী

ইমরোজ নাওয়াজ রেজা

৭ টার দিকেই তো বাড়ি ফেরে রোজ সমীরণ। টিং-টং। কলিং বেলের আওয়াজ। তারপর হাতমুখ ধোয়, এক কাপ চা নিয়ে বসে। এই তার বরাবরের অভ্যাস।

সুতপা দরজার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করে। সমীরণের? নাকি কলিং-বেলের? ভাত চাপায় দুজনের। চায়ের জলটাও কি বসিয়ে রাখবে? সুতপা ইতস্তত করে।

জানলার বাইরে একটা বাদুড় ডানা মেলে উড়ে যায়। শহুরে যান্ত্রিকতায়ও ওরা হারিয়ে যায় নি। গভীর রাতে ক্বচিৎ পেঁচার চ্যাঁ-চ্যাঁ আওয়াজও শোনা যায়। একবার মধ্যরাতে বেশ একটা জোরালো আওয়াজে সুতপার ঘুম ভেঙে গেছিল! বাইরে তাকিয়ে দেখে দুধের মত সাদা জোৎস্না। চরাচর যেন ভেসে যাচ্ছে। আর তারই মধ্যে জোরালো প্রচন্ড চ্যাঁ চ্যাঁ আওয়াজ। বার বার। সুতপা মুখ বাড়ায়। ও কিসের শব্দ? এমন মধ্যরাতে? দেখে পাশের বাড়ির ছাদে উড়ে আসে এক বড়সড় লক্ষী পেঁচা। বসতে না বসতেই আরেকটি প্যাঁচা জোরালো আওয়াজ করতে করতে এসে ওকে ঠোক্কর মারে। আবার উড়ে যায়। দূরে গাছের দিকে ডানা মেলে। একটু পরেই হুটোপুটি করতে করতে যেন ওদেরই বারান্দার দিকে বসে; আবারও প্রচন্ড আওয়াজ করে। নিশ্চুপ পৃথিবীর বুকে ধুয়ে যাওয়া এক জ্যোৎস্না মধ্যরাতে সাদা ডানা মেলে দুটি পাখি এমন মারামারি করতে থাকে! ২ মিনিট? ৪ মিনিট? ১০ মিনিট? কতক্ষণ কেটে যায় সুতপা জানে না।

কলিং বেলটা বাজছে না কেন? এমন দেরী তো সচরাচর সমীরণ করে না! এদিকে ফোনটাও বন্ধ। গ্যাসটা একটু কমিয়ে দেয় সুতপা। টিভি সে দেখে না! সারাক্ষণ নিউজ চ্যানেলগুলো খবর দেখানোর নামে অকারণে চিল্লিয়ে যাচ্ছে। অথবা অখাদ্য সব সিরিয়াল। বরং দু-একবার ডিসকভারি চ্যানেল দেখে; কিংবা অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট। আচ্ছা, পেঁচাদুটো সেদিন কি মারামারিই করছিল? নাকি ওরা পরস্পরকে ভালবাসছিল? প্রেমেরই কি প্রকাশ ছিল ওদের অমন চিল-চিৎকারে? নাকি শুধুই রাগের?
সমীরণও কি রাগ করে কখনো? কিংবা সুতপা? অফিস যাবার সময় পরিপাটি ভাত বেড়ে দেয় সুতপা। টিফিনটা ব্যাগে দেয় গুছিয়ে। তারপর সমীরণের আগের দিনের জামা-কাপড় কেচে-শুকিয়ে ইস্ত্রি। সুতপার কি বসার জো আছে?
আজ অবশ্য সুতপার যেন অখন্ড অবসর। কফির মাগ বার করে ব্ল্যাক কফি খায় আয়েশ করে সে অনেক দিন পর। সমীরণ কি জানে সুতপা কফি খেতে ভালবাসে? টুং করে একটা শব্দ হয়। কলিং বেলের কি?

নাহ! নিচের ফ্ল্যাটেই মনে হয়। সুতপা আজ নীল শাড়ি পরেছে। এই নীল শাড়িটা অবশ্য সমীরণের খুব অপছন্দের। কিন্তু শাড়ির পাড়টা কেমন সুন্দর! সুতপার তো বেশ লাগে। টক-টক একটু আলু কাবুলিও কি বানাবে সুতপা আজ? তেঁতুল তো আছেই মিড-সেল্ফে। সমীরণকে লুকিয়ে সুতপা অনেকদিন রেখে দিয়েছে। তেঁতুল সমীরণ পছন্দ করে না।

৭ টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। এখন প্রায় মাঝরাত। আজও জোৎস্না। আজ যদি পেঁচাদুটো আসে? পরস্পরকে ঠোক্কর দিয়ে ডানার অবিরাম ঘসটানি। উড়ে যাওয়া- ফিরে আসা। সুতপা নিঁখুত করে মেঝে পরিষ্কার করে। পেতলের পরীটা মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। ওকে কোলে নিয়ে বসে সুতপা কলিং বেলের প্রতীক্ষা করে। ভুলে গেছিল গ্যাসে ভাত বসিয়েছিল। ভাত পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে গেছে যে। চায়ের জলটা ভাগ্যিস বসায় নি।

এই মাঝরাতে সত্যিই কি কেউ আসবে? মনে হয় না। এলে দেখতে পেত, বিছানার উপুড় হয়ে পড়ে আছে কেউ। মাথায় চাপ চাপ রক্ত, বালিশটা লাল হয়ে আছে এখনো। বালিশ-তোশক-কাঁথা-পুরোনো চাদর। চটচটে কালচে লাল। শুকিয়ে আসছে।

পুবের আকাশ লাল হবার আগে, যদি পেঁচা দুটো আসে সুতপা জেনে নেবে - ওদের কি ভালবাসা ছিল কখনো? নাকি শুধুই ডানার হিংস্র ঝাপটানি? মাঝরাতের জোৎস্না চুঁইয়ে পড়ছে বাইরে বিল্ডিং-এর ছাদগুলোয়, বারান্দার গ্রিলের ফাঁকে, সুতপার চাপ চাপ ভেজা বিছানায়, বালিশে..

পুবের আকাশ লাল হবার আগে, পেঁচা দুটো যদি আসে, পেতলের পরীটা ওদেরই সাথে উড়ে যাবে তবে।

আনো শান্তির বাণী

বিশ্বনাথ পাল

যুদ্ধবাজেরা হয়নি এখনো শেষ
আজও তারা লুঠের নেশায় ধ্বংস করছে দেশ।

ইতিহাসের পাতায় দেখি কতনা যুগের কথা
প্রস্তর-যুগ মধ্য-যুগ সমান বর্বরতা
হয়ত তা ছিল বাঁচার তাগিদে
লড়াই চলেছে যুগ হতে যুগে
ধুলোয় মিশেছে কত জনপদ, কত শোক, কত ব্যথা
ইতিহাস তবু লিখেছে কেবল বিজয়ীর জয়গাঁথা।

এযুগেও দেখি যুদ্ধবাজেরা চলেছে সদলবলে
মেকি সভ্যের মুখোশ পরেছে, বর্বরতা তলে
একদা নিয়েছে শাণিত কৃপাণ
আজ হানা দেয় যুদ্ধবিমান
লক্ষ্য হয়েছে কখনো জাপান, ইরাক বা আফগান
ধ্বংস আর মৃত্যুর কাছে অতীত হয়েছে ম্লান।

তাদেরই জয়জয়কার আজ বিশ্বের দরবারে
সভ্য জাতির কেতন উড়িয়ে চলেছে অহংকারে
এযুগে তারাই অগ্রগণ্য
মানুষকে যারা করেছে পণ্য
হরণ করেছে ধনধান্য ছলে-বলে-কৌশলে
পৃথিবীটা আজ খেলার পুতুল তাদেরই করতলে।

তবু আশা এই মারণযজ্ঞ একদিন হবে শেষ
একদিন আর থাকবেনা কোনও হিংসা বা বিদ্বেষ
জানিনা সেদিন আসবে যে কবে
শান্তিবারতা কে এসে শোনাবে?
বুদ্ধ যীশু পারেনি ফেরাতে মানুষেরে শুভ পথে
কোন সে দেবতা আসবে আজিকে শুভ্র পুস্পরথে?

পথের রহস্যে আতঙ্কিত ক্ষুদ্‌দা

অনুপম গুপ্ত

ক্ষুদ্‌দা ভাবছেন পথ নিয়ে কত বিখ্যাত ব্যক্তি কত গান লিখেছেন বা গেয়েছেন। দাদা সেইসব সুন্দর গানগুলো গুন্‌গুন্ করে নিজের বেসুরো গলায় গাইছিলেন। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের – 'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ। খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত'। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের – 'বন্ধু তোমার পথের সাথীকে চিনে নিও'। অথবা 'পথে এবার নামো সাথী, পথেই হবে পথ-চেনা'। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের দ্বৈত কণ্ঠে 'এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হত তুমি বলতো'।

এইসব কবিতা বা গান দিয়ে পথ সম্পর্কিত কত রকম মনের ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন, বোঝানো হয়েছে একটা নির্দিষ্ট পথের ভিতর দিয়েই আসে রৌদ্র ছায়া বর্ষা বসন্ত অর্থাৎ ঋতুচক্র। আবার পথই পথের সাথীকে চিনে নেওয়ার উপদেশ দেয় এবং পথে নেমে পথকে চেনার বাণীও শোনায়। রোমাঞ্চকর ভ্রমণের সময় মনে হতেই পারে এই পথ শেষ না হয়ে চলতেই থাকলে নিশ্চয়ই অনেক ভালো হত।
পথ নিয়ে এত উপক্রমণিকার দরকারই হত না যদি না জাপানে তার পরিবার নিয়ে বেড়াতে গিয়ে পথ হারানোর দু-দুটো ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হত ক্ষুদ্‌দার।

২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্ষুদ্‌দা জাপান থেকে কোলকাতায় ফিরে এসে জাপানে পথ হারানোর দুটো ঘটনা যেই আমাদের কাছে বলতে শুরু করলেন, ওমনি বড় নাতনি ফুচা, যে বর্তমানে কোলকাতাবাসী, মনে করিয়ে দিল, সুকুমার রায়ের হযবরল'তে হারানো পথের কথা লেখা আছে। "পথ আবার যাবে কোথায়'? যেখানকার পথ সেখানেই আছে। পথ কি আবার এদিক ওদিক চড়ে বেড়ায়? না দার্জিলিং'এ হাওয়া খেতে যায়? ফুচা বললো, 'হারিয়ে যায় টাকা, পয়সা বই খাতা ছাতা গয়না এই সব। তোমরাই তো বল তোমাদের ছোটবেলার স্মৃতি নাকি হারিয়ে গেছে। যাইহোক, তুমি জাপানে তোমাদের পথ না চেনার ভয়াবহ দুটো অভিজ্ঞতার কথা বল"।

ক্ষুদ্‌দা জাপানে পথ হারানোর বা পথ না চেনার দু-দুটো ঘটনার কথা সবিস্তারে বলতে লাগলেন যা এখানে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং সম্ভব হলে টোকিও'র শারদীয়া পত্রিকা 'অঞ্জলি'তে মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হতে পারে।

প্রথম ঘটনাটা দিনের বেলায় একটু হাল্কা ধরনের পথ গুলিয়ে ফেলার ঘটনা হলেও, পরের ঘটনাটা ঘটেছিল রাতে এবং ভয়াবহ রকমের। মনে হচ্ছে প্রথম ঘটনাটা ক্রিকেটের T20 এবং পরেরটা তুলনা করা যায় ক্রিকেটের One Day International Match'এর সঙ্গে।
প্রথমে শুরু করা যেতে পারে জাপানে অচেনা জায়গায় পরিবারের এক শিশুর হঠাৎ অভিভাবকহীন হয়ে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার এক অমার্জনীয় অপরাধের ঘটনা নিয়ে। দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটেছিল সপরিবারে পাহাড়ে এবং রাতে, যদিও প্রথম ঘটনাটা ঘটেছিল সমতল ভূমিতে এবং দিনে।

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৭ তারিখে ক্ষুদ্‌দা রমলা বৌদি জাপানে তাদের ছোট ছেলের কাছে গেলেন। তার কিছু দিন পরেই কারুইযাওয়া বলে একটা জায়গায় যাওয়ার প্রোগ্রাম ঠিক করা হল।

প্রথম গন্তব্য স্থল ছিল কারুইযাওয়া টয় কিংডম। ওখানে তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সূয্যিমামা কোলকাতাবাসীদের দিকে তখনও উগ্রমূর্তিতে তাকিয়ে থাকলেও, কারুইযাওয়ার লোকেদের দিকে তাকানোর কথা তাঁর মনেই নেই। জাপান দেশের অধিবাসীদের গায়ে তেমন যুৎসই গরম জামা দেখা না গেলেও কোলকাতা থেকে জাপানে আসা আগন্তুকরা ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ভাবছে আলাস্কার ঠাণ্ডা এখানকার ঠাণ্ডা থেকে খুব একটা বেশি হবে কি? ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে নর্থ পোলের এস্কিমোদের সঙ্গে ক্ষুদ্‌দা ও বৌদি সহমর্মী হচ্ছিলেন। গাড়িতে অনেক গরম জামা আনা হলেও ভুলবশতঃ নামানো হয়নি। বারান্দার মতো একটা জায়গায় দাদা বৌদিকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। ওরা ভাবলেন এক জায়গায় বসে না থেকে একটি ঘুরে টয় কিংডমটা একটু দেখলে ভাল হত। কিন্তু দুটো অসুবিধা ছিল। প্রথমত উন্মুক্ত মাঠে ঘুরে বেড়ানোর মানে নর্থ পোলের বাধাহীন কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া দাদা বৌদিকে জড়িয়ে ধরবে। দ্বিতীয়ত, পথ হারানো একশ শতাংশ নিশ্চিত, এবং ভাষার সমস্যায় আগের জায়গায় আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

প্রথম পথবিভ্রাটের ঘটনাটা T20 ম্যাচের সাথে তুলনা করা হয়েছিল। এই T20 ম্যাচ গ্রাউন্ডের নাম কারুইযাওয়া টয় কিংডম। সেখানে প্রচুর খেলা, প্রচুর রাইডের ব্যবস্থা আছে। সীমিত সময়ের মধ্যে অতগুলো খেলায় অংশ গ্রহণ করতে গেলে সময়ের অভাব হতে পারে। তার মানে ছেলে, বৌমা এবং নাতি তিনজনেই ছুটছে, লাইন দিয়ে টিকিট কাটছে এবং অংশগ্রহণ করছে। যত অংশগ্রহণ করছে ততই উৎসাহের পারদ চড়ছে। এই উৎসাহের আতিশয্য একসময় তাদের তিনজনকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। বাবা মা মোবাইল ফোনের সাহায্যে পুনর্মিলিত হতে পারলেও, ছেলে পুটকু সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। পুটকুকে তার বাবা মা পাগলের মতো খুঁজছে, কিন্তু অত ভিড়ের মধ্যে তাকে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কবি নজরুল ইসলাম হয়তো এই পথহারা শিশুর কথা ভেবে আগাম লিখে গেছেন এবং প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছেন – "পথহারা পাখি খুঁজে ফেরে একা"।

পুটকু কিন্তু সাহসের পরিচয় দিয়েছে। অত ভিড়ের মধ্যে বাবা মাকে খুঁজে না পাওয়ার জন্য খুব ভয় পেলেও কাঁদেনি এবং একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। এই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাতে একটা সুবিধা হয়েছিল। মেলা কর্তৃপক্ষের এক ভলান্টিয়ার দেখেছে অনেকক্ষণ ধরে একটা বিদেশি শিশু একা দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো শিশুটি তার বাবা মাকে খুঁজছে। ভলান্টিয়ার ভাবলো আগে শিশুটির মনোবল বাড়ানো দরকার। পুটকুকে ওদের অফিসঘরে নিয়ে গিয়ে কিছু খেলনা এবং ড্রইং পেপার ও পেন্সিল দিল ছবি আঁকতে বা খেলনা নিয়ে খেলতে। বাবা মা হন্যে হয়ে খুঁজে কোথাও পুটকুকে না পেয়ে অফিসঘরে গিয়ে দেখে তাদের পুত্র একের পর এক ছবি এঁকে যাচ্ছে। স্কুলের ড্রইং ক্লাসের আঁকা থেকে অনেক ভাল অঙ্কন শিল্প বলেই মনে হল। T20'র দুজন আম্পায়ার কিছু করতে না পারলেও থার্ড আম্পায়ার মানে ওই ভলান্টিয়ার কিন্তু ম্যাচের শঙ্কিত পরিণতিকে 'মধুরেন সমাপয়েত' করে দিল। পরের আকর্ষণীয় আইটেম লাঞ্চ মনে হয় বেশ ভালই হয়েছিল।

T20 ম্যাচ ভালভাবেই উৎরে গেল। আয়োজক দেশ জাপান এবং প্লে গ্রাউন্ড কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ কারুইযাওয়া টয় কিংডমের ম্যানেজমেন্ট সুন্দরভাবে ম্যাচ পরিচালনা করার জন্য গেস্ট টিমের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা পেলেন। ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ করা হল পুটকুকে এবং বাবা মা'কে ভবিষ্যতের ম্যাচের জন্য সতর্ক করা হল।
পরবর্তী ঘটনা ঘটেছিল রাতে এবং যা কোনদিনও ভোলা যাবে না। সেই ভয়াবহ ঘটনাকে ক্ষুদদা ক্রিকেটের One Day International ম্যাচের মতন করে বর্ণনা করেছিলেন।

Toy Kingdom-এ T20 ম্যাচের পরের দিন, আটই অক্টোবর, ২০২৩, যাওয়া হল চার হাজার ফুট উঁচুতে জঙ্গলঘেরা এক পাহাড়ে। ওই জঙ্গলের মধ্যে সুন্দর সুন্দর রিসর্ট আছে। নাম Holiday Villa Hotels & Resorts. সবগুলোই লগ হাউস। প্রতিটি কাঠের কুটিরে আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধাভোগের ব্যবস্থা আছে। জঙ্গলের মধ্যে কাঠের কুটির এবং চারপাশে আধো অন্ধকার পরিবেশ দেখলে মনে হতে পারে হলিউডের কাউবয় মার্কা ক্রাইম থ্রীলারের সিনেমাগুলোর শুটিং নিশ্চয়ই এখানে হত। মনে হবে টুপিতে মুখঢাকা ঘোড়সওয়ারী পিস্তল হাতে নিয়ে এক্ষুণি ঘোড়া থেকে নেমে আধো অন্ধকার কুটিরে ঢুকে যাবে। (হলিউড ফিল্মের পরিচালক জন স্টার্জেস পরিচালিত এবং ইয়ুল ব্রায়নার অভিনীত "ম্যাগনিফিসেন্ট সেভেন" সিনেমার কথা মনে হতে পারে।)
দিনের শেষলগ্নে ক্ষুদ্দা সপরিবারে আগে থেকে বুক করে রাখা একটা লগ হাউসে ঢুকে গেলেন। সকলেই একটু বিশ্রাম নিলেন। স্থানীয় পরিবেশটা দেখার জন্য দাদা একটু বাইরে বেরোলেন। ঘোড়ায় চেপে পিস্তল হাতে তখন কেউ সামনে না আসলেও জঙ্গলের ভিতরে সারা বছর যারা থাকে তারা তো যখন তখন সামনে এসে আক্রমণ করতে পারে। তাদের রাজ্যে সমতল ভূমির শহুরে বাসিন্দাদের তারা অবাঞ্ছিত মনে করতেই পারে এবং খুব একটা ক্ষতি না করে সামান্য একটু র‍্যাগিং করার ইচ্ছা হতে পারে। তার থেকে ঘরে ঢুকে যাওয়াটাই ভাল।

নৈশ আহারের জন্য যাওয়া হল জঙ্গলের মধ্যে আধ ঘণ্টা পথ পেরিয়ে একটা আধুনিক রেস্তোরাঁয়। এখানেও অনেক নতুনত্ব। পাহাড়ে এবং জঙ্গলের মধ্যে একটা সমতল জায়গায় অনেক ধরনের রেস্তোরাঁ আছে। জঙ্গলের মৌলিক পবিত্রতা বা ফরেস্টের ভার্জিনিটি যাতে অক্ষুন্ন থাকে তার জন্য কোনও উগ্র আলো নেই। পথের খাঁজে খাঁজে পথ চলার সুবিধার জন্য টিমটিমে আলোর ব্যবস্থা রয়েছে যাতে জঙ্গলের স্থায়ী বাসিন্দাদের শান্তি বা ঘুমের কোনও ব্যাঘাত না হয়।
যাইহোক, শেষ পর্যন্ত একটা রেস্তোরাঁতে নৈশ আহারের জন্য সবাই গেলেন। জঙ্গলের স্থানীয় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি থাকলেও কোলকাতার ঝুপড়িবাসীদের মতন কাঠের আগুন জ্বালিয়ে উত্তাপ গ্রহণ একদম নিষেধ। যদি একান্তই শরীরকে উষ্ণ রাখতে হয়, তাহলে কাঠের পরিবর্তে ইলেকট্রিক হিটারের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

নানারকম সুস্বাদু খাবার পরিবেশিত হলেও ক্ষুদ্দা কিন্তু কিছুই প্রায় খেতে পারছিলেন না। দাদা সব সময়ই শঙ্কিত ছিলেন জঙ্গলের এই পথ পেরিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। রবীন্দ্রনাথের একটা গানের কথা মনে পড়লো –
"তিমিরময় নিবিড় নিশা নাহিরে নাহি দিশা –
একেলা ঘন ঘোর পথে, পান্থ কোথা যাও"।।

কিন্তু এই তিমিরময় নিবিড় নিশাতেই সবাইকে বাড়ি মানে ঐ কাঠের বাড়িতেই ফিরতে হবে। সবাই গাড়িতে ওঠার পর গাড়ি চলতে শুরু করলো। চারিদিক অন্ধকার, আলোর লেশমাত্র নেই। তার ওপর আছে চার হাজার ফুট পাহাড়ের উচ্চতা এবং সঙ্গীতে তবলা সঙ্গত করার মতো এখানে আছে শৈত্যপ্রবাহ। এরই মধ্যে গাড়ি চলছে। কিছুক্ষণ চলার পর মনে হল ঘুরে ফিরে একই জায়গায় আসছে। এ আবার কী? এতো সুকুমার রায়ের ঠিকানা কবিতার সাথে মিলে যাচ্ছে –
"তবেই আবার পড়বে এসে আমড়া তলার মোড়ে
তারপরে যাও যেথায় খুশি – জ্বালিও না কো মোরে"।
সবাই খুবই শঙ্কিত হলেও পুটকুর বেশ মজাই লাগছিল। পাহাড়ে পথ হারানোর ঘটনা স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের বলবে। পুটকুর বাবাও যে এই পথবিভ্রাটের ঘটনাতে মজা পাচ্ছিল না, সেটা বলা যাবে না। পিতাপুত্র একই রোমাঞ্চকর রসে সিক্ত।
ক্ষুদ্দা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের একটা গান কবিতার মতন করে এবং কিছুটা সুর দিয়ে যেই গাইতে শুরু করলেন –
"পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি
সোজা পথের ধাঁধায় ---"

সঙ্গে সঙ্গে বৌদি চিৎকার করে বললেন এই গান বন্ধ না করলে এক্ষুনি তিনি গাড়ি থেকে নেমে যাবেন। দাদা মনে করিয়ে দিলেন, আসার সময় পথের ধারে মাঝে মাঝেই ড্রাইভারদের প্রতি সাবধানবাণী লেখা থাকতে দেখেছেন, "ভাল্লুক যখন তখন রাস্তা পার হয়"। তার মানে ভাল্লুক তাদের রাজ্যে বহিরাগতদের উপস্থিতি মেনে নাও নিতে পারে। বৌদি বললেন ভাল্লুক তো নিরামিষাশী, তারা আমাদের কেন মারবে? কোলকাতার চিড়িয়াখানায় ভাল্লুকদের শাখালু আর কমলালেবু খেতে দেখা যেত। দাদা বোঝালেন ওদের ভালোবাসার অত্যাচারে আমরা সবাই নিহত না হলেও আহত হতে পারি। পুটকু একশ শতাংশ উৎসাহ নিয়ে গাড়ি থেকে নামার বায়না করলো। জঙ্গলের স্থায়ী বাসিন্দাদের সঙ্গে সারা রাত থাকার রোমাঞ্চকর গল্প তার বন্ধুদের বলবে। ক্ষুদ্দারও ইচ্ছে হল গাড়ি থেকে নেমে বেসুরো গলায় গান করবেন –
"আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে"।
যদিও সে রাতে খুব একটা জ্যোৎস্না ছিল না।

অনেক চিন্তাভাবনা করে গাড়ির বাইরে বেরোনোর প্রস্তাব বাতিল হল। বৌদির কাঁদো কাঁদো গলায় প্রশ্ন, তাহলে কি সারা রাত এই গাড়িতেই থাকতে হবে? পেট্রল ট্যাঙ্কের মজুত জ্বালানিতে সারারাত গাড়ির ভিতরে হিটার অন্ করে রাখা যাবে তো? গাড়ির ভিতরে সারারাত থাকতে হলে বড়রা সবাই প্রকৃতির ডাকে সংযম প্রদর্শনের চেষ্টা করলেও পুটকু কিন্তু গাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবেই। প্রকৃতির ডাক নাকি রোমাঞ্চকর গোল্ডেন অপরচুনিটির হাতছানি! বাংলার নামকরা "রঘু ডাকাতেরা" জাপানে না থাকলেও, জন্তুদের সাথে সামনাসামনি দেখাসাক্ষাত হতেই পারে। রবীন্দ্রনাথের বীরপুরুষ কবিতার মতন আর একটি ঘটনা পুটকুর জীবনে ঘটতেই পারতো। কিন্তু বড়দের জন্য তা হল না।

জঙ্গলের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের সব রাস্তা ঘুরে, সুকুমার রায়ের “ঠিকানা” কবিতাটি ভুল প্রমাণ করে তারা সবাই সুস্থ দেহে তাদের অস্থায়ী বাসস্থান লগ হাউসে ফিরে এলেন। কারোর কোনও ক্ষতি হয়নি, কিন্তু হতেই পারতো। জাপানি জন্তুরা নিরীহ নাকি হিংস্র, সেসব নিয়ে পুটকু তার বন্ধুদের কাছে আর বলতে পারলো না। ক্ষুদ্দারও পথবিভ্রাটের গল্প ইনিয়ে বিনিয়ে জাপানের শারদীয়া পত্রিকা “অঞ্জলি”তে লেখার সুযোগ থাকলো না।

কিন্তু একটা কথা জানা গেল না, কে বেশি স্থূলাঙ্গিনী ভাল্লুক না রমলা বৌদি? বৌদির হাঁটা দেখে ভাল্লুক কি হাসি চাপতে পারতো, নাকি তার করুণা হত? কিম্বা ভাল্লুক ভাবতো না তো যে তার হাঁটাকে বৌদি ভ্যাঙ্গাচ্ছে? কিম্বা হয়তো বৌদিকে বলতো ‘নি অপারেশন’ করার পরও তোমার

এই অবস্থা? এই জন্যেই তো ভাল্লুক সম্প্রদায় অর্থোপেডিক সার্জনদের কাছে যায় না।।

ভারত তীর্থ

মিত্রা মুখার্জি

কবি গুরুর ভারততীর্থ কবিতাটি বারংবার মনে পড়ে

“হে মোর তীর্থ পুণ্য তীর্থে জাগরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে”।

সদ্য ভারতবর্ষে মহাকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। তাই এই মহাবাক্যটি মহাকুম্ভ মেলা প্রসঙ্গে অনায়াসে বলা যায়।

সংস্কৃতে কুম্ভ মানে কলস। পুরাণে কথিত আছে সমুদ্র মন্থনের সময় দেবতা ও অসুরগনের মধ্যে অমৃত দখল নিয়ে লড়াই বেঁধে যায়। কারণ এই অমৃত পান করলে অমরত্ব অবশ্যই লাভ করা যাবে।

কুম্ভ ৬ বছর অন্তর একবার হয় যাকে অর্ধকুম্ভ বলা হয়, আবার ১২ বছর অন্তরও একবার হয় যাকে পূর্ণ কুম্ভ বলা হয়। মহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত হয় ১২ গুণীতক ১২ অর্থাৎ ১৪৪ বছরে একবার। ২০২৫ সাল অর্থাৎ এবছর মহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

জ্যোতিষশাস্ত্র বলে, বৃহস্পতি গ্রহের পূর্ণ অবস্হান কুম্ভ রাশির উপর হলে মহাকুম্ভ যোগ হয়।

এই মহাকুম্ভ শুধু প্রয়াগেই হয়েছে। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী এই তিন নদীর সঙ্গম স্থল হল প্রয়াগ। ভারতের এই মহাকুম্ভকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে আলোরণ পড়ে গিয়েছিল। ১৩ই জানুয়ারি এই মহাকুম্ভ যোগ শুরু হয়ছিল আর ২৬শে ফেব্রুয়ারি শিবরাত্রির দিন সমাপন হয়।

সারা পৃথিবী থেকে পুন্যার্থী এই মহাকুম্ভে যোগদান করার জন্য ভারতে এসেছিল। ফলে মহাকুম্ভ মেলা একটা মহামানবের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছিল। উদ্দেশ্য একটা এই কুম্ভে স্নান করে নিজেদেরকে পাপ মুক্ত করা ও মোক্ষ লাভ করা। কথায় আছে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর ।

মহাকুম্ভে সেই পৌরাণিক বিশ্বাস আমরা প্রত্যক্ষ করলাম।

ভারতবর্ষে সর্ব-ধর্ম সমন্বয় বিদ্যমান। এখানে গ্রহন আছে কিন্তু বর্জন নেই। মহর্ষিদের দর্শনেও আমরা সেটা পাই। “শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন”। মহাকুম্ভ মেলাতেও সেটাই প্রত্যক্ষ করলাম। কবির কথায় “বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান”। ৬৫কোটি লোক মহাকুম্ভে স্নান করতে এসেছিল এবার। প্রত্যেকের থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা ভারত সরকার খুব যত্নের সাথে করেছিল। এজন্য ভারত সরকার বিশ্বের দরবারে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

ভারতের সনাতন ধর্ম তো ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিশ্বাস ও মুক্তির কথাই বলেছে। বৈভব মানুষকে শান্তি দিতে পারেনা, সত্যকে জানতে দেয় না। একমাত্র ‘আমি’ এই অহংকে বিসর্জন দিতে পারলে, বাসনা ত্যাগ করতে পারলে তবেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এক ভারতই পেরেছে এই আধ্যাত্মিক চেতনার পথপ্রদর্শক হতে। তারই সন্ধানে বিশ্বের নানা জায়গা থেকে পুণ্যার্থীরা ভারতবর্ষে নিজেদের তাগিদে এসেছে।

কিন্তু কথায় আছে শেষ ভাল যার সব ভাল তার। মহাকুম্ভে সবই খুব ভাল ভাবে সুন্দর ভাবে হলেও কিছু কিছু অঘটনও ঘটেছে, যেমন পদপিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু, হারিয়ে যাওয়া, জলে ডুবে মারা যাওয়া, গঙ্গার জল পূতিময় হয়েছে ইত্যাদি। মানুষ মন পবিত্র করার সাথে শরীরের বর্জ্য পদার্থ কেও বিসর্জন দিয়েছে।

এরকম ঘটনা অস্বভাবিক নয়। কটিতে গুটিক তো হবেই। আমরা খুশি হতাম দুর্ঘটনা না হলেই। আরেকটা বিষয় হল ভক্তি -বিশ্বাস। ভক্তি খুব ভাল যদি সঠিক হয়। না হলে কুসংস্কার মানুষের মন বিষাদময় করে দেয়। তখন এই তথাকথিত পুণ্যস্নান, উপোষ, উপাচার মনকে বিঘ্নিত করে। মনিষীরা বলেছেন ‘পাপ কে ঘৃনা কর, পাপী কে না।’ পুন্য স্নানে পাপ ধুয়ে যাবে এটা অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কিছু না।

সত্যকে ধরে থাকলে মনই হয়ে উঠবে সত্যিকারের তীর্থক্ষেত্র।

প্রার্থনা

মানিকচন্দ্র ঘোষ

মা দুর্গা দশভুজা, তুমি সিংহবাহিনী
রণসাজে কেনো আসো প্রতিবার জননী?

পুরান মতে অসুর নাকি রম্ভাসুরের ছেলে
তার সঙ্গে লড়ায়ে মাগো, তুমি কেনো এলে?

মায়ের স্নেহে বঞ্চিত অসুর, জনম তার ঘৃণায়
ছন্নছাড়া জীবন তার, শরীর দৈত্যকায়

পদতলে তব লুটায় সে, রক্তাক্ত দেহ তার
ত্রিশূলাঘাত তার বুকে, রনং দেহি মূর্তি তোমার।

এ ধ্বংস লীলার দৃশ্যে মোরা শিহরিত
এ ঘৃণার আগুন কবে হবে নির্বাপিত?

ঘৃণার ফসল আরো ঘৃণা, যুদ্ধ শেষে যুদ্ধ
ইতিহাসে এটাই দেখি, তাই মোরা তটস্থ।

রাবনের সাথে রামের যুদ্ধ, লঙ্কা হলো শেষ
সীতার হলো পাতাল প্রবেশ, রইলো কি অবশেষ?

কুরুক্ষেত্রে ধর্ম যুদ্ধে, ধর্ম কোথায়? ধংসই দেখি
শান্তি এসেছে কবে, কান্নায় মুখ ঢাকি?

এ ধরা দেখেছে অনেক যুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধ দু 'বার!
স্বজন হারার কান্না শুনেছে, শুনেছে বারংবার।

মোরা মর্ত্যবাসী, তোমার কাছে মোদের মিনতি
যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই, সব যুদ্ধের টানো ইতি।

ফিরিয়ে দিয়ো তোমার রণসাজ, অস্ত্র দেবতারে
এসো তুমি অন্নপূর্ণা, উমা হয়ে মোদের ঘরে।

শান্তি আসুক, সুখ আসুক, তোমার আশিষে
খুশির হিল্লোল উঠুক, সবার মনের আকাশে।

আমাদের দুর্গা

শুভা কোকুবো চক্রবর্তী

সেদিন ২০১০য়ের ২৩শে মার্চ, মঙ্গলবার। আর পাঁচটা দিনের মতই শুরু হয়েছিল এই দিনটাও। বাড়িতে মঙ্গলচন্ডী মায়ের পুজো করলো। সেদিন মন্দিরে অন্নপূর্ণা মায়ের পুজো। অনেকদিনের ইচ্ছে অন্নপূর্ণা মা`কে একটা শাড়ি দেবার। সেইমত একটা শাড়ি কিনেছিল। মন্দিরে একটু পুজো দেখে, শাড়িটা দিয়ে, তারপর অফিস বাসে করে সোজা অফিসে। পার্কস্ট্রীটে নেমে কিছুটা হেঁটে মিউজিক ওয়ার্ল্ডের পাশ দিয়ে অফিস। বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতা শম্পা, ঢুকে গেল অফিসে।

অফিসটি স্টিফেন কোর্টে। বৃটিশ আমলের তৈরী অত বড় ইমারত। লিফ্টে উঠে গেল তিন তলায়। একেক তলায় ঘরগুলোর সিলিং কত্ত উঁচুতে। তাই তিনতলার উচ্চতা প্রায় ৬/৭ তলার সমান। সিঁড়ি দিয়ে কেউ উপরে যায়না। সবাই লিফ্টেই ওঠানামা করে। সেই সুযোগে সিঁড়ি দখল করে সংসার সাজিয়েছে কিছু মানুষজন। সিঁড়ি পুরোপুরি ব্লকড। তাতে কারুর কিছু আসে যায়না। লিফ্ট আছেতো। তাতেই ওঠানামা।

সেদিন লাঞ্চের সময় অফিসের কয়েকজন স্টাফ খেতে নেমেছিল। সেখান থেকেই জানা গেল লিফ্ট থেকে আগুন ধরেছে। চারদিকে `আগুন আগুন` চিৎকার। চিৎকার শুনে সিংহদূয়ারের মত বিশাল দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়, মেইন সুইচও অফ করা হয়। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সারা অফিস জুড়ে। হুটোপাটি পড়ে যায় অফিস ছেড়ে বেড়োনোর জন্য, বাঁচার আশায়। অফিসের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দৌঁড়ে যায় ছাদের দিকে আত্মরক্ষার জন্য। কিন্তু ছাদের দরজা যে বন্ধ। হায় হায়! এতদিন এসব খেয়ালও হয়নি কারুর। আর উপায় কি? ততক্ষণে ধোঁয়া গ্রাস করেছে সম্পূর্ণ বিল্ডিংটাকে। স্টিফেন কোর্ট জুড়ে হাহাকার তখন। চারদিকে শুধু কালো ধোঁয়া । ঘরের ভিতরে এদিকওদিক দমবন্ধ হয়ে ঢলে পড়ছে মানুষ।

আজতো অন্যান্য দিনের মতই একটা কাজের দিন। বাড়ির স্বামী কিংবা বাড়ির বৌ, বাড়ির ছেলে কিংবা মেয়ে কাজে গেছে। প্রতিদিনের মত কাজ শেষে ঠিক বাড়ি ফিরে আসবে। সময় বয়ে যাচ্ছিল সাধারন ভাবেই। হঠাৎ দুপুরের দিকে চোখ পড়ে টিভির খবরে। ততক্ষনে স্টিফেন কোর্ট জুড়ে আগুনের লেলিহান শিখা আর কালো ধোঁয়া। কি সর্বনাশ! দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য পরিবারের মানুষগুলো। কান্নাকাটির রোল পড়ে যায়। নিজের বাড়ির মানুষটা বেঁচে আছেতো। স্টিফেন কোর্টের বাইরে অগুন্তি মানুষের ভীড়। মিডিয়ার গাড়ি, এম্বুলেন্স চারদিকে।

এদিকে কয়েকজন আর থাকতে না পেরে বাঁচার শেষ চেষ্টা করতে জানলা দিয়ে ঝাঁপ দেয় নীচে। শম্পাও অনুসরন করে কলিগদের। ঝাঁপ দেবার আগে স্বামী কৃশানুকে ফোন করে নিজের মোবাইল থেকে। `লাট্টু অফিসে আগুন লেগেছে, আর বাঁচবো কিনা জানিনা...` ব্যস এইটুকু।

ওই উঁচু থেকে নিরুপায় হয়ে ঝাঁপ দিয়ে পিটারক্যাট রেস্টুরেন্টের ছাদে পড়লো।
মেয়েটা মৃত্যু দেখছে কাছ থেকে। নিজে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। একদম অথর্ব, একফোঁটা নড়াচড়ার শক্তি নেই, গলা দিয়েও কোনও আওয়াজ বের হচ্ছেনা। তবে জ্ঞান আছে। হঠাৎ মিডিয়ার একজন ভদ্রলোকের চোখ পড়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা শম্পার দিকে। তিনি কোনরকমে প্রায় পিঠে করে এম্বুলেন্সে তুলে এস এস কে এম হাসপাতালে নিয়ে যান।
কৃশানুর ফোনের খবর ছড়িয়ে যায় চারদিকে।

হঠাৎ কোলকাতা থেকে আমার দিদির ফোন। স্টিফেন কোর্টে আগুন লেগেছে, শম্পা ওই উঁচু থেকে ঝাঁপ দিয়েছে। হাত-পা কাঁপতে থাকে আমার। দিদি ফোন করে অত স্পীডে কি বলে গেল! নিজের কানকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়না। 'শম্পা' নামটা ঠিক শুনলাম!
তাড়াতাড়ি PCতে বাংলা খবর দেখি। জানলার এসি'র আউটলেটের উপরে দাঁড়িয়ে কিছু মানুষ। তারপরই টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে। অত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছেনা কাউকে। আগুনের জন্য টিভি ক্যামেরাও খুব কাছে পৌঁছতে পারছেনা।
কি ভয়ঙ্কর। ওখানে শম্পা আছে?
শম্পা...শম্পা চৌধুরী (চ্যাটার্জী) । আমার মামাতো বোন। বড় মামার মেয়ে। বড় আপনজন।

সেদিন সেই অগ্নিকান্ডে আহত নিহত সবাইকেই কাছের হাসপাতাল এস এস কে এম'য়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এত মানুষ, তখন সবাই আত্মীয়স্বজনহীন, পরিচয়হীন।
টিভিতে খবর দেখে পরিবারের মানুষ নিজেদের জনকে সণাক্ত করতে হাসপাতালে জড়ো হয়েছে। কে যে কোথায়...বিভিন্ন ওয়ার্ডে ছড়িয়ে আছে।

অবশেষে শম্পাকে পাওয়া গেল একটা জেনারেল বেডে ফেলে রাখা অবস্থায়। দু-দিন কোনও চিকিৎসা হয়নি মেয়েটার। দিদির কাছে, মামাতো বোনেদের কাছে শুনেছিলাম কোমড় থেকে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছিল। এত কষ্ট নাকি চোখে দেখা যায়না। অথচ যার সারা শরীরে এমন বিষব্যথা, সে সব সহ্য করে পড়ে আছে হাসপাতালের বেডে। কয়েকদিনের মধ্যে শিফ্ট করা হয় উডবার্ণ ওয়ার্ডে। ২মাস ধরে হাসপাতালে পরের পর অস্ত্রোপ্রচার। হাসপাতাল থেকে ছুটি হয় শম্পার। ঈশ্বররূপে এলেন এক Physiotherapist। শম্পার কাছে শুনেছি Physiotherapist যখন আসতেন এবং যতক্ষন থাকতেন শম্পার চিৎকারে আশেপাশের বাড়ির মানুষজন সমব্যথী হয়ে ওর শীঘ্র সুস্থতার জন্য প্রার্থণা করেছেন প্রতিদিন। বাড়ির বিছানায় ৩মাস কেটে যায়। একটু একটু করে ভয় কাটাতে বাড়ি থেকে বেড়োতে শুরু করে। তারপর একদিন নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায় শম্পা লাঠিতে ভর দিয়ে। হাঁটাচলা একদম স্বাভাবিক না হলেও চলেফিরে আছে। অফিস শিফ্ট হয়েছে অন্য জায়গায়। অফিস জয়েন করেছে শম্পা। প্রতিদিন একটু একটু করে সুস্থ হচ্ছিল.... তারপর একদিন লাঠি ছেড়ে একদম স্বাভাবিক চলাফেরা।

নিজের প্রতি অগাধ বিশ্বাস আর অসম্ভব মনের জোর দেখেছি ওর মধ্যে। কোলকাতা গেলে দেখা, আড্ডা , খাওয়াদাওয়া চলে সবাই মিলে। এমনকি আমি কি খেতে ভালবাসি তা বানিয়ে নিয়ে আসে আমার জন্য। ভাবা যায়!

দশ হাতে দশ অস্ত্র না থাকলেও, মনের জোরে লড়েছিস নির্ভিক যুদ্ধ
নেতিবাচক ছায়া ঠেলে সামনে এগিয়েছিস আলোয়।
আমাদের শিখিয়েছিস কিভাবে মনে বিশ্বাস রাখতে হয়, শিখিয়েছিস আশাবাদী থাকার কৌশল।
অনেক ভালবাসা আর সম্মান তোর জন্য শম্পা...বোন আমার...তুইই “আমাদের দুর্গা”...

একলা চলো রে

জলি চক্রবর্তী শীল

(বর্তমান)

খাঁ খাঁ ফাঁকা বাড়িটায় পা দিতেই মনটা ডুকড়ে উঠল ডানার। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা। এই নিস্তব্ধতার সাথে তার পরিচয় নেই। কিন্তু এখন এই নিস্তব্ধতাকেই মেনে নিতে হবে। সমুদ্র যখন ছিল তখন বাড়িটাকে মনে হত কত জীবন্ত। সমুদ্র সারাটা দিন ধরে ভরিয়ে রাখত হাঁক-ডাক-গান-খাওয়া-দাওয়া, সে এক হৈ হৈ রৈ রৈ জীবন। কি করে বাঁচতে হয় সেটা সমুদ্রর কাছ থেকেই তো জেনেছে সে। একাই একশ ছিল সে। আর আজ সেই বাড়ির নিস্তব্ধতা বিদ্ধ করছে তাকে। কর’গোনা ছ’টা বছর তাদের একত্রযাপন। এই তো সেদিন সে লাল বেনারসীতে সেজে এই বাড়িতে এসে উঠেছিল সমুদ্রর হাত ধরে। আর আজ তার পরণে নরুনপাড় সাদা থান। মনের ভিতরটা আছাড় পাছাড় করছে, তবু ডানা কাঁদতে পারছে না। সমুদ্র যে কান্না একদম সইতে পারত না। কত সহজে পারে না থেকে পারত না হয়ে গেল সমুদ্র। আর কটা দিন আগে জানতে পারলে হয়ত সমুদ্রকে এত তাড়াতাড়ি হারাতে হত না।

ধীর পায়ে ডানা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে। পিছন পিছন ডানার বোন রিনা। অল্পক্ষণ আছে সে দিদির সাথে, কিন্তু তাতেই তার হাফ ধরে আসছে। সমুদ্রদা বেঁচে থাকতে সে বার দুই এ বাড়িতে এসেছে। সে বাড়ি ছিল জমজমাট বাড়ি। একটা মানুষ বাড়িটাকে মাথায় করে রাখত। এক মুহুর্তের জন্যও কোনদিন মনে হয়নি দিদি এই ধ্যাড়ধেরে গোবিন্দপুরে কি করে থাকে? একদিনও মনে হয়নি শহুরে হট্টগোল, কোলাহলের মধ্যে যে মানুষ হয়েছে, সেই মানুষ কি করে এই নির্বান্ধব শহরতলীতে একঠায়ে পড়ে থাকে? বিয়ের পর দ্বিরাগমনের পর একরাতও কাটায়নি দিদি বাবার বাড়িতে। সেটা শুধুমাত্র সমুদ্রদার জন্য। প্রাণশক্তিতে ভরপুর একটা মানুষ কিভাবে এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারে তা এখনো ভাবতে পারছে না রিনা। কিন্তু সেটাই তো বাস্তব।

‘দিদি কি করে থাকবি তুই এখানে?’ বলেই ডুকড়ে কেঁদে ওঠে রিনা।

‘কাঁদিস না, কাঁদিস না, তোর সমুদ্রদা যে কান্না একদম পছন্দ করত না।’

‘তোর কান্না পাচ্ছে না দিদি?’

‘পাচ্ছে, খুব কান্না পাচ্ছে, কিন্তু আমি কাঁদতে পারছি না। তোর সমুদ্রদা যে একদম কান্না সইতে পারত না। সে যেটা সইতে পারত না, আজ সে নেই বলে সেটাকে তো আমি মিথ্যে করে দিতে পারি না রে। চোখ জ্বালা করছে, মন জ্বলে যাচ্ছে তবু আমি কাঁদছি না।’

‘তুই ক’টা দিন আমাদের বাড়িতে থেকে আসবি চল।’ রিনা জোর করে দিদিকে।

‘না রিনা, আমি এখানেই থাকব। এখানে সমুদ্রর কত স্মৃতি, সেইসব স্মৃতি ছেড়ে আমি যাই কি করে ?’

‘দিদি তুই বুঝতে পারছিস না, আবেগ নিয়ে চলিস না, বাস্তবটা বোঝার চেষ্টা কর’। রিনা বোঝাবার চেষ্টা করে দিদিকে। কিন্তু ডানা কিছুই শুনতে রাজি হয় না। সে এখানেই থাকবে।

(অতীত)
বিয়েটা কিছুতেই হচ্ছিল না ডানার। দেখতে শুনতে সে মন্দ না, চলে যায় গোছের। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। বড্ড বেঁটে সে আর গায়ের রঙটা তার চাপা। বিয়ের বাজারে এমন মেয়েদের কাটতি কোথায়? তার ওপর ডানা কোনকালেই গৃহকর্মে নিপুণা তো দুরের কথা কাজ চালানো গোছের ও নয়। অন্যদিকে রিনা বেশ সুন্দরী, গায়ের রঙটিও বেশ ফর্সা। সংসারে সব কাজ রিনাই করত।

ছোট থেকেই সংসারের দায়িত্ব তার ঘাড়েই। খুব অল্প বয়সে তাদের বাবা-মা মারা যাওয়ার পর একমাত্র দাদাই তাদের দুই বোনকে মানুষ করেছিল। সেই দাদা চিন্তায় চিন্তায় পাগল হওয়ার মত অবস্থা। ডানাকে পাত্রস্থ করতে দুবেলা পাত্রপক্ষকে নিয়ে আসছিল। কিন্তু কিছুতেই পছন্দ হচ্ছিল না। এদিকে ডানার বয়স বাড়ছিল। ডানাও বুঝতে পারছিল পরিস্থিতি। কিন্তু ভেঙে পড়েনি কোনদিন। চাকরী পরীক্ষা দিতে দিতে জুটিয়ে ফেলল দশটা-পাঁচটার এক সরকারী চাকুরী। লটারী জিতে ফেলল সে। এবার পাত্রপক্ষদের অনেকেরই পাত্রী পছন্দ হচ্ছিল। কিন্তু ডানা সময় নিতে চেয়েছিল। সে তাড়াহুড়ো করতে চায়নি। একটা সঠিক মানুষকে নিজের জীবনে চেয়েছিল সে। সেবার ঘটকমশায় নিয়ে এসেছিল সমুদ্রকে।

ছটফটে, প্রাণশক্তিতে ভরপুর মানুষটাকে দেখেই ভালো লেগে গিয়েছিল ডানার। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছিল সে। পরিষ্কার কাটছাঁট কথা বলেছিল, ‘আমার কিন্তু আমি ছাড়া তিনকূলে কেউ নেই। বিয়ে যদি হয় আপনাদের বাড়িতে তাহলে জানবেন আমিই বর, আমিই বরকর্তা। আমার একটা ফার্ণিচারের চালু ব্যবসা আছে। নিজের চলে যায় ভালোমত। তেমন বন্ধুবান্ধবও আমার নেই। দুটো বাড়ি আছে আমার, তার একটায় ভাড়া বসানো অন্যটায় আমি থাকি। ঘরদোর আপনারা দেখে নেবেন, ব্যবসাপত্রের খোঁজ নিয়ে নেবেন। আশা করি নিরাশ হবেন না।’ যেন বিয়েটা এখানেই হবে জানত সে।

‘আগে বোনকে দেখুন’ দাদা বোধহয় আরও কিছু বলত কিন্তু তাকে বলতে না দিয়ে সমুদ্র বলে উঠেছিল, ‘দেখেছি তো আপনার বোনকে, ফটোতে। পছন্দ না হলে কথা বলতে আসতাম কি?’

‘তবু একবার চাক্ষুস দেখে নিন’ দাদা ইশারা করতেই ঘরে ঢুকেছিল ডানা। নমস্কার জানাতেই প্রতি নমস্কার জানিয়েছিল সমুদ্র।

‘আলু-পটল তো নয় দাদা যে দেখে নেবো? তবে আমার কতগুলো কথা বলার আছে ওঁনাকে। যদি বিয়েটা হয় তবে সংসারটা তো ওঁনাকেই আমার সাথে করতে হবে। তাই আপনি অনুমতি দিলে আমি কথা বলতে পারি।’

ডানা পুলকিত হচ্ছিল। একটা ভালো লাগা ছড়িয়ে পড়ছিল সমস্ত হৃদয় জুড়ে।

‘আমি কিন্তু থাকি সেই ধ্যাড়ধেরে গোবিন্দপুরে। সেখানে নেই কোন শহুরে সুযোগসুবিধা। তবে সেখানে বিশুদ্ধ বাতাসের কোন কমতি নেই, অফুরন্ত অক্সিজেন, পাখির কলকাকলী আপনাকে ভরিয়ে রাখবে। যদি আপনি মনে করেন যে এরপর আমাদের কথা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তবে আমি পরের কথাগুলো বলব।’

ডানা কোনকালেই প্রগলভ নয়। গলা শুকিয়ে আসছিল। কোনক্রমে বলেছিল, ‘কিন্তু আমার চাকুরীটা তো এখানেই, আমি যে সেটা ছাড়তে পারব না’।

‘চাকরী ছাড়ার কথা আসছে কেন? আমি একটু আগে বললাম না যা কাজ করি তাতে আমার চলে যায়। কিন্তু আপনি স্বরোজগারী, আপনাকে আমি চালাই সে স্পর্ধা, ঔদ্ধত্য আমার নেই। করবেন চাকরী। শুধু আপনি যেমন এখন দু’পা হেঁটে অফিসে যান, তখন কিন্তু অনেকটা আগে আপনাকে বাড়ি থেকে বেরোতে হবে। চারটে কম্যুনিকেশন হয়ে যাবে। ধকল যাবে শরীরের ওপর। ভাবনা চিন্তা করে এগোবেন।’

না আর ভাবনাচিন্তা করতে চায় নি ডানা। নির্দিষ্ট দিনে অল্প কিছু মানুষকে সাথে নিয়ে শুরু হয়েছিল তাদের পথচলা।

(বর্তমান)

'এই দিদি, কি ভাবছিস এত? রাত তো অনেক হল। এবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।'

'রিনা তুই জানিস, সমুদ্র বুঝতে পেরেছিল ওর দিন ঘনিয়ে এসেছে, তাই যে মানুষ কোনদিন আমাকে রান্নাবান্না করতে দেয়নি, সেই মানুষ আমাকে একদিন ডেকে বলল, ডানা তোমাকে ডাল-ভাত করাটা শিখিয়ে দি। আমি অবাক হয়েছিলাম। ভাগ্যিস শিখিয়েছিল, কাল থেকে তো আমাকে নিজের রান্নাটা করে নিতে হবে বল!' হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে ডানা। অনেকক্ষণ সামলেছে সে নিজেকে, আর পারল না।

রিনা বাঁধা দিতে চেষ্টা করল না। কাঁদুক, না কাঁদলে ও পাগল হয়ে যাবে।

(অতীত)

'খুব ক্লান্ত লাগছে তাই না? এত ধকল গেছে তো। কটা দিন ধকল যাবে তারপর দেখবে তুমি সইয়ে নিয়েছ।'

ক্লান্ত ডানার সামনে দুকাপ চা নিয়ে হাজির হয় সমুদ্র। তার কোন ক্লান্তি নেই। ডানা অবাক চোখে চেয়ে থাকে।

'তুমিও তো সারাটা দিন আমার সাথে রইলে, তোমার ক্লান্তি লাগছে না?' ডানা অবাক হয়ে জানতে চায়।

'আমার অভ্যাস আছে মহারানী। জীবনে কত কিছু করতে হয়েছে তা তো আর জানো না। সেসব পরে কোন একদিন বলব। তুমি এখন ফ্রেশ হয়ে নাও, আমি রান্নাঘরে ঢুকি।'

সমুদ্রকে যত দেখছে তত অবাক হচ্ছে ডানা। একটা মানুষ সারাটা দিন তার সাথে রইল। বিরক্ত বোধ করল না, এখন ফিরে সে রান্না করবে। নিজের কেমন যেন লজ্জা লাগছিল, আসলে আজীবন দেখে এসেছে পরিবারে মেয়েরাই হাজার ঝক্কি সামলে রান্নাঘরটাও সামলায়, পুরুষ সেখানে চা'টাও করে খায় না। সেখানে এই লোকটা কদিন ধরে টানা রান্না করছে! নিজের মধ্যে অপরাধবোধ একটু একটু করে জেগে উঠছিল। রান্নাটা শিখে নেবে সে।

ফ্রেশ হয়ে টেবলে আসতে না আসতে রাতের খাবার চলে আসে। ডিমের ঝোল আর ভাত।

'বেশি হাবিজাবি রাঁধলাম না বুঝলে, এই দিয়ে তোমার কি খেতে অসুবিধে হবে?'

'একদম না। কিন্তু আজ এত তাড়া দিচ্ছ যে খাওয়ার জন্য, কি ব্যাপার?'

'ব্যাপার হল আজ বিয়ের পর প্রথম তুমি অফিস জয়েন করলে। এতটা ট্রাভেল করা তোমার অভ্যাস নেই। স্বাভাবিকভাবেই তুমি খুব ক্লান্ত। কাল সকালে উঠেই তোমায় তাড়াতাড়ি বের হতে হবে। কাল তো আমি যাব না। আমি তোমায় আজ সব চিনিয়ে দিয়েছি, বুঝিয়ে দিয়েছি এবার একলা চলো রে। আর এই একলা চলতে গেলে তোমাকে কাল একটু আগেই বের হতে হবে। বুঝলে?' হাসে সমুদ্র।

(বর্তমান)

'সমুদ্রের হাসিটা ছিল এত সুন্দর। তোর মনে আছে রিনা?'

'মনে আছে দিদি।'

'কোথায় গেলে সমুদ্র আমাকে ছেড়ে? কেন বলতে তুমি জীবন মানেই একলা চলো রে? কেন কেন? চলে যাবে বলেই কি? তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে?' ডানার বিলাপে রিনা চোখে জল ধরে রাখতে পারে না।

'সামলে ওঠ দিদি। তখন বলছিলি না, সমুদ্রদা একদম কান্না পছন্দ করে না, এবার শান্ত হ।'

(অতীত)

ছটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল দুজনের কেউই যেন টের পেলো না। জীবনটা হয়ত এমনভাবেই দুজনের কেটে যেত কিন্তু হঠাৎ ছন্দপতন।

'কতটা সময় হাতে আছে ডক্টর? নির্দ্বিধায় বলুন আমায়। জানতে চায় ডানা ডাক্তারের চেম্বারে রিপোর্ট দেখাতে এসে। সব বোঝে না সে, কিন্তু কিছু তো বোঝে। সেই কিছু বোঝা থেকেই ডাক্তারের কপালের কুঞ্চন চোখ এড়ায় না।

‘খুব কম সময়, ধরুন এক সপ্তাহ’।

‘হয়ত তারও কম সময় হাতে আছে ডক্টর। আমি বুঝতে পারছি। অনেক ধন্যবাদ।’ বেরিয়ে আসে ডানা ডাক্তারের চেম্বার থেকে।

সেদিন সারাটা দিন ধরেই ঝরেছিল অঝোর বৃষ্টি। সমুদ্র আর ডানার চোখ দিয়েও ঝরছিল অবিরত জল। সমুদ্রর কথা বন্ধ হয়ে গেছে দিনদুই ধরে। ডানা ছুটি নিয়েছে অফিসে। সারাক্ষণ সে সমুদ্রর পাশে বসে থাকছে। রান্না না করলেই নয়, তাই করছে। নিজের হাতে খাইয়ে দিচ্ছে সমুদ্রকে। খেতেও পারছে না সে, গলা দিয়ে খাবার নামছে না ডানারও।

হঠাৎ করেই একদিন অফিস থেকে ফিরে ডানা দেখে সমুদ্র কিছুতেই চেয়ার থেকে উঠতে পারছে না। উঠতে গেলেই পড়ে যাচ্ছে। তড়িঘড়ি ডাক্তার দেখাতেই ডাক্তার MRI করতে বলে। লাস্ট স্টেজ ক্যান্সার।

এক সপ্তাহ নয়, বৃষ্টিভেজা রাতে খিচুড়ি করেছিল সে। সমুদ্র বড্ড ভালোবাসে। সমুদ্রকে খাওয়াবে বলে খাবার এনে দেখে, সে নেই।

....
(২)

মুহূর্ত কখনও মুহূর্তেই থেমে থাকে না। পরিবর্তনই জীবনের নিয়ম। তাই তো প্রচন্ড গরমের পর আসে শ্রাবনধারা, প্রচন্ড শীতের দিনে ভালো লাগে রোদের তাপ। জীবন সতত পরিবর্তনশীল। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় না। সেই নিয়মে একটু একটু করে সামলে উঠল ডানা। সমুদ্র সশরীরে নেই, কিন্তু দেওয়াল জুড়ে আছে সমুদ্রর একটা হাসিখুশি ছবি। রোজ ঐ ছবির সাথে অনেক কথা বলে ডানা। সমুদ্র থাকতে জীবন যেমনটা ছিল ঠিক তেমনটাই আছে, নেই শুধু হাতের কাছে সব রেডি করে দেওয়াটা আর সেই মানুষটা। বের হবার সময় নিজের লাঞ্চবক্সের খাবারটা নিজেকে বানিয়ে নিয়ে লাঞ্চবক্সে ভরতে হয়। সদর দরজায় তালা দিয়ে বের হতে হয়, অভ্যাসমত ওপরের বারান্দার দিকে তাকায় কিন্তু কেউ থাকে না সেখানে। তবু অভ্যাসটা বদল করতে চায় না সে। মনে মনে ভাবে ওখানে তার সমুদ্র দাঁড়িয়ে আছে, থাকবে অনন্তকাল, অন্তত যতদিন ডানা এই পৃথিবীতে থাকবে। বলবে, ‘সাবধানে যেও মহারাণী’।

সাবধানেই যায় সে। মাঝে মাঝে চলে যায় ও বাড়িতেও। দাদাটা এখনো বিয়ে করল না। রিনার বিয়ের তোড়জোড় চলছে। ও বরাবরই সুন্দরী। ঠিক পছন্দ হয়ে যাবে।

‘থেকে যা না এখানে কটা দিন’।

‘আসা-যাওয়া তো করছি রে দাদা। থাকা সম্ভব নয়।’

‘খুকি ওত দূর থেকে যাতায়াত তো কষ্টকর। এখন তো সমুদ্র নেই...’

কথা শেষ করতে দেয় না ডানা,
‘ওভাবে বলিস না দাদা, সমুদ্র আছে। আমার মন-মস্তিষ্ক জুড়ে সমুদ্র। ওকে ওখানে একলা রেখে আমার এখানে থাকা সম্ভব নয় রে’।

‘খুকি তুই ভুল বুঝছিস’,

‘কিছু ভুল বুঝছি না, দোহাই দাদা সমুদ্র নেই এই কথাটা বলিস না, ও আছে। আমার বিশ্বাস নিয়ে আমায় থাকতে দে।’

রোজ আসে সে অতটা পথ পাড়ি দিয়ে। ক্লান্ত হয়ে ফিরলে অবশ্য কেউ আর চা এগিয়ে দেয় না। নিজেই ফ্রেশ হয়ে চা নিয়ে বসে বারান্দায়। এখান থেকে সমুদ্রের ছবিটা পরিষ্কার দেখা যায়। সেদিন কি কি হল, কে কি বলল, কি কি দেখল সব সব সে সমুদ্রকে বলে।

(শেষ অঙ্ক)

এইভাবেই চলতে চলতে দিন কেটে যায়, বছর কেটে যায়, ডানা এখন অবসরপ্রাপ্তা। রিনা এখন দুই সন্তানের মা, দাদা বিয়ে করেছে, বৌদিও খুব ভালো। সবাইকে নিয়ে ডানাও তো বেশ ভালো আছে। একলা চলো রে জীবনে সে বেশ ভালো আছে। অবশ্য পুরোপুরি একলা নয় তার জীবন। সমুদ্র তো আছে। ছয় বছরের দাম্পত্যকে নিয়েই নাড়াচাড়া করতে করতে একদিন হয়ত সমুদ্র এসে বলবে, ‘চল মহারানী, আমার কাছে চল। চল সেই মহাপ্রস্থানের পথে। বিরহের শেষে আমাদের মিলনের ক্ষণ অপেক্ষা করছে।’ ধুসর হয়ে যাওয়া দৃষ্টিতে এখন সুদুরের ডাকের অপেক্ষায় ডানা।

চখাচখী

নয়ন বসু

কিছু কিছু মেয়ে আছে যাদের দেখতে ভারী মিষ্টি লাগে। তবু দেখে মনে একটা দুঃখ দুঃখ ভাব আসে। কেন আসে বলা মুশকিল। একটু রোগাটে চেহারা, মায়া মায়া চোখ, খুব সম্ভবত এদের গায়ের রং একটু চাপা হয়। কথা বলার সময় বারবার মাথা নামিয়ে নেয়। যেন পাঁচ টাকার কয়েন মাটিতে পড়ে গেছে কোথাও, এক্ষুণি না খুঁজলে হারিয়ে যাবে। ভিড়ের মধ্যে থাকলে এদের দেখতে ভালো লাগে না। অথচ একা থাকলে এদের অন্যরকম একটা রূপ খুলে যায়। হয়তো তখনও ওই মেয়েটি পাঁচ টাকার কয়েন খুঁজতে খুঁজতে দাঁত দিয়ে নখ খুঁটছে। একটা চুল আলগোছে এসে পড়েছে কপালে।

ভিড়ের মধ্যে থাকলে যেসব মেয়েদের ভালো লাগে তারা আবার অন্যরকম। তাদের ঠিক ভালো লাগে না। তাদের চোখে লাগে। তাদের মুখ ফকফকে ফর্সা, খোলা অথবা খোঁপা করা চুলে একটা ফুল গোঁজা। সাধারণত সেই ফুলটি গোলাপ হয়। এরা একটু উদ্ধত না হলে ভালোও লাগে না। একজন সাহস করে কথা বলতে যাবে। পাত্তা না পেয়ে ফিরে আসবে। সেটা নিয়ে বাকিরা খুব হো হো করে হাসবে আর ঘন ঘন সিগারেট খেতে যাবে।

আমার অফিস থেকে বেরিয়েই একটা সার্ভিস লেন আছে। রোজ সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ বেরিয়ে দেখি একটা ছেলে আর একটা মেয়ে বসে থাকে। দু'জনের বয়সই মোটামুটি কুড়ির অল্প এদিক ওদিক। মেয়েটিকে ওপরে বলা শ্রেণীবিভাগে প্রথম শ্রেণীতে ফেলা যায়। দোহারা গড়ন, অল্প চাপা গায়ের রং, চোখদুটো টানা টানা, মাথার চুল ঝুঁটি করে ওপর দিকে বাঁধা। সাধারনত একটা হলগলে টি শার্ট আর পাজামা টাইপের কিছু পরে আসে। পায়ে একটা চপ্পল। দেখে মনে হয় বাড়ির ড্রেস। হয়তো আশেপাশেই কোথাও থাকে।

ছেলেটি তুলনায় বেশ সাজুগুজু করে আসে। নয় রংবেরংয়ের টি শার্ট, নয় হাফ হাতা চকরা বকরা জামা, সঙ্গে ছেঁড়া জিন্স অথবা কডের প্যান্ট। পায়ে সাধারণত কাবলি থাকে, কোনো কোনো দিন অবশ্য চটিও দেখেছি। ছেলেটির স্বাস্থ্য তুলনায় ভালো। মোটা নয়, কিন্তু মেয়েটার মতো রোগাও নয়। ফর্সা ধপধপ করছে। কবিদের মতো চাপচাপ দাড়ি রাখে বলে মুখের ফর্সা ভাবটা আরো স্পষ্ট বোঝা যায়।

সার্ভিস লেনটা একটু ফাঁকা ফাঁকাই থাকে। এখানে ফুটপাথটা একটু উঁচু। এখনও রাস্তায় কাজ হয় দেখি মাঝে মাঝে। রাস্তা আরো চওড়া হবে। ওরা ফুটপাথটার ওপরেই দেখি বসে। কোনো খবরের কাগজ কী রুমালও পাতে না। মজার কথা জিনিসটা দেখতে খুব একটা খারাপও লাগে না। বরং ঠিক উল্টোটা। খুব মিষ্টি লাগে দুজনকে একসঙ্গে দেখতে।

আমি অফিস থেকে বেরোই পাক্কা ছ'টা। তখনও ভালো করে অন্ধকার নামে না। শেষ বিকেলের আলোয় দেখি মেয়েটা একটা টিফিন বক্স খুলে ছেলেটার মুখে একটুকরো রুটি আর তরকারি গুঁজে দিচ্ছে। সারাদিন অফিসের পর ওই দৃশ্যটা দেখে আমার মন ভালো হয়ে যায়। আমি সার্ভিস লেন ধরে সোজা বেরিয়ে আসি বাসস্টপের দিকে।

সাধারনত কাউকে দেখে তার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থান বোঝা যায়। আমি এদের দেখে কিছুতেই কিছু বুঝতে পারি না। মেয়েটি ঝাড়া হাত পায়ে আসে। ছেলেটির পিঠে ব্যাগ থাকে। তার কোম্পানি বোঝা যায় না। আর গেলেও কিছু নয়। ধর্মতলার ফুটপাথে ঢেলে আমেরিকান টুরিষ্টার থেকে শুরু করে জাল আরমানি সবই বিক্রি হয়। এক ঝলক দেখে বোঝারও উপায় থাকে না। ওরা নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে কোটিপতি যা খুশি তাই হতে পারে।

আমার মনে হয় ছেলেটা স্টুডেন্ট। হয়তো কোনো কলেজে পড়ে। মেয়েটা কেন কলেজে যায় না কে জানে! হয়তো তাড়াতাড়ি চলে আসে কলেজ থেকে অথবা হয়তো মর্নিং কলেজ হতে পারে।

একদিন দেখি ওরা চুপচাপ বসে আছে। সেদিন বুধবার ছিল মনে আছে আমার। কারণ সকালে দাড়ি কাটতে গিয়ে বউয়ের কথা শুনেছি, "জন্মবারে কেউ দাড়ি কাটে! আসছে জুনে পঞ্চাশ হয়ে যাবে, এখনও এটুকু খেয়াল থাকে না!"

ওরা যেখানে বসে, তার ঠিক পিছনেই একটা সরকারি অফিসের পাঁচিল। পাঁচিলের ওপর দিয়ে একটা ঝাঁকড়া আমগাছ মাথা বের করে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই ঝাঁকড়া আমগাছের ছায়ায় ওদের দেখে মনে হলো ঝগড়া হয়েছে। মেয়েটা বসে আছে, মাটির দিকে তাকিয়ে পাঁচ টাকার কয়েন খুঁজছে। ছেলেটা প্রায় একহাত দূরে বসেছে। দুটো হাতের কনুই হাঁটুর ওপরে। দুটো হাত দুটো গালে, সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। গোটা সার্ভিস লেনটায় আর কেউ নেই।

বাড়িতে বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হলে এখন আমিও চুপ করে থাকি। কিছু ঝগড়া মেটে না। সংসারে ওগুলো নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়। একথা বোঝার বয়স আমার হয়েছে। ওদের হয়নি এখনও। কিন্তু দৃশ্যটা দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। মাথার ওপর ঝাঁকড়া আমগাছটা থেকে এক্ষুণি যদি একটা নরম ডাল ভেঙে পড়ত ছেলেটার ওপর, আমি জানি মেয়েটা এক্ষুণি সব ভুলে ছুটে যেত।

পকেট থেকে একটা হলুদ রুমাল বের করে মুখে একটু গরম ভাপ দিয়ে ছেলেটার কপালে দিত। হয়তো আমাকে ডেকে বলতো, "দাদা আপনার কাছে একটু জল হবে! দেখুন না ডালটা এমন করে মাথায় এসে লেগেছে!" ছেলেটা তখন কিন্তু কিন্তু করে বলবে, "আরে কিছু হয়নি, তুই খামোখা এতো ব্যস্ত হচ্ছিস! দাদা আপনি যান তো!" তারপর আমি চলে যাওয়ার পর দু'জনের ঝগড়া মিটে যেত। হয়তো প্রায় অন্ধকার হয়ে আসা রাস্তায় ছেলেটা মেয়েটার গালে চকাস করে একটা হামি খেয়ে বলতো, "তুই একটা পাগলি! এই দেখ কিচ্ছু হয়নি!" মেয়েটা তখন কোনো কথা না বলে শক্ত করে জড়িয়ে ধরত ছেলেটাকে! সাধারণ সমস্যা চলে এলেই এইসব অসাধারন ঝগড়াঝাঁটির আঁকাবাঁকা গ্রাফ সরলরেখা হয়ে যায়।

কিন্তু এসব কিছুই হলো না। ওরা দু'জন চুপচাপ বসে রইলো। আমি টুকটুক করে অন্যদিনের মতো ওদের সামনে দিয়ে চলে এলাম। মনে মনে বলছিলাম, 'ঠাকুর ওদের ঝগড়া মিটিয়ে দাও!'

পরেরদিন দেখি ছেলেটার চোখের তলায় কালি। ফর্সা তো, বোঝা যায়। মেয়েটাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না। দু'জনে মিলে দেখি আইসক্রিম খাচ্ছে। আজও কথা বলছে না দেখি ক্ষ্যাপাদুটো। কিন্তু আজ পরিস্থিতি অন্যরকম। ওদের দু'জনের মুখেই চাপা হাসি ঝিলিক দিচ্ছে। পাঁচিলের ওপারের গাছগুলো থেকে টুঁই টুঁই করে একটা পাখি ডাকছে। একটা চড়াইও দেখতে পেলাম যেন। কিচমিচ করছে। খুব সম্ভবত কাল অনেক রাত অবধি জেগে ঝগড়া করেছে দুজন। তারপর আজ সকালে যখন কাকের ডাক শুনেছে, মেয়েটা বলেছে, "ওই শুতে যা এবার! কাল তোর কলেজ নেই!" ছেলেটা বলেছে, "তোরও তো আছে! একটা কিস দে!" মেয়েটা বলেছে, "খুব বেড়েছিস না! আচ্ছা চল, একটা, এই নে! চকাস! এবার চুপটি করে ঘুমোতে যা! আর আমাকে নিয়ে ভালো ভালো স্বপ্ন দেখবি!" ছেলেটার আর ঘুম আসেনি হয়তো। কী সুন্দর দেখতে লাগছে, ওরা দুজন আইসক্রিম খাচ্ছে বসে বসে! কোনো কথা বলছে না। অথচ চারদিক না বলা কথায় থই থই করছে!

এই অফিসে আমি ট্রান্সফার হয়ে এসেছি সবে মাস তিনেক হয়েছে। তিনমাস ধরে দেখছি ওদের। ওরাও নিশ্চয়ই দেখে। আমার খুব চিন্তা হয় বর্ষাকাল হলে কী করবে বেচারারা। মার্চ এপ্রিল মে মাস পর্যন্ত আমি দেখেছি চল্লিশ ডিগ্রীতে বসে দু'জন খুনসুটি করছে। যেন বসন্তের বনে বসে আছে। কিন্তু বর্ষাকালে বেচারাদের কষ্ট হবে। এই বছর এখনও কালবৈশাখী হয়নি সেই অর্থে। হলেও বিকেলের ওই সময়টা কোনোভাবে মিস করে গেছে। ভেজা রাস্তায় বসবে কীকরে ওরা! আর ঝড়বৃষ্টির সময় ঝাঁকড়া আমগাছের তলায় বসাও সেফ নয়। আসলে ওই বয়সে এইসব খেয়াল থাকে না। প্রেমে পড়লে লজ্জা ঘেন্না ভয় চলে যায়। কিন্তু ওদের বলা শোভা পায় না আমার। আমি পঞ্চাশের বুড়ো একটা লোক। ভুঁড়ি বাগিয়ে অফিস যাই, অফিস থেকে বাড়ি এসে ছেলেকে পড়াই, বউয়ের সঙ্গে সিগারেট খাওয়া নিয়ে ঝগড়া করি, রাতে উঠতি কমবয়সী নায়িকাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি কী মাঝে মাঝে পুরনো প্রেমিকার কথা মনে পড়ে। ওদের বলা শোভা পায় না আমার, 'বর্ষাকাল আসছে, এবার থেকে ব্যাগে ছাতা রাখবে, বৃষ্টিতে ভিজে গেলে বাড়ি গিয়ে আগে চান করে নেবে। নইলে দু'দিন আর দেখা হবে না! হামি খেতে গিয়ে হাঁচি এলে ভালো হবে!'

আমি সেদিন এসব ভাবতে ভাবতেই অফিসের জন্য রেডি হচ্ছিলাম। অফিসে ঢুকতেই না ঢুকতেই হুড়মুড় করে বৃষ্টি এলো। মনে মনে ভাবলাম বিকেলের মধ্যে নিশ্চয়ই কমে যাবে। রাস্তাঘাটও ততক্ষণে শুকিয়ে যাবে। আমাদের অফিসের একটা দিকের জানলা কাচের। দেখলাম বৃষ্টির মধ্যে দুটো পায়রা ঝটফট করতে করতে জানলার সামনে এসে বসলো। বৃষ্টির মধ্যে জানলার কাচ খোলা সম্ভব নয়, কম্পিউটার আছে, কাগজপত্রও বিস্তর, ভিজে যাবে। দেখলাম পায়রা দুটো কেমন গুটিসুটি মেরে গায়ে গা লাগিয়ে চুপটি করে বসে আছে। মায়া লাগল দেখে। কিন্তু কিছু করার নেই আমার। মাঝে মাঝে বাজ পড়ছে, আর একবার করে জানলার দিকে তাকাচ্ছি। দেখি বাইরে বৃষ্টি পড়ছে আর পায়রাদুটো সেই গুটিসুটি মেরে বসে আছে, গায়ে গা লাগিয়ে। বৃষ্টি এলে আমি এখনও মাঝে মাঝে আমার পুরনো প্রেমিকার কথা ভাবি। এখন কী করছে কে জানে! বর নিশ্চয়ই অফিস বেরিয়ে গেছে। এখন হয়তো জানলা খুলে দিয়েছে, ঘরের মধ্যে দুটো পায়রা ওড়াউড়ি করছে। হয়তো মেয়ের স্কুলের মায়েদের সঙ্গে গল্প করছে। অথবা কোনো কবিতার বই খুলেও বসতে পারে। একটা সময় খুব কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ কোট করতো। এখনও করে কী না কে জানে!

সেদিন ফেরার সময় একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। ব্যাগ থেকে ছাতা বের করেছি। ছাতা নেওয়ার কথা আমার মনে থাকে না। ভাগ্যিস বউ মনে করে দিয়েছিল! নইলে আজ ভিজতে হতো। হাঁপের টানটা ইদানিং আবার একটু একটু করে যেন ফেরত আসছে। আগের মতন দম পাই না আর। ভিজে গেলে অফিস কামাই করতে হবে হয়তো।

তখনও বৃষ্টি পড়ছে। খুব জোরে নয়, খুব আস্তে নয়। ছাতা নিতে ইচ্ছে করে না। না খুললে ভিজে যেতে হবে। দেখলাম চখাচখী পাঁচিলের ধারে একটা কালো ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে আছে। একঝলক দেখে মনে হলো যেন পাথরের স্থির যুগলমূর্তি। মেয়েটা সেই একটা হলগলে টি শার্ট, ছেলেটা একটা হাফ হাতা আকাশী নীল রঙের শার্ট। খুব উজ্জ্বল রংটা। ছেলেটার বাঁ হাতে ছাতাটা ধরা, ডান হাত দিয়ে মেয়েটাকে বেড় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার দুটো হাত বুকের কাছে বিবেকানন্দ স্টাইলে রাখা। চোখ বন্ধ করে মেয়েটা ছেলেটার ডান দিকের কাঁধে মাথা রেখেছে। চোখ বন্ধটা আমার বেশি করে চোখে লাগল। এতো সুন্দর এর আগে কোনোদিন মেয়েটাকে লাগেনি। ছেলেটার গাল মেয়েটার মাথার ওপর। সাধারনত বসে থাকতে দেখেছি বলে খেয়াল করিনি, আজ দেখলাম দুজনকেই বেশ লম্বা লাগছে। ছেলেটার চোখ খোলা। কিন্তু কিছু দেখছে না। মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে ভিজে গেছে। মাথার চুল আজ খোলা। আলুথালু লাগছে। ছেলেটার মাথা ডান দিকে হেলানো, একবার মেয়েটার চুলে নাক ঘষলো, মনে হলো আলতো করে একটা হামি খেল। তারপর আবার মেয়েটার মাথায় গাল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি জানি, চোখ খোলা থাকলেও ছেলেটা কিচ্ছু দেখছে না। আমি জানি।

সেদিন ছাতা নিয়েও ভিজে গেলাম বাড়ি ফিরতে ফিরতে। আসলে ছাতায় মাথা বাঁচে হয়তো, বৃষ্টি আটকায় না। হাওয়া দিলে এদিক ওদিক থেকে ছাট এসে ভিজিয়ে দেয়। তারপর একটা সময় মনে হয় বৃষ্টি ধরে এসেছে। আগের মুষলবর্ষণ এখন হালকা ঝিরঝিরে ইলশেগুঁড়ি হয়ে গেছে। ছাতা না খুললেও চলে। তারপর পাঁচ মিনিট বাদে দেখা যায় চশমার কাঁচ ঝাপসা, মাথার চুল ভিজে গেছে। যাদের হাঁপানির ধাত আছে, তখন থেকেই বোঝা যায় বুকের ভেতর কিরকম একটা জড়িয়ে মড়িয়ে যাচ্ছে যেন সব।

দু'দিন অফিস যেতে পারলাম না। একশোর বেশি জ্বর ওঠেনি। কিন্তু বুকে হাঁপানির টান, নিঃশ্বাস নিতে গেলে শাঁই শাঁই আওয়াজ হচ্ছে। গলার কাছটা ব্যথা ব্যথা। এমনকি সিগারেট খেতেও মুখে তেঁতো লাগছে। বাথরুমে ঢুকে একটা সিগারেট একদিন ধরিয়েও দুটো টান মেরে ফেলে দিলাম। বউ কারা না কি বলে, ওইসব তুলসী, মধু আরো কিসব মিশিয়ে গরম জল করে দিল। বোধহয় কোনো ইউটিউব চ্যানেল থেকে শিখেছে। রামদেব বাবার কোনো টোটকাও হতে পারে। দুটো ক্যালপল কী কারা, যার কল্যাণেই হোক না কেন, দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার দিকে শরীরটা একটু যুত হলো। আর একটু সুস্থ হতেই মনে পড়ল ওদের কথা।

কতরকম ভাবেই না দেখেছি এই কদিনে ওদের! একদিন কাঁধে হাত রেখে গল্প করা কী অন্যদিন একজন আরেকজন কে খাইয়ে দিচ্ছে। একদিন মুখ দেখে মনে হচ্ছে ছেলেটি খুব জটিল কোনো সাবজেক্ট বোঝানোর চেষ্টা করছে মেয়েটিকে। সে ভারতের অর্থনীতি থেকে প্রেমের কবিতা যা ইচ্ছে তাই হতে পারে। আর মেয়েটির মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে কিচ্ছু বুঝছে না, অথবা হয়তো বুঝতে চাইছেও না। শুধু একটু হাসি, একটু প্রশ্রয় মেখে ছেলেটার মুখের দিকে নিবিড়ভাবে তাকিয়ে আছে! উল্টোটাও দেখেছি। মেয়েটি যখন কিছু বলে শুধু মুখে বলে না, হাত পা মুখ চোখ সব একসঙ্গে কথা বলে যেন মেয়েটার! ছেলেটা এমন ভাব করে যেন খুব মন দিয়ে শুনছে। আমার ধারণা ছেলেটা তখন মনে মনে বলে, 'তুমি এরকম করে আবোল তাবোল বকে যাও, আমি চুপটি করে তোমায় দেখতে থাকি শুধু!'

পরেরদিন সকাল থেকেই আকাশ ঝলমলে পরিষ্কার। অফিসে যখন ঢুকলাম, ঝকঝকে রোদ। ভ্যাপসা গরমটা অনেকটা কমেছে। আকাশ একদম শরতের মতো উজ্জ্বল নীল। মনটা ভালো হয়ে গেল। আজ ওদের কোনো অসুবিধে হবে না নিশ্চয়ই।

বিকেলেও আকাশ ঝকঝক তকতক করছে। আমি যখন বেরোলাম সেই ছ'টার সময়, যেমন সুন্দর ওয়েদার তেমন সুন্দর আকাশটা হয়ে আছে। একটা হলুদ মতন মেঘ উঠেছে। তার ওপর আলো পড়ে কনে দেখা রোদ উঠেছে। কী অপরূপ দৃশ্য দেখলাম সেই আলোয়!

দেখলাম ছেলেটার হাতে একটা বাদামের ঠোঙ্গা রাখা। মেয়েটা একটা একটা করে বাদাম ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে ছেলেটার মুখে আর ছেলেটা গপগপ করে ধরে নিচ্ছে। কয়েকটা আবার এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে, ছেলেটার মুখে, গালে ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ছে। যতবার ছেলেটি মিস করছে, ততবার মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠছে। কনে দেখা আলোয় সেই হাসি চিনির দানার মতো মিশে যাচ্ছে আশেপাশের অদৃশ্য শীতল স্বচ্ছ বাতাসে।

আরো মাসখানেক চললো এই প্রক্রিয়া। কোনোদিন এমন স্বপ্নের মতন দৃশ্য দেখি, আবার কোনোদিন বা দেখি দুটোতে মিলে ঠোঁট ফুলিয়ে দু'দিকে মুখ করে বসে আছে। মাঝখানে এই এত্ত বড় একটা ফাঁক। পরেরদিন আবার দেখেছি ছেলেটা কানে কানে কিছু একটা বলছে আর মেয়েটা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে ছেলেটার গায়ে। কোনোদিন দেখি দু'জন মিলে একটা রোল ভাগ করে খাচ্ছে। কোথা থেকে নিয়ে এসেছে কে জানে! আশেপাশে তো রোলের দোকান নেই। দেখি একবার এ কামড় বসাচ্ছে, একবার ও। মেয়েটা বোধহয় ঝাল খেতে পারে না। মাঝে মাঝে আহা উহু করছে, দুটো ঠোঁট পাখির ঠোঁটের মতো সরু করে জিভ বের করে শব্দ করে শ্বাস টানছে। ছেলেটা বিরক্ত মুখে বলছে, "ইশ এইটুকু ঝাল খেতে পারিস না! আমার বাড়িতে গিয়ে তোর যা অবস্থা হবে না!" মেয়েটা মা কালীর মতো তাকাচ্ছে তখন! একদিন দেখলাম দু'জন মিলে একটা বই খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। বইটা দেখতে বেশ বড়, মানে সাধারণ আমরা যেরকম বই কিনে পড়ি, অথবা কোনো ম্যাগাজিন, সেরকম নয়। অনেকটা চাকরির পরীক্ষার জন্য যেরকম কিরণ'সের বড় বড় বইগুলো হয়, যাতে সব টেস্ট পেপার সলভ করতে দেওয়া থাকে সেরকম। মেয়েটা দেখি একটা পেন্সিল দিয়ে তার মধ্যে আবার কিরকম গোলগোল করে দাগ দিচ্ছে।

মাঝে বৃষ্টিও হয়েছে কয়েকদিন। সে এক ভীষণ মজার ব্যাপার! রোজ রোজ বৃষ্টির মধ্যে সেইরকম রোমান্টিক দৃশ্য হয় না। একদিন দেখি দুজনে দুটো ছাতা নিয়ে আলাদা আলাদা করে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটার ছাতার রং সেই কালো। মেয়েটার ছাতার রং সাদা, তার ওপর প্রিন্টেড ফুল ফুল করা, পিংক কালারের। বুঝলাম আবার হতভাগারা ঝগড়া করেছে! ও নিয়ে এখন আর চিন্তা করি না। জানি আবার আগামীকাল ঠিক দু'জনে একসঙ্গে বাদাম খাবে। একদিন দেখি, ওমা! দুজনে মিলে লিপ কিস করছে! ব্যাপারটা যতটা রোমান্টিক দেখতে লাগা উচিৎ, সেরকম ঠিক লাগছে না। বরং হাসি পাচ্ছে দেখে! কারণ ছেলেটা একটা হাত দিয়ে ছাতা ধরে আছে, সেই কালো ছাতাটা। আর আরেকটা হাত দিয়ে সে কী করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। একবার মেয়েটার কোমর ধরে কাছে আনতে চাইছে, একবার গালের পাশ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ঘাড় ধরে মেয়েটার মুখটা সামনে আনতে চাইছে! আর এই গোটা প্রসেসটায় মাঝে মাঝেই ছেলেটার হাতের ছাতা একবার এদিকে হেলে পড়ছে, আরেকবার ওদিকে! আমি চুপচাপ মাথা নিচু করে চলে এলাম। একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকলে আমি নির্ঘাত হেসে ফেলতাম বেচারার দুরবস্থা দেখে! চলে আসার সময় একটা চাপা গর্জন শুনতে পেলাম, "তুই একটা গাধা!"

বর্ষা এবছর আগে ঢুকে পড়েছে। এমনিতে প্রতি বছরই আবহাওয়া দপ্তর বলে জুনের আট কি নয়ে বর্ষা ঢোকে। কিন্তু সেসব পেছতে পেছতে মোটামুটি আগস্ট সেপ্টেম্বর মাস এখন বর্ষাকাল। সেই তুলনায় এবছর জুলাইয়ের মাঝ থেকেই বেশ ভালো বর্ষা শুরু হয়ে গেল।

সেদিন বৃষ্টি হয়নি। আমি সাধারণত শরীর খারাপ না হলে অফিস কামাই করি না। ওরা দু'জনও করে না। কখন আসে জানি না, কখন উঠে যায় তাও জানি না। কিন্তু রোজ দেখতে পাই। সেদিন দেখলাম কেউ নেই। ওদের দেখা একটা রুটিন হয়ে গিয়েছিল আমার। প্রাত্যহিক রুটিনে ধাক্কা খেলে অদ্ভুত একটা ফিল হয়। খুব দরকারী হয়তো কিছু নয়। ওরা আমার কে! কিন্তু একটা অস্বস্তি। কখনও চাপা, কখনও প্রকাশ্য। অনেকটা ঘরের একটা পুরনো ছবি সরানোর মতো। হয়তো শেষ কবে ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখেছি মনে পড়ে না। কিন্তু ছবিটা সরিয়ে দিলে, তারপর ঘরে ঢুকলে একটা অস্বস্তি হতে থাকে। কী যেন একটা ছিল, এখন আর নেই। হয়তো খেয়ালও করা হয়নি তখনও পর্যন্ত যে ছবিটা নেই। কিন্তু তাও কিছু একটা খচখচ করতে থাকে। আর এখানে তো ওরা আমার নিত্যদিনের একটা 'মন ভালো করা' জড়িবুটি হয়ে উঠেছিল। পরপর তিন দিন এলো না ওরা। শনি রবি তারপর।

টানা পাঁচদিন দেখিনি ওদের দু'জনকে। প্রথম দিন ভেবেছিলাম নির্ঘাত কারুর শরীর খারাপ হয়েছে। মনে মনে একটু বকলাম। এতো প্রেম কিসের! বৃষ্টিতে ভেজা, রাত জাগা সব ঠিক আছে। কিন্তু শরীরের দিকে তো একটু যত্ন রাখতে হবে! নাও ভোগো এবার! দ্বিতীয় দিন যখন দেখলাম নেই ওরা ওদের নির্দিষ্ট যায়গায়, আমার অস্বস্তিটা বাড়ল। তৃতীয় দিন নিশ্চিত হলাম, কিছু একটা গোলমাল পাকিয়েছে দু'জন মিলে। শনি রবি ভীষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে গেল। বউ একবার বলল, "তোমার কী হয়েছে বলত! এতো চুপচাপ তো তুমি থাকো না!" আমি একবার ভাবলাম খুলে বলি চখাচখীর কথা। তারপর ঠিক বুঝতে পারলাম না সেটা শুনতে কিরকম লাগবে। এই বয়সে আমি দু'জন তরুণ তরুণীকে রোজ প্রেম করতে দেখি, তাদের নিয়ে ভাবি এই কথাটা বউ কিভাবে নেবে আমি ঠিক জানি না। তাই কিছু বললাম না। শুধু বললাম, "আবার মনে হয় হালকা ঠান্ডা লেগেছে। শরীরটা ঢিস ঢিস করছে।" বউ বললো ও একটা নতুন প্রাণায়াম শিখেছে, শিখিয়ে দেবে আমায়। প্রত্যেকদিন সকালে উঠে খালি পেটে করলে সব ঠান্ডা লাগা পালাবে।

সোমবার অফিস থেকে বেরোনোর সময় আমার বেশ টেনশন হচ্ছিল। একটা আনকানি ফিলিং! যদি দেখতে না পাই, কী হবে! কী আবার হবে, মনকে বোঝালাম। হয়তো অন্য কোনো ভালো প্রেম করার জায়গা পেয়ে গেছে! ফাঁকা সুনসান বাইপাসের ধারের একটা সার্ভিস লেন প্রেম করার জন্য নিশ্চয়ই আদর্শ কোনো জায়গা নয়। একটা বোবা ভয় হচ্ছিল আসলে। মানুষ তো সবথেকে প্রথমে খারাপটাই ভাবে। নিজের অস্বস্তি বুঝে নিজেরই লজ্জা লাগল। যেন নিজের কাছে নিজে ধরা পড়ে গেছি।

ঐতো, দেখতে পেয়েছি! ছেলেটা বসে আছে! সেই ফুটপাথের ওপর। আজ বৃষ্টি নেই। আকাশ মেঘলা করে আছে। কিন্তু ছেলেটা একা। হোক একা, তবু একা ছেলেটাকে দেখেও আমার ভালো লাগল। ওকে দেখতে পেয়ে বুঝতে পারলাম আমি আসলে ভেতরে ভেতরে নিরাশাবাদী, আমি ভেবেই নিয়েছিলাম আর বোধহয় ওদের কোনোদিন দেখতে পাব না। কিন্তু ছেলেটাকে দেখে আশা জাগল আবার। ভাবলাম, ধুর দু'তিন দিন কী না কী হয়েছে, আসেনি, আর আমি মনে মনে কত কিই না ভেবে নিলাম! চখা যখন এসেছে, চখীও নিশ্চয়ই চলে আসবে! আমি খুব নিশ্চিন্ত মনে চলে এলাম। দেখলাম ছেলেটা একা একা বসে একটা বই পড়ছে। এমনি সাধারণ মলাটের একটা বই। আগেরদিন চাকরির পরীক্ষার মতো দেখতে বইটা নয়।

পরেরদিন আবার দেখলাম ছেলেটা একা বসে আছে। এবার আমার আবার একটু একটু অস্বস্তি হলো। দু'জন মিলে তো একটা গোটা দৃশ্য সম্পূর্ণ হয়। একজন থাকলে কীকরে হবে! আজ দেখি ছেলেটা এমনিই বসে আছে। না হাতে বই না কিছু। হয়তো মেয়েটার আসার সময় চেঞ্জ হয়ে গেছে। হয়তো সে অপেক্ষা কর আছে মেয়েটার জন্য। আজ ছেলেটা একটা কালো টি শার্ট পরে এসেছে। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, ফর্সা তো, ডিপ কালারের কোনোকিছু পরলে ভালো লাগে ছেলেটাকে। ওর মুখ দেখে বিষণ্ণ কী অপেক্ষা করছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। চলে এলাম।

পরেরদিন আর থাকতে পারলাম না। সারাদিন ধরে ভেবেছি, আমি ওদের দেখি ওরা লক্ষ্য না করে যায় না। কোনোদিন আমি টেরিয়ে টেরিয়ে অসভ্যের মতন চেয়ে থাকিনি, ওরাও আমি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কোনোদিন কিছু বলেনি বা এমনকিছু করেনি যাতে আমার অস্বস্তি হয়। একজন মানুষ তো আরেকজন মানুষের কথা জিজ্ঞেস করতেই পারে। মানুষ তো সমাজবদ্ধ জীব নাকি! সারাদিন নিজেকে এসব বোঝালাম।

তারপর যখন অফিস থেকে বেরোবার জন্য চেয়ারটা থেকে উঠলাম, বুঝতে পারলাম আবার সারাদিন কিসব বোকার মতো ছেলেমানুষী চিন্তাভাবনা করেছি! একজন পঞ্চাশ বছর বয়সের বুড়ো হাবড়া লোক একজন অচেনা তরুণকে জিজ্ঞেস করবে, 'তোমার গার্লফ্রেন্ড কোথায়? অনেকদিন দেখতে পাচ্ছি না বলে চিন্তা হচ্ছে!' এটা হয়! তারপর ছেলেটা আমাকে দুটো খারাপ কথা বললে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

নাহ্, আজও ছেলেটা একা। মোবাইল দেখছে। আজ একটা ফুলশার্ট পরেছে। পায়ে একটা নীল প্লাস্টিকের জুতো। আমি জানি আমি কিছুই জিজ্ঞেস করবো না। পাশ দিয়ে চলে যাবো। যেমন রোজ যাই।

"ভাই কয়েকদিন দেখছি একা একা বসে আছেন!"

ছেলেটা আমার দিকে তাকাল। বিস্ময় নয়, রাগ নয়, বিরক্তি নয়, যেন অনেকদিন আগের পরিচিত কাউকে দেখছে, ঠিক মনে করতে পারছে না। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেই মনে পড়ে যাবে। ওভাবেই ছেলেটা খানিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল। আমার মুখে একটা অত্যন্ত বোকা বোকা মৃদু হাসি। প্রাণপণে স্বাভাবিক থাকার অস্বাভাবিক একটা চেষ্টা আরকি।

- "ওরা চলে গেছে।"
- "মানে?"
- "মানে ওরা, ওদের ফ্যামিলি আর এখানে, এই কলকাতায় থাকে না।"
- "সেকি! কোথায় গেলো?"

নিজের স্বরের আকুতি শুনে আমার নিজের কানেই অস্বাভাবিক লাগল। কিন্তু তখন সেসব ভাবার সময় নেই। দেখলাম ছেলেটা আবার একটুক্ষণ চুপ করে রইল। একটা জোরে নিঃশ্বাস নিল। তারপর খুব শান্ত গলায় বলল, "মিথিলার বাবার তো ট্রান্সফারের চাকরি, হায়দ্রাবাদ চলে গেছে ওরা!"

- "ওঃ, তাতে আর এমনকি এলো গেলো! এখন তো তোমাদের ফোন আছে, ফেসবুক আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে..."

আমি একটু নিশ্চিন্ত হলাম যেন। এমন কিছু সিরিয়াস ব্যাপার নয় তাহলে! ছেলেটার মুখ দেখে মনে হলো আরও কিছু একটা বলতে চাইছে। একটু কথা বলে তখন আমারও একটু সাহস হয়েছে আগের থেকে। ছেলেটা আমায় দুটো খারাপ কথা বলেনি। তার মানে আমায় চেনে ওরা। কথাটা ভেবে একটা অদ্ভুত ভালো লাগা ঘিরে ধরল আমায়। কেন জানি না।

- "আপনার নাম কি অক্ষয়?"
- "আমি? মানে হঠাৎ এরকম মনে হলো!"
- "ও আপনার নাম দিয়েছিল অক্ষয়। আমাদের ঝগড়া হলে বলতো, কাল অক্ষয়কাকুকে বলে দেবো, তোকে ছাতার মাথা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেবে!"

আমি হেসে ফেললাম প্রথমে। তারপর অকারণেই আমার চোখে জল এলো। মনে মনে মিথিলার মুখটা মনে করার চেষ্টা করতে লাগলাম। যতবার মনে করার চেষ্টা করি, খালি ওই দৃশ্যটা মনে আসে। মিথিলা চোখ বন্ধ করে ছেলেটার কাঁধে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ওটা পৃথিবীর সুন্দরতম তিনটে ছবির একটা। বাকি একটা প্রথম দেখা আমার ছেলের মুখ। আরেকটা, আকাশ জুড়ে মেঘ করলে এখনও যার মুখ মনে করলে বুকটা টনটন করে ওঠে, তার।

- "কিন্তু আমার নাম তো অক্ষয় নয়!"

ছেলেটা হেসে ফেলেছে। হাসলে ছেলেটাকেও সুন্দর লাগে। কে বলে পুরুষ সুন্দর হয় না! প্রেমিক পুরুষের প্রেমের লজ্জাবনত প্রকাশের মতো সুন্দর হয় নাকি আর কিছু!

- "সে কি আর আমরা জানতাম না নাকি! আমিও বলতাম তোর অক্ষয়কাকু বুড়ো হয়ে গেছে, আমার সঙ্গে পারবে না!"

আমি হাসলাম। আত্মীয়তার হাসি। ছেলেটাও হাসছে। খুব উচ্চকিত শব্দ করে হাসি নয় অবশ্য। স্বাভাবিক, প্রেমিকা হঠাৎ করে অনির্দিষ্ট কালের জন্য হায়দ্রাবাদ চলে গেলে কারই বা ভালো লাগে! আমি বললাম, "পরেরদিন কথা হলে বলে দিও অক্ষয়কাকুর নাম খুব পছন্দ হয়েছে!" না হয় অক্ষয় নাম আমার অক্ষয় হোক। কী এসে যায় তাতে! শুনলাম ছেলেটার নাম তমাল।

আমি চলে আসছিলাম। তমাল পেছন থেকে ডাকলো, "কাকু, আমাদের ব্রেক আপ হয়ে গেছে।"

গলা কাঁপল বলে মনে হলো না। আমার পা কাঁপল একবার। একটুখানি চুপ করে বললাম, "ওরকম ঝগড়া সবার মধ্যে হয়। ফোন করো, মেসেজ করো। ফেসবুকে মেসেঞ্জার আছে না! অক্ষয়কাকু কিন্তু বেশ টেক স্যাভি!"

তমাল দুটো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, "সব জায়গায় ব্লক করে দিয়েছে।"

কী, কেন এসব জিজ্ঞেস করার মানে হয় না। হয়তো আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। হয়তো হবে না। পৃথিবীটা যতটা বড় আমরা ভাবি, তার চেয়ে আরো অনেক অনেকটা বেশি বড়। কতই বা বয়স এদের! দু'দিন মন খারাপ থাকবে, আবার দু'জনেই নিজের নিজের মতো করে ভালো থাকা শিখে যাবে। কিন্তু তমালকে এসব বলা যায় না। ও অনেকটা ছোট আমার থেকে। হয়তো ও এসব আগে থেকেই জানে। এখনকার ছেলে মেয়েরা আমাদের থেকে অনেক স্মার্ট হয় শুনেছি।

আমি চলে এলাম। মনটা ভারী হয়ে রইল। বাড়ি এসে আবার মনটা হালকা লাগল। কেন কে জানে! আসলে যেকোনো ঘটনাই হোক, সেটা যতই দুঃখেরই হোক না কেন, নিশ্চিত হয়ে গেলে একটা ত্রাণ আসে। অনিশ্চয়তার মধ্যে বরং একটা টানাপোড়েন থাকে। হবে কী হবে না, এই ব্যাপারটা। মা যে কটা দিন নার্সিং হোমে কষ্ট পাচ্ছিল, ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম। যেদিন মা চলে গেল, কষ্ট নয় ধাক্কা খেলাম। কিন্তু সেই ধাক্কা খাওয়ার পর এটুকু নিশ্চিত হলাম, আর কোনো টানাপোড়েন নেই, আর কোনো অনিশ্চয়তা নেই। হবে কী হবে না এই দোলাচলের থেকে শূন্যতার স্থিরতা একটা শান্তি দেয়। পরিসমাপ্তির প্রশান্তি।

তমাল রোজ আসে। আমি হাসি। ও ও হাসে আমায় দেখে। কোনোদিন কথা বলে না। আমিও বলি না। বলার মতো কথা খুঁজে পাই না। কেন আসে তাও জানি না। এখন তো মিথিলা নেই। প্রত্যেকদিন ঠিক ওই জায়গাটাতেই কেন ওরা দেখা করত সেটাও আমার জানা হয়নি।

মাসখানেক পর দেখলাম তমাল ফোনে কারুর একটা সঙ্গে কথা বলছে। আমার দিকে তাকিয়ে স্বভাবসিদ্ধ একটা হাসি হাসল। আমিও হাসলাম। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনতে পেলাম কাকে গাঢ় গলায় বলছে, "আই লাভ ইউ.."

আমার প্রতিক্রিয়া হলো না। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম মেঘ করেছে। ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে একটা। মিথিলা হায়দ্রাবাদে কী করছে কে জানে! তমাল কার সঙ্গে কথা বলছে তাই বা কে জানে! আমি ব্যাগ থেকে ছাতা বের করলাম। বৃষ্টি আসবে যে কোনো মুহূর্তে। পেছন ফিরে চাইলাম একবার। দেখলাম তমাল ছাতা বের করেনি এখনও। ফোনে কারুর সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গভাবে কথা বলছে। মিথিলা হতে পারে, নাও হতে পারে।

থাক, কিছু কথা অজানা থেকে যাওয়ার জন্যই হয়তো পৃথিবীটা এতো অসহ্য সুন্দর!

দাদামশায়ের স্বর্গলাভ

শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

ছোটখাট মানুষটি, খদ্দরের পাঞ্জাবী আর পায়জামার ঘরোয়া পোশাকেই তাঁকে দেখা যেত পাড়ায়। কর্মজীবন ভাড়া বাড়িতে অথবা কর্মসুত্রে পাওয়া আবাসনে কাটিয়ে রিটায়ার করার পর কলকাতার সল্টলেকে নিজের বাড়িতে বসবাস করছেন, একা। কর্মজীবনে ছিলেন দেশবিদেশ-ঘোরা নামকরা অধ্যাপক এবং একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। স্বল্পভাষী, কিন্তু তুখোড় ডিবেটার এবং চিন্তাশীল সুবক্তা বলে তাঁর নামডাক। আবার প্রচন্ড জেদী ও স্পষ্টবক্তা, শত বাধা বা ভয় তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারত না।

বাড়িতে কাজের মেয়েটির নাম আয়েশা, 'দাদামশায়' সম্বোধনটি তারই সৃষ্টি। অনেক সময় ছোট করে বলে 'দাদা'। পাড়ার রাস্তাঘাটে বা বাজারে তাঁকে সবাই 'স্যার' বলেই চেনে, তার শিক্ষক-জীবনের পরিচিতি।
কলকাতার এই অঞ্চলটি গড়ে উঠেছে সম্প্রতি, গত ৫০-৬০ বছরে, জলাজমি উদ্ধার করে। এখানকার বাসস্থানগুলি তাই বেশী পুরনো নয় এবং রকমারি আধুনিক স্টাইলে তৈরি। বাসিন্দাদের বেশীরভাগই অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী। কিছু কিছু অ-বাঙ্গালীও আছেন, যাঁরা বাঙ্গালী প্রতিবেশীদের চোখে অনভিপ্রেত না হলেও 'অতিথি' মত, কারণ তাঁরা ঠিক 'ভূমিপুত্র' ন'ন। আর একটি অনুচ্চারিত সত্য এই যে সল্টলেকে অ-হিন্দু, বিশেষত মুসলমান, বাসিন্দা নিতান্তই কম। নানা ভাষা, নানা মতের দেশ ভারত, কিন্তু প্রতিবেশী-সুলভ পারস্পরিক পরিচিতির ঘনিষ্ঠতা ভাষা বা মতের এই ভিন্নতার কারণেই সব সময় গভীর হয়ে উঠতে পারে না। এমন কি তাদের সহাবস্থানও সব সময়ে শান্তিপূর্ণ হয় না।

দাদামশায়ের প্রতিবেশীদের মধ্যে কিন্তু একটি মুসলমান পরিবার আছে। গৃহকর্তার নাম হাসান, তাঁর স্ত্রী জুলেখা। হাসানসাহেব পেশায় উকিল, হাইকোর্টে তাঁর পসার ভালই। তাই তিনি উচ্চবিত্ত। পাড়ায় তাঁকে অনেকেই চেনে, দু-একজন হয়ত তাঁর মক্কেল। তবে ভদ্রতা বিনিময়ের বেশী পরিচিতি তেমন কারুর সঙ্গে তাঁর নেই, ঘনিষ্ঠতা ত নয়ই।

সল্টলেকের কাছাকাছি আছে একটি বস্তি। গরীব শ্রমজীবি মানুষের বাসস্থান, যাদের বড় অংশ মুসলমান। এখানকার অনেকে, বিশেষত মেয়েরা, সল্টলেকের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতে যায়। সাদিয়া নামের একটি মেয়ে এখান থেকে প্রতিদিন হাসানসাহেবের বাড়ি সমেত তিন-চারটি বাড়িতে কাজ করতে আসে। দাদামশায়ের বাড়ির আয়েশা আসত আরও দূর থেকে, বাসে বা ট্রেনে। বিভিন্ন পরিবারের গৃহকর্মীরা পরস্পরের সুখ-দু;খের ভাগী, বন্ধুর মত। তাদের মধ্যে কেউ হিন্দু, কেউ বা মুসলমান, কিন্তু সবাই সহায়সম্বলহীন গরীব। এইটিই তাদের মিল। বিভিন্ন বাড়ির বিভিন্ন ব্যবস্থা। কোন গৃহস্থ গৃহকর্মীকে শুধু সকালের জলখাবার দেয়, কেউ বা দুপুরের খাবার। কিন্তু সমস্যা হয় গরমের দিনে স্নান করার সুবিধার অভাবে। মধ্যবিত্ত গৃহিণীরা বাড়ির কাজের মানুষকে নিজেদের বাথরুম ব্যবহার করতে দিতে চান না। আয়েশার সে সমস্যা নেই। দাদামশায় নিজের থেকেই তাকে বাড়ির বাথরুম প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে বলেছেন।

যেদিন সে কাজ শুরু করে দাদামশায় কাজ বুঝিয়ে দেবার সময় বলেছিলেন যে তাকে রান্নাও করতে হবে। তিনি কি খেতে পছন্দ করেন জানতে চাইলে দাদামশায় বলেছিলেন 'দু-চারদিন তুই নিজের পছন্দমত রাঁধ, সেগুলি চেখে আমি জানাব কোনগুলি আমার অপছন্দ'। তবে তিনি যে মাংস খান না এটি জানিয়ে দিয়েছিলেন। একা মানুষের সংসারে কাজ কম বলে দাদামশায়ের রান্না ও অন্যান্য কাজ আগে সেরে আয়েশা অন্য বাড়ির কাজে যেত। আবার দুপুরে ফিরে আসত দাদামশায়ের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতে। প্রথম দিন খাবার বেড়ে দিতে গেলে তাকে থামিয়ে দাদামশায় বলেছিলেন 'আমি কি খাব, কতটা খাব তোর জানার কথা নয়, তাই আমিই বেড়ে নেব আর সঙ্গে তোকেও বেড়ে দেব, কাজের সুবিধা হবে'। খাবার নিজে বেড়ে খান এবং নিজেরটির সঙ্গে কাজের মেয়েকেও খাবার বেড়ে দেন এ রকম গৃহকর্তা বা গৃহিণী আয়েশা আগে দেখে নি।

দাদামশায় যদিও একা এবং নিতান্তই স্বল্পাহারী, আয়েশাকে রাঁধতে হত একটু বেশী করেই, দাদামশায়ের অতিথিদের জন্য। তিন-চারটি পরিচয়হীন রাস্তার কুকুর তাঁর নিত্য অতিথি। এদের মধ্যে একটি বৃদ্ধ এবং খুঁড়িয়ে হাঁটে। ৭ নম্বর বাড়ির কাজের মেয়ে নাজিয়া মজা করে তাকে ডাকে 'লেংচু' বলে। সে যেন দাদামশায়ের বেশী প্রিয়। আর একজন মানুষ, নাম জনার্দন। সে মুচি, বিহারের মানুষ, কথা বলে বাংলা-হিন্দি মিশিয়ে। বাজারের কাছে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে বসে রোজ।

খদ্দেরদের তাগিদমত জুতো সারাই, পালিশ ইত্যাদি ক'রে তার রুজির ব্যবস্থা হয়। অনেকটা দূর থেকে তাকে আসতে হয়। দুপুরে খাবার জন্যে এক-ঠোঙ্গা ছাতু, একটু নুন ও দু- তিনটি কাঁচালঙ্কা সঙ্গে নিয়ে সে কাজে আসে। বাজারের মুখে সরকারি টিউবওয়েল থেকে ছাতু মাখার জল আনতে গেলে তাকে প্রায়ই কথা শুনতে হয় 'নিচু জাত' বলে। একদিন জুতো পালিশ করানোর সময় ব্যাপারটি দাদামশায়ের কানে আসে। তিনি জনার্দনকে বলেন তাঁর বাড়িতে খাবার সময় চলে আসতে। এই ব্যবস্থায় গরমের দিনে তার মাথার ওপর ছাত জুটল কিছুক্ষণের জন্য আর আয়েশার রান্না ডাল-ভাত খেয়ে পেট ভরারও ব্যবস্থা হল। ছাতুটি বাঁচিয়ে সে সন্ধ্যার জলখাবার সারত। ফলে বাড়ি ফিরতে পারত একটু বেশীক্ষণ কাজ ক'রে। তাতে অফিস-ফেরতা বাবুদের সুবিধা হ'ল আর জনার্দনের রোজগারও একটু বাড়ল।

দু-একদিন আসার পর জনার্দন নিজের থেকেই বলেছিল সে দাদামশায়ের বাগানের ফুলগাছগুলিতে নিয়মিত জল দিয়ে দেবে। শুধু দাক্ষিণ্য নিতেই নয়, সে তার সাধ্যমত কিছু দিতেও চায়, এটি বুঝে দাদামশায় খুশি হয়েছিলেন। জনার্দনকে বলেছিলেন মাঝে মাঝে জল দিলেই হবে।

আয়েশার বন্ধুরাও দুপুরের খাবার পর অনেক সময় দাদামশায়ের বাড়ির বারান্দার নিরিবিলি আশ্রয়ে এসে গল্পগুজব করে, কখনও লুডো বা তাস খেলে। কেউ কেউ শুক্রবারে জুম্মার নামাজও সেরে নেয় ঐ বারান্দায়, পশ্চিমমুখী হয়ে। নাজিয়া দাদামশায়ের খবরের কাগজগুলোর পাতা ওল্টায় নিয়মিত।

দাদামশায় নিজে বসার ঘরের ইজিচেয়ারে শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন, মাঝেমাঝে আয়েশাদের আড্ডায় যোগ দেন। তাদের মধ্যে মতের গরমিল হলে তারা দাদামশায়ের সালিশি মানে। মাঝেমাঝেই দাদামশায়ের ডাক পড়ে সভা-সমিতিতে, পৌরিহিত্য করতে বা বক্তৃতা দিতে। গাড়ি আসে তাঁকে নিয়ে যেতে। তিনি বেরিয়ে গেলেও তাঁর অতিথিরা নিজেদের সময়মতই যায়। বাড়ির চাবি থাকে আয়েশার দায়িত্বে।

সামনে রমজানের ঈদ। এক মাস রোজার উপবাসের শেষে মুসল্‌মান সম্প্রদায়ের আনন্দোৎসব। হাসানসাহেবের বাড়িতে অতিথি সমাগম হবে তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সাদিয়ার ব্যস্ততা বেড়েছে। তবে ঈদের 'বোনাস' হিসেবে সে শাড়ি ও কিছু বাড়তি বেতনও পাবে। সাদিয়া অবশ্য ঈদের দিনটিতে ছুটি নিয়েছে, নিজের বাড়িতে ঈদ কাটাবে ব'লে। আত্মীয়-প্রতিবেশী কয়েকজন একসঙ্গে হয়ে ঈদের ভোজ রান্না এবং খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে তারই বাড়িতে। তাকে রান্নাবান্নায় সাহায্য করবে আয়েশা। আর ঈদের ভোজে দাদামশায় হবেন তাদের সম্মানীয় অতিথি। ঈদের আনন্দ ও খাবার ভাগ করে নেওয়ারই রেওয়াজ।

হাসানসাহেবের বাড়ির কাজকর্ম সেদিন নাজিয়া করে দেবে, এই ব্যবস্থায় জুলেখা তাকে ছুটি দিয়েছেন। নাজিয়ার বয়স ১৩-১৪'র বেশী নয়। মায়ের সঙ্গে থাকে ঘুপচি এক-ঘরের বাসস্থানে। সে স্কুলে পড়ত, ইংরেজি, বাংলা লিখতে পড়তে পারে। দিদিমণিরা বলত পড়াশুনায় তার মাথা আছে। তার বাবা-মায়ের প্রতিদিন ঝগড়া হত ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে। মাঝে মাঝে মায়ের গায়ে বাবার হাতও উঠত। একদিন বাবা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সে শুনেছে তার বাবা কাছাকাছি পাড়ায় তার মায়ের বন্ধু মুনিরাখালার সঙ্গে ঘর বেঁধেছে। নাজিয়াকে স্কুল ছেড়ে কাজে লাগতে হয়েছে। তিনটি বাড়িতে নিয়মিত কাজ করে সে। তার মা সালমা কাজ করে সেলাই কারখানায়। ঈদের দিনে কাজে গেলে 'উপরি' বেতন পাওয়া যাবে তাই সালমা ছুটি নেয় নি। ঘরে তার প্রায় হর-রোজই রোজা, ঈদের দিনের আনন্দও তার জন্য নয়। অন্তত দিনটি নাজিয়ার যে ভাল কাটবে এইটিই সালমাকে স্বস্তি দিয়েছে। কিছু পয়সা জমিয়ে যদি একটা সেলাইয়ের মেশিন সে কিনতে পারে তা হলে তার রোজগার এক্‌টু বাড়বে। তখন নাজিয়াকে কাজ ছাড়িয়ে আবার স্কুলে পাঠাবে, এই তার ইচ্ছা। সামান্য সঞ্চয় যা হয়েছিল নাজিয়ার বাবা সেটি নিয়ে গেছে।

ঈদের দিন। দাদামশায় বাজার থেকে এক তোড়া ফুল ও এক বাক্স মিষ্টি কিনে হাসান সাহেবের বাড়িতে গেলেন। বেল বাজাতেই ভেতর থেকে নারী কণ্ঠস্বরে ভেসে এল "দেখেশুনে দরজা খুলো"। মুসলমান পরিবার, অনাহুত আগন্তুক সম্বন্ধে সন্ধিগ্ধ। দরজা খুললেন হাসানসাহেব। দাদামশায় হাত জোড় করে তাঁকে সম্ভাষণ করলেন 'ঈদ মুবারক' ব'লে। হাসানসাহেব এক্‌টু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন 'আজ আমরা এক্‌টু ব্যস্ত আছি, আপনাকে বসতে বলতে পারছি না'। উত্তরে মৃদুভাষী দাদামশায় বললেন 'আমি আপনার প্রতিবেশী, সতের নম্বরে থাকি। আজ ঈদের দিন, তাই আপনাকে এবং আপনার পরিবারের সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলাম। ফুলের তোড়া ও মিষ্টির প্যাকেটটি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন 'আপনাদের দিনটি আনন্দে কাটুক, এই আমার কামনা'।

হাসানসাহেন থতমত। এ পাড়ায় তিনি নতুন, কিন্তু কলকাতায় তাঁর অনেকগুলি ঈদ কেটেছে আজকের অভিজ্ঞতাটি অভিনব, আগে কখনও হয় নি। পাড়ার অন্য অনেকের মতই এই বয়স্ক প্রতিবেশীটিকে তিনি দেখেছেন কিন্তু কখনও পরিচয় হয় নি। অথচ তিনি নিজে বাড়ি ব'য়ে এসে তাঁর পরিবারকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলেন। অর্থাৎ তাঁর ধর্মীয় পরিচিতি এই প্রতিবেশীটি জানেন এবং শ্রদ্ধা করেন।

ঈদ কাটিয়ে সাদিয়া কাজে ফিরলে হাসানসাহেব তার কাছে শুনলেন ১৭ নম্বরের দাদামশায় ছিলেন তার ঈদের নিমন্ত্রিত অতিথি। দাদামশায় সকাল-সকালই পৌঁছে গিয়েছিলেন। সঙ্গে এনেছিলেন সকলের জন্য মিষ্টিদই ও সন্দেশ। এবার ঈদ পড়েছে শীতের মধ্যে। রান্নাঘরের বাইরে রোদে বসে তিনি সকলের সঙ্গে গল্পগুজব করে মাতিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে তারা শুনেছে যে দেশভাগের আগে যে গ্রামে তিনি বড় হয়েছিলেন সেটি এখন বাংলাদেশে। সেখানে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অনেকেই ছিল মুসল্‌মান। প্রতিদিন তাঁরা একসঙ্গে পড়াশোনা, খেলাধূলা করতেন। ঈদের দিনগুলি তাঁর কাটত তাদের বাড়িতে, বরাবর। ঈদের সে ভোজের সুগন্ধ ও স্বাদ তাঁর এখনও মনে পড়ে।

ঈদের খাবারের প্রধাণ আকর্ষণ মাংসের বিরিয়ানি। অনেক সময় মাংসটি হয় গরুর, যা হিন্দুদের জন্য নিষিদ্ধ। কৌতূহলী হাসানসাহেব জানতে চাইলেন দাদামশায় কি খেলেন। সাদিয়া বলল দাদামশায় কোন মাংসই খান না, তাই সে তাঁর জন্য রোজের মতই মাছের ঝোল ও ভাতের ব্যবস্থা রেখেছিল। কিন্তু দাদামশায় ঈদের বিরিয়ানিও চেখে দেখতে চাইলেন এবং মাংস বাদ দিয়ে দু-মুঠো খেলেন। কেমন হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বললেন তাঁর বন্ধুদের বাড়ির বিরিয়ানি হত আরও সুস্বাদু। হাসানসাহেব আবারও বুঝলেন দাদামশায়টি স্বতন্ত্র চরিত্রের মানুষ।

শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। দাদামশায় দুপুরের বিশ্রামে একদিন ব্যঘাত ঘটাল বাড়ির বাইরের হৈচৈ। দরজা খুলতেই দেখলেন আয়েশাসমেত পাঁচ-সাতজন গৃহকর্মী মেয়ে হাজির হয়েছে, সবাই কোন কারণে উত্তেজিত। তারা বলল টিভি এবং রেডিওতে জানিয়েছে যে দিল্লির কাছে কোথায় নাকি একটি মসজিদ কারা ভেঙ্গে দিয়েছে আর তাই নিয়ে হিন্দু-মুসল্‌মানের দাঙ্গা শুরু হয়েছে। যেসব বাড়িতে তারা কাজ করে তারা তাদের বাড়ি চলে যেতে বলেছে। কিন্তু তারা যেতে ভয় পাচ্ছে। দাদামশায় তাদের শান্ত করে টেলিফোন করতে গেলেন। ফিরে এসে বল্‌লেন তিনি পুলিসের সঙ্গে কথা বলেছেন। পুলিস বলেছে গাড়ি পাঠাবে তাদের বাসস্থানে পৌঁছে দেবার জন্য। তবে তারা যদি তাঁর বাড়িতে থাকতে চায় ত তাও করতে পারে।

পুলিসের বড়সাহেব দাদামশায়কে শ্রদ্ধা করেন, তাই তাঁর টেলিফোনে কাজ হ'ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিসের ভ্যান এল, মেয়েদের নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দিতে। বস্তির চারপাশে পুলিস পাহারার ব্যবস্থা থাকবে কিনা দাদামশায় জানতে চাইলে পুলিসের লোকটি বলল থাকবে। হাঙ্গামার সুযোগ নিয়ে অনেক সময় জমি-ব্যবসায়ীরা বস্তিগুলিতে আগুন লাগিয়ে জমি খালি করার চেষ্টা করে। তাই দাদামশায়ের উদ্বেগ, যেটি তিনি তাঁর পুলিস-অফিসার বন্ধুকে জানিয়ে থাকবেন।

মোগল বাদশারা আর নেই, কিন্তু তাদের ঘিরে প্রাচীন শহর অযোধ্যায় হিন্দু-মুসলমানের কলহ ও রক্তক্ষয়ী তান্ডব চলছে আজও। এই দাঙ্গাটিও চলল বেশ কিছুদিন ধরে। প্রাণ হারাল বহু নিরীহ মানুষ, সম্ভ্রম হারাল বহু অসহায় নারী। কারুর জয় হল না। হার হল মনুষ্যত্বের, ধর্মের নামে।

কলকাতা শহরে দাঙ্গার প্রকোপ ছিল অল্প। তাও দাদামশায় একদিন পায়ে হেঁটে গেলেন সাদিয়াদের পাড়ায়, তারা কেমন আছে জানতে এবং তাদের ভরসা জোগাতে। খবর পেয়ে পাড়ার অনেকেই এসে হাজির হল। সাদিয়াদের এলাকার সবচেয়ে বয়স্ক মানুষটির নাম মোতালেব। কিন্তু সবাই তাঁকে ডাকে 'মতলবভাই' বা 'মতলবচাচা' বলে। তাঁর বয়স ৯০ পেরিয়ে গেছে। বৃদ্ধ দাদামশায়কে তাদের দুঃসময়ের বন্ধু হিসেবে পেয়ে তিনি তাঁর হাতদুটি ধরে চোখের জল সামলাতে পারলেন না। তাঁর মনে পড়ল দেশভাগের সময়কার দাঙ্গার কথা। তখনও আর এক বৃদ্ধ এসে তাদের পাড়ার কাছেই ছিলেন। পায়ে হেঁটে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভরসা দিয়ে বলেছিলেন হিংসা ভুলে শান্ত হতে। হিন্দু-মুসলমান সবাই ভারতীয়, ভাই-ভাই। তিনি ছিলেন গান্ধীবাবা। তিনি স্বর্গে গেছেন। তাঁর কথা কি কেউ মনে রেখেছে? মতলবচাচা নিজেকেই প্রশ্ন করলেন।

দাদামশায় চলে যাবার পর মতলবচাচা বললেন দাদামশায়ের মত মানুষকে আল্লাহ স্বর্গে স্থান দেবেন, তোরা দেখে নিস। কথাটি শুনে সাদিয়ার মাথায় এল যে দাদামশায়কেও ত একদিন সব ছেড়ে চলে যেতে হবে, তখন তাদের কথা কে ভাববে। সে তার বন্ধুদের ব্যপারটি জানাল। ১৩ নম্বর বাড়ির কাজের মেয়ে সুশীলা বলল তার দিদিমার কাছে সে শুনেছে যে যারা সত্যিই পুণ্যি কাজ করে তারা সশরীরে স্বর্গে যায়। অনেক কাল আগে যুধিষ্ঠির নামে একজন সত্যবাদী মহা পুণ্যবান রাজা ছিলেন। তাঁকে দেবতা ইন্দ্র নিজের সাজানো রথে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ছিল অসহায় একটি রাস্তার কুকুর। তাকে ছেড়ে তিনি স্বর্গে যেতে রাজি হন নি, তাই সেও গিয়েছিল স্বর্গে। দিদিমার 'মহাভারত' বইতে এই সব লেখা আছে।

সাদিয়ার শুনে ভাল লাগল, কিন্তু আবার খটকাও লাগল কি করে তারা জানতে পারবে দাদামশায় কোথায় গেলেন, তাদের ত কেউ কিছু বলে না। কে জানে হয়ত দাদামশায়ই তাদের জানিয়ে যাবেন। আর দাদামশায়ের অতিথি কুকুরগুলো? তারা কি করবে? অতগুলো কুকুরের কি স্বর্গে ঠাঁই হবে?

দাদামশায়ের বন্ধুবান্ধবরা একসঙ্গে হয়ে একদিন তাঁর জন্মদিন পালন করল, সল্টলেকের কম্যুনিটি সেন্টারের হল ভাড়া করে। আয়েশা, সাদিয়ারাও কাজের শেষে সেখানে গিয়ে সব দেখল, শুনল ও খাওয়াদাওয়া করল। স্থানীয় পৌরসভার মেয়রও উপস্থিত ছিলেন। তিনি দাদামশায়কে প্রণাম জানিয়ে কামনা করলেন যেন তিনি আরও অনেক বছর সুস্থভাবে বেঁচে থাকেন। দাদামশায় হাসিমুখে বললেন তাঁর যা বয়স তাতে আর কতদিন সুস্থ ভাবে বাঁচা সম্ভব তিনি জানেন না। আয়েশা, সাদিয়ারা মনে মনে চাইল দাদামশায় চিরকাল বেঁচে থাকুন তাদের দেখ-ভাল করার জন্য।

সবে গরম পড়তে শুরু করেছে। দাদামশায়ের শরীরটা ঠিক যাচ্ছে না, খাওয়াদাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন। আয়েশা বলে ডাক্তারবাবুদের ডেকে পাঠাতে, দাদামশায় উত্তর দেন না।

একদিন কাজে এসে আয়েশা দেখল তার পরিচিত দাদামশায়ের দু'জন ছাত্র বাড়িতে রয়েছেন। তাঁরা জানাল আগের দিন রাত্রে দাদামশায় তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অসুস্থ বোধ করেন। পাড়ার ডাক্তারকে ডাকা হয়। তিনি পরীক্ষা করে উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য দাদামশায়কে হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেন। তাই তাঁকে কাছাকাছি একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাতটা তাঁর কেটেছে অস্বস্তিতে, যদিও তিনি জ্ঞান হারান নি। আয়েশা প্রয়োজনমত কাজকর্ম সারল। নিজেদের জন্য রান্নাও করল। দাদামশায়ের অনুপস্থিতি তাকে পীড়া দিতে লাগল। তার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল দাদামশায় যদি আর না ফেরেন। যদি সত্যিই আল্লাহ তাঁর জন্য সাজানো রথ পাঠান হাসপাতালে, যেমন সুশীলার দিদিমার বইতে লেখা আছে।

এইভাবে দু-তিন দিন কাটল। দাদামশায়ের ছাত্রদুটি রোজ তাকে দেখতে যান। আয়েশা তাদের কাছে শোনে দাদামশায়ের সুস্থ হতে সময় লাগবে। সে ভাবে তার হাতের খাবার খেলে হয়ত দাদামশায় শরীরে বল ফিরে পাবেন, তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন। কিন্তু হাসপাতাল নাকি রাজি হবে না।

সামনে শুক্রবার। আয়েশারা ঠিক করে রেখেছে তারা সবাই ঐ দিনে জুম্মার নামাজ একসঙ্গে পড়বে, দাদামশায়ের বারান্দায়। আল্লাহের কাছে দুয়া চাইবে তাদের দাদামশায় যেন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন তাড়াতাড়ি। সুশীলা বলল তার মায়ের উপদেশমত সে'ও সকালে শিব পুজোর সময় দাদামশায়ের জন্য শিব ঠাকুরের কৃপা চেয়েছে।
শুক্রবার কাজে আসার সময় আয়েশা দূর থেকে লক্ষ্য করল দাদামশায়ের বাড়ির বাইরে কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। খারাপ কিছু ঘটে গেছে মনে করে তার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কাছে এসে জানতে পারল দাদামশায়ের অবস্থা খারাপ বলে খবর এসেছে। তাঁর ছাত্র দু'জন হাসপাতালে গেছেন, ফিরে এলে সব জানা যাবে। কৌতূহলী প্রতিবেশীরা এক এক করে আসছেন, খবর নিচ্ছেন। আয়েশা লক্ষ্য করল দাদামশায়ের কুকুরগুলোও এসে হাজির হয়েছে, নিঃশব্দে পায়চারি করছে বাড়ির বাইরের রাস্তায়। কুকুরেরা ত বুদ্ধিমান প্রাণী, দাদামশায়ের অনুপস্থিতির দুঃসংবাদ হয়ত তাদেরও পীড়া দিচ্ছে। বয়স্ক লেংচু শুধু আসে নি, বোধহয় পেরে উঠে নি।

তারপর খবর এল সব শেষ। দাদামশায় চলে গেছেন, সজ্ঞানেই। ভোরের দিকে কল্যাণী নামের এক নার্সকে ডেকে দাদামশায় বলেন টেলিফোন করে তাঁর ছাত্রদের ডেকে পাঠাতে। খবর পেয়েই ছাত্রেরা হাসপাতালে হাজির হ'ন। কিন্তু তাঁকে দেখতে পান না। বিশেষ চিকিৎসার জন্য তাঁকে অন্য ওয়ার্ডে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে কাউকে যেতে দেওয়া হয় না। সে সময়টি বিকেলের দিকে। আয়েশা বুঝল দাদামশায়ের বাড়ির কাজ আজ আর করতে হবে না। চোখের জল মুছতে মুছতে সে অন্য বাড়ির কাজে গেল।

দিনের শেষে বাড়ি ফেরার পথে সে ১৭ নম্বরে গেল খবর নিতে। দাদামশায়ের বসার ঘরে অনেক মানুষ জমা হয়েছে, কিন্তু সে ছাত্র দু'জন নেই। সবাই অপেক্ষা করছে দাদামশায়কে আনা হবে বলে, কিন্তু কেউই জানে না কখন। একজন খবরের কাগজের লোক দাদামশায়ের সম্বন্ধে জানতে চেয়ে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। আয়েশা যে দাদামশায়ের কাজের মেয়ে তা শুনে সে তার কাছেও জানতে চাইল। আয়েশা শুধু বলল দাদামশায়ের মত দয়ালু ভালমানুষ যে দুনিয়ায় আছে তা সে আগে জানত না। আর বলল তার মতলবচাচা বলেছে গরীবের বন্ধু বলে দাদামশায়ের জন্য আল্লাহ স্বর্গে জায়গা করে রেখেছেন।

পরের দিন সকালে কাজে এসে যা শুনল তাতে আয়েশা অবাক। দাদামশায়কে নাকি পাওয়া যায় নি। তাঁর বন্ধুরা বারবার বলছেন 'বডি পাওয়া যায় নি'। সে আন্দাজ করে নিল 'বডি' হ'ল মৃতদেহ। সে সাহস করে একজনকে জিগ্যেস করল দাদামশায় কোথায়। সে যেন একটু বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল 'স্বর্গে, আবার কোথায়?' বলে হেসে উঠে তার কাছ থেকে সরে গেল।

আয়েশা বুঝল মতলববচাচা ঠিকই বলেছিল। আল্লাহ ত সব সময় সব কিছু দেখতে পান এবং জানতে পারেন। নিশ্চয়ই হাসপাতালে তাঁর সাজানো রথ পাঠিয়ে দাদামশায়কে নিয়ে গেছেন তাঁর কাছে, স্বর্গে, যেমন লেখা আছে সুশীলার দিদিমার বইতে। হঠাৎ তার মনে পড়ল আগের দিন অন্য কুকুরগুলো এসেছিল কিন্তু লেংচু আসে নি। সে ছিল দাদামশায়ের প্রিয়, তাই সেও নিশ্চয়ই গেছে দাদামশায়ের সঙ্গে। দিনের বেলা, তাও আয়েশার কেমন গা ছম ছম করতে লাগল। দাদামশায় ত সশরীরেই স্বর্গে গেছেন, তাদের সঙ্গে যদি দেখা করতে আসেন।

মৃত্যুর পর তাঁর দেহটি চিকিৎসাশাস্ত্রের গবেষকদের কাজে লাগতে পারে এই বিশ্বাস থেকে দাদামশায় সেটি দান করার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। এটি ছিল সমাজের প্রতি তাঁর সর্বশেষ দায়িত্ব-পালন।

আয়েশা, সাদিয়াদের এই ব্যাপারটি কেউ জানাল না। মতলবচাচা তাদের আবারও বললেন তাদের দাদামশায়কে আল্লাহ তাঁর পাশেই স্থান দিয়েছেন। তিনি এখন স্বর্গে। কিন্তু তিনি স্নেহভরে তাদের সকলের ওপর সারাক্ষণ নজর রাখছেন।

শুনে আয়েশা, সাদিয়ারা কেমন নিশ্চিন্ত বোধ করল যেমন তারা করত গরমের দুপুরগুলোতে দাদামশায়ের বারান্দায় বসে, তাঁর সঙ্গে কথা ব'লে। আর দাদামশায়ও আগের মতই তাদের সঙ্গে রয়েছেন, অলক্ষ্যে।

।। ভরা থাক স্মৃতি সুধায়।।

রাজা মুখার্জ্জী

আশ্বিন মাস পরলেই আমাদের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় পরন্ত বেলায় একফালি রোদ এসে পরে। ছোটবেলায় ওই রোদটা দেখলেই মনে হত পুজো এসে গেছে। তখন এত ঘন ঘন নিম্নচাপ হত না। এখন যেমন পুজো যত এগিয়ে আসে তত যেন নিম্নচাপও বাড়তে থাকে। তবে মহালয়ার দিন সকালে বৃষ্টি হত। আমার ঠাকুমা বলত, মহাদেব না কি মা দুর্গাকে ভয় দেখাচ্ছে, ক'দিন পর বাপের বাড়ি যাবে সেইজন্য। মনে মনে রাগ হত খুব মহাদেবের ওপর। বছরে ওই চারটে দিন মা আসে, তা-ও এত অশান্তি কিসের! কই, আমার বাবা তো মা'কে ভয় দেখায় না, মামার বাড়ি গেলে। অবশ্য আমার মামার বাড়ি ছিল আমাদের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। গরমের ছুটিতে শুনতাম, বন্ধুরা সব মামার বাড়ি, পিসির বাড়ি ঘুরতে যায়। আমার সে সবের বালাই ছিল না কোন দিন। মনে একটু দুঃখও হত। আমি কখনও মা'কে মামার বাড়ি গিয়ে থাকতে দেখি নি। এমনিতে মহাদেব লোকটা খারাপ না, বেশ ভোলেভালা, সাদাসিদে। পোশাক-আশাকও বেশ সাধারণ, আমার বাবার মতই খালি গায়ে থাকে। শুধু লুঙির বদলে বাঘ ছাল আর গলায় একটা সাপ। ছোটবেলায় ভাবতাম ওটা বোধহয় রবারের। বাবাকে বলেছিলাম, ওরকম একটা সাপ আমার জন্য এনে দিতে। দেব দেব করে আর দেয় নি। একটা ত্রিশূল এনে দিয়েছিল বটে কিন্তু, কিছুদিন পর ভেঙে গেছিল। বেশি দিন টেকে নি। মহাদেবের লোক আছে, অর্ডার দিয়ে ত্রিশূল বানানোর, তাই অত দিন টেকে। আমার মামার বাড়িতে দুগগা পুজো হত, এখনও হয়। তখন পুজো মানে মামার বাড়িতে হইহই ব্যাপার। আমার ৪ মাসি আর তাদের ছেলে-মেয়েরা, মামাদের পরিবার সব মিলিয়ে দুটো ফুটবল টিম অনায়াসে নামিয়ে দেওয়া যেত, রিজার্ভ বেঞ্চ সমেত। ঝুলন পূর্ণিমার দিন কাঠামো পুজো থেকেই পুজোর গন্ধটা পেতে শুরু করতাম। স্কুলে পরীক্ষার জন্য সেসব নিয়ে বেশী মাতামাতি করতে পারতাম না। বিশ্বকর্মা পুজো এলে, আমাদের আর আটকানো যেত না। তার আগের দিন আমাদের পরীক্ষা শেষ হত, আর যদি বা কোন কোন বছর একটু বাকি থাকত, তো সেটা ওই এলেবেলে বিষয় গুলো- হাতের কাজ, কি সাধারণ জ্ঞান এইসব। ওগুলোতে পড়তে লাগত না। জ্ঞান আমার বরাবরই অসাধারণ ছিল, মাষ্টারমশাইরাও চমকে যেত। আর হাতের কাজ, সে সবচেয়ে ভাল জানত আমার মা।

আমাদের বাড়িটা কুমোরটুলির খুব কাছেই। চৈত্র মাস পেরোলেই ওরা দুর্গা ঠাকুর তৈরি শুরু করে দিত। তার আগে কালী ঠাকুর হত, তারপর সেগুলো সব গোডাউনে পাঠিয়ে দিয়ে দুর্গা ধরত। বিচুলি বাঁধা, একমেটে তারপর দোমেটে করে, ছাঁচে ফেলা মুখ বসানো হয়। অসুর বা সিংহের মুখ হাতেই হয়। ওরা নিচের দিকে থাকে, সবাই তো ওপরের দিকে মায়ের মুখ পানেই চেয়ে থাকে। আমি ছোটবেলায় সময় পেলে এসব দেখতে যেতাম, অনেক কারিগরের সাথে বেশ চেনা হয়ে গেছিল। কেউ কেউ আমার হাতে একটু মাটি দিয়ে সিংহের বা অসুরের গায়ে লাগাতে দিত। ওই মাটিটার বেশ একটা সোঁদা গন্ধ আছে, পেলেই মনে হয় পুজো এসে গেছে। মাঝে মাঝেই সারা গায়ে কাদা মাটি মেখে বাড়ি এসে মা'র বকুনি খেতাম। ওসব গায় মাখতে নেই, সেটা তখনই বুঝে গেছিলাম। এখন ওর চেয়ে অনেক বেশী কাদা মাখলেও আর কেউ বকে না। মা'ও কিছু বলে না। কেন যে বলে না!! এখন মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে করে বকুনি খেতে, কিন্তু কেউ বকে না। বিশ্বকর্মার আগে থেকেই দুর্গা ঠাকুরের গায়ে সাদা রঙ করা শুরু হয়ে যেত। তারপর বিশ্বকর্মা বেড়িয়ে গেলে পুরোদমে দুর্গার কাজ। কুমোরটুলিটা এখনও অনেকটা আগের মতই আছে। সময় যেন থমকে আছে ওখানে। এখনও অনেক বিদেশী লোকেরা এসব দেখতে আসে। অবাক চোখে দেখে, ছবি তোলে, নিজেদের মধ্যে কিসব কথা বলে। সাথে গাইড থাকে, তারা ঘুরিয়ে দেখায়, সব বুঝিয়ে দেয়। ছোটবেলাতেও দেখতাম এদের। একবার একজন আমায় নাম জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু ওদের কথা তখন বুঝতে পারি নি, তারপর সঙ্গের গাইড বলে দিতে তখন বলেছিলাম। আমাদের বাড়িতে একটা কাজের লোক ছিল। মাঝবয়সী মহিলা - নাম দুগগা। আমি মা দুর্গা বলে ডাকতাম। আর তার বরের নামও ছিল মহাদেব। আমি একবার মহাদেবকে দেখব বলে খুব বায়না ধরায়, আমাকে ওদের বাড়ি নিয়ে গেছিল। দেখেছিলাম, শিবপুরীতে অন্ধকার বেশ গাঢ়। খুব হতাশই হয়েছিলাম মহাদেবকে দেখে। হাতে ত্রিশূল, গলায় সাপ কিছুই নেই, বসে বসে বিড়ি খায় আর কাশে। তারপর একদিন শুনলাম মহাদেব শিবলোকে চলে গেছে। মা দুগগা আমাদের বাড়ি অনেকদিন কাজ করেছিল। তারপর কবে যে ছেড়ে দিল, মনে নেই।

মহালয়ার আগের দিন রাত থেকেই ঠাকুর যাওয়া শুরু হয়ে যেত। আর আমার শুরু হয়ে যেত ঠাকুর গোনা। আমাদের বাড়ির সামনে সব লড়ি দাঁড়িয়ে থাকত। কুমোরটুলি থেকে কাঁধে করে ঠাকুর নিয়ে এসে লড়িতে তোলা হত। লক্ষ্মী, সরস্বতী, এদের ওরা বলে সাইড পুতুল। ভাবি ভগবানও কেমন পুতুল হয়ে যায়, মানুষ তো কোন ছাড়। ভোরবেলা মা ডেকে দিত, ঘুম চোখে রেডিওতে মহালয়া শুনতে। 'জাগো তুমি জাগো' গানটাই প্রথম শুনতাম। ভাবতাম ওই গান দিয়েই বুঝি অনুষ্ঠান শুরু হয়। 'আশ্বিনের শারদপ্রাতে' অনেক পরে শুনেছি। এখনও মহালয়া শুনলেই মনটা কেমন পালটে যায়- আমার চোখে তো সকলই নবীন সকলই বিমল, সকলই শোভন। মহালয়া শুনেই ছুটে চলে যেতাম আমাদের পাশের মাঠে। ওখানে পুজো হয়। এখন অনেক বড় পুজো, একডাকে সারা কলকাতা চেনে। তখন সেরকম ছিল না। খুবই সাধারণ ছিল। মহালয়ার সকালবেলা গিয়ে দেখতাম প্যান্ডেল অনেকটা হয়ে গেছে। ভেতরে কাপড়ের কুঁচি দিয়ে সিলিং পুরো তৈরি হয়ে যেত। তারপর তার ঠিক মাঝখানে একটা পেল্লায় সাইজের ঝাড়বাতি লাগানো হত। সেই ঝাড়বাতি লাগানোটা দেখতে আমাদের মত কচিকাচারা ভিড় করত। সবার চোখেই অবাক বিস্ময়। দড়ি দিয়ে লিভার করে ওপরে তুলে সব কি সুন্দর করে লাগিয়ে দিত কাকুরা। তারপর যখন সব আলোগুলো একসাথে জ্বলত, কি সুন্দর যে দেখতে লাগত। এখন আর সেসব ঝাড়বাতি লাগানো হয় না প্যান্ডেলে। ওসব আজকের থিমের সাথে চলে না। এখন আলো কম, আলেয়া বেশী। মাঠে গিয়ে দেখতাম পুজোর গন্ধে ম ম করছে। সকাল থেকেই সব লোক ধুতি পরে হাতে গামছা নিয়ে তর্পণ করতে যেত। সেদিন গঙ্গায় খুব ভিড় হত। এখনও হয়। পুলিশ আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা দিয়ে গাড়ি ঢুকতে দেয় না। শুধু ঠাকুর নিয়ে যাওয়ার গাড়ি গুলো ছাড়ত। এখন দেখি, কম বয়সী ছেলে-মেয়েরা ওই সাতসকালেই সেজেগুজে হাতে ক্যামেরা নিয়ে কুমোরটুলি আর গঙ্গার ধারে ভিড় জমায়। ছবি তোলে, সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে।

বাবা তর্পণ করতে যেত, আর আমি বাবার সাথে যেতাম জামাকাপড় নিয়ে, তর্পণ সেরে পরবে। গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে সবাই সেদিন পিতৃপুরুষকে জল দেয়। একটা পুরোহিত প্রায় পঞ্চাশ জনকে একসাথে তর্পণ করায়। সব পুরোহিতেরই কিছু বাঁধা ঘর থাকে। সেইমত সবাই চোদ্দ পুরুষের নাম কাগজে লিখে নিয়ে যেত। একবার তো খুব ঝড় বৃষ্টিতে অনেকের চোদ্দপুরুষ উড়ে গেছিল। পুরোহিত বলেছিল, ডেজিগনেশন ধরে জল দিলেও চলবে। আর উপায়ই বা কী! এখন আমি যাই তর্পণ করতে। আমার এমনিই ভুলো মন, বাবার নামই ভুলে যাই মাঝে মাঝে। চোদ্দ গুষ্টির নাম মনেই পরে না। তবে না জানলেও ক্ষতি নেই, তর্পণ শেষে একটা মন্ত্র বলে জল দেওয়া হয় - “আব্রহ্ম স্তম্ব পর্যন্তং জগত্ তৃপ্যতু” এতে সবাই জল পায়। কি সুন্দর ব্যাবস্থা এক মন্ত্রে সবাই তুষ্ট। তস্মিণ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম। ভাবটাও বেশ সুন্দর - আত্মীয়, অনাত্মীয়, পরিচিত -অপরিচিত, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের জন্য আমার এই নিবেদন। তারা পায় কি না জানি না, তবে এটা বলার সময় আমার মনটা অনেকটা প্রসারিত হয়ে যায়। হৃদয় মাঝে বিশ্বচেতনার স্পন্দন অনুভব হয়। আমার বাবাও কি এভাবে ভাবত! কি জানি, তখন এত মন্ত্রের অর্থ বুঝতাম না। এখন অনেক মেয়েরাও তর্পণ করে। তাতে কোন বাধা নেই। কোনদিন ছিলও না। তবে আগে করতে দেখি নি। তর্পণ সেরে কুমোরটুলির ভেতর দিয়ে ফিরতাম। আগের দিন রাত্রে শিল্পীরা চোখ আঁকত। আমার চোখের সামনে খড় মাটি দিয়ে তৈরি মূর্তি সেদিন সত্যিকারের দেবী হয়ে উঠত। কি সুন্দর সে রূপ, বড় বড় চোখ, যেন দশ হাত দিয়ে আমায় আগলে রেখেছে। কুমোরটুলিতে ঠাকুর দেখে আমার কখনও মনে হত না, আজও হয় না যে, মা দুর্গা কোমরে আঁচল গুঁজে এত্ত অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করছে। যুদ্ধ করলে কি আর মুখে অত প্রশান্তি ঝরে! অবশ্য মায়েরা বোধহয় এমনই হয়। শত কষ্টের সাথে নিত্যদিন লড়াই করেও সন্তানের জন্য ভুবন জোড়া আঁচল পাতা। বড় হয়ে দেখেছি, শিল্পীরা যখন চোখ আঁকে তার আগে চান করে শান্ত মনে হাতে অনেকটা সময় নিয়ে শুরু করে। প্রথমে কপালে তৃতীয় চোখটা আঁকে, তারপর অন্য দুটো। আমাদের মাঠে যিনি ঠাকুর তৈরি করেন, একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন এমন করে। বলেছিল ওঁরা মনে করেন, তৃতীয় নয়ন দেবীর চেতনার প্রতীক। তাই আগে ওই চোখ আঁকলে মা চৈতন্যময়ী রূপে বাকি কাজ ঠিকঠাকভাবে করিয়ে নেন। কি সুন্দর ব্যাখ্যা। সত্যিই এই শরণাগতিই তো আমাদের সবার কাঙ্খিত, আর কী-ই বা চাইতে পারি! শেষে শিব গড়তে বাঁদর গড়ব! মহালয়ার দিন সারাদিন ধরে ঠাকুর যেত। যাদের অনেক দূরের পুজো তারা সব বৃষ্টির ভয় প্লাস্টিকের চাদর মুড়ে ঠাকুর নিয়ে চলে যেত। এখনও যায়। তবে আগের চেয়ে অনেক কম। এখন থিমের পুজোয় বেশীরভাগ ঠাকুরই মন্ডপে তৈরি হয়। আমি মহালয়া থেকে ষষ্ঠী অবধি কত ঠাকুর দেখেছি গুনে লিখে রাখতাম প্রতি বছর। সব পারতাম না। কিছু দেখতাম আর কিছু আন্দাজ করে লিখে নিতাম। আবার কখনও বাবাকে বলতাম আমি যে সময়টা বাড়িতে থাকব না, সেই সময় কটা ঠাকুর যায় লিখে রাখতে। প্রতিবছর স্কুলে সবার চেয়ে বেশী ঠাকুর আমিই দেখতাম। আমার প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে ঠাকুর দেখা কোনদিনই হয়ে ওঠে নি। বাবা স্কুটারে করে ষষ্ঠী বা সপ্তমীর দিন মহম্মদ আলী পার্ক, কলেজ স্কোয়্যার, সিমলা ব্যায়াম সমিতি, আর বাগবাজার এইকটা ঠাকুর দেখিয়ে আনত, ব্যাস। অবশ্য সব ঠাকুর তো আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই যেত, তা-ই সবই আমার দেখা। এই ভেবেই মনে বেশ একটা আনন্দ হত। অনেক পরে একথা আমার বউকে বলেছিলাম। শুনে বলেছিল তুমি ছোটবেলা থেকেই এমন বোকা ছিলে না! আমি কিছু বলি নি শুধু মুচকি হেসেছিলাম।

চতুর্থীর দিন আমাদের মাঠে ঠাকুর আসত। আমি মাঠের ঠাকুর আনতে গেছি অনেক বড় হয়ে মাধ্যমিকের পর। তখনও মনে কত আনন্দ। বিকেলে ঠাকুর আসবে, আমরা কয়েকজন মিলে সকাল থেকে কুমোরটুলিতে আনাগোনা করতাম। এরকমই এক চতুর্থীর দিন আমার বাবা চলে গেল দিকশূণ্যপুরে। শহর জুড়ে সেদিন আলোর রোশনাই, শুধু আমাদের সমস্তটা জুড়ে নিকষ অন্ধকার। ঢাকের আওয়াজ বড্ড কানে লেগেছিল সেবার। আজও চতুর্থী এলে মনটা কেমন করে ওঠে। আজীবন এমনই থাকবে। এভাবেই আমার পিতৃতর্পণ সম্পূর্ণ হবে প্রতি বছর।

পুজোর চারটে দিন এত তাড়াতাড়ি কেটে যায় বুঝতেই পারা যায় না। বছরে তিনশ ষাট দিন যেন ট্রাম চলছে আর এই চার-পাঁচদিন বুলেট ট্রেন। ছোটবেলায় সকালটা মামার বাড়িতেই কাটত। পুজোর সময় নাড়কেল নাড়ু হত পঞ্চমীর দিন। আমার ঠাকুমা, মা, মাসিরা সব বসে নাড়ু করত। নাড়ু করার সময় কথা বলা বাড়ন। সবাই মুখ বুজে নাড়ু পাক করত আমার ঠাকুমার কড়া নজরদারিতে। আর নারকেলের ছোবড়া গুলো দিয়ে পুজোর ক’দিন ধূনো দেওয়া হত। সকাল বেলা ধূনোর গন্ধ পেলে আজও পুজোর গন্ধ পাই, ওই বারান্দার আসা পরন্ত রোদ্দুরের মত। এখন আর ওসব হয় না। নারকোল নাড়ু কিনেই আনা হয়। কারোর অত সময় নেই। অত ধকলও আর কেউ নিতে চায় না। অথচ তখন এসবেই কত আনন্দ ছিল। আমরা ভাগ্যবান একটু হলেও সেই সময়টাকে স্পর্শ করতে পেরেছি। আজকের ছেলে-মেয়েরা জানতেও পারবে না কোনদিন।

সপ্তমীর সকালে মামার বাড়ি কলা বৌ চান করাতে যেতাম। কলা বৌ, গনেশের বৌ বলেই জানতাম তখন। কিন্তু তাকে গনেশ ছাড়া অন্য সবাই দল বেঁধে ঢাক ঢোল পিটিয়ে কেন চান করাতে নিয়ে যায় বুঝতাম না। সপ্তমীর সকালটা আজও আমার বড় সুন্দর লাগে, অন্য দুদিনের চেয়ে। অষ্টমী নবমীতে খালি মনে হয় - ধূপের ধোঁয়া দ্বীপের আলো, পিছন হতে পাই নে সুযোগ চরণ ছোঁয়ার। আমাদের মাঠে সপ্তমীর সকাল থেকে রবীন্দ্রনাথের গান বাজত সারাদিন, আজও তাই। আগে সোমনাথদা বলে একজন ছিলেন আমাদের মাইকের দায়িত্বে। সপ্তমীর সকালে একটা ক্যাসেট লাগিয়ে দিতেন যার প্রথম গানটা ছিল- এসো এসো আমার ঘরে এসো। প্রতিবছরই শুরুতে এই গানটা দিয়েই শুরু হত। অনেক পরে আমি এই রহস্যটা উদ্ধার করি। আসলে উনি নিজে ওনার যন্ত্রপাতির সাথে দুটো ক্যাসেট নিয়ে আসতেন। একটা সানাই আর একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত। আর বাকি আমরা দিতাম, আর উনি বাজাতেন। সপ্তমীর সকালে ওই ক্যাসেটটাই উনি চালিয়ে দিতেন। সপ্তমীর সন্ধ্যে থেকেই পুজোর রংটা কেমন বদলে যেত। সকালের সেই সারল্যটা আজও কেমন পালটে যায় সন্ধ্যে হলেই। অষ্টমী, নবমীতে সকাল থেকেই অদ্ভুত এক গাম্ভীর্যে ভরে যেত চারপাশ। কোথাও যেন সামান্য কোন বিচ্যুতিও না হয়।

মামার বাড়িতে দেখতাম সবাই সদা সতর্ক। আর একগাদা অনুষ্ঠানের আড়ম্বর। আমার সেই কুমোরটুলিতে দেখা মা, যেন কেমন পালটে যেত। দূর থেকে দেখতাম, কাছে যেতে ভয় হত। অষ্টমী নবমীর সন্ধিক্ষণে এই গম্ভীরভাব যেন একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়। আর নবমীর সকালে হোম হয়ে গেলে আবার সেই আগের মত মাকে ফিরে পেতাম। সারাদিনে কাজ সেরে সন্ধ্যে হলে মা যেমন আমায় নিয়ে পড়াতে বসত, সেরকম মা দুর্গাও যেন এই দুদিন সবায়ের সব অভাব অভিযোগ, আদর আবদার মিটিয়ে আমার কাছে আসার একটু ফুরসত পেল।

পুজোর শেষদিনটা ছোটবেলায় বড় বেদনা বিধুর ছিল। আজ আর সেই অনুভব হয় না। বরং একটু স্বস্তিই হয়। মামার বাড়ির ঠাকুর বিসর্জন হয় সন্ধ্যের আগেই। ছোটবেলায় সব মামারা যখন ছিল, সিদ্ধি তৈরি হত দুপুরবেলা। বিসর্জন সেরে এসে সবাই একটু মুখে দিত আর বেলপাতায় আলতা দিয়ে দুর্গা নাম লিখত। আমার বড় মামা আর ছোট মামা অবশ্য একটু নয়, বেশ খানিকটা খেয়ে নিত আর তারপর বেলপাতার বদলে ঠাকুর ঘরের মেঝেতে দুর্গা নাম লিখত। আমিও খেয়েছিলাম বার দুয়েক। তখন একটু বড় হয়ে গেছি। সিদ্ধি খেয়ে ধুতি পাঞ্জাবি পরে পাড়ার ঠাকুরের সাথে বিসর্জনে যাব বলে তৈরি হয়ে মাঠে গড়াগড়ি খেয়েছিলাম। সেবারই শেষ, আর খাই নি। সিদ্ধির নেশা পরের দিনেও থাকে। আর জিভটা মনে হয়ে উলটে গেছে, সামনের দিকটা আটকে পেছন দিকটা খুলে গেছে। আমাদের পাড়ায় একবার সিদ্ধি খাওয়া হয়েছিল, সেবার আমাদের ঠাকুর গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে সবাই প্রায় শুয়ে পড়েছিল। আমাদের পাশের পাড়ার লোকেরা আমাদের ঠাকুর বিসর্জন দিয়েছিল। কেউ নিজের বাড়ি খুঁজে পাচ্ছিল না ঠিকমত, বিচ্ছিরি কান্ড। সেই শেষ আর হয় নি। এখন আর ওসবের চল নেই।

পাড়ার বিসর্জন শেষ হতে অনেক রাত হয়ে যায় এখন। ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে টেনে বাড়ি নিয়ে যেতে হয়। আমি একটু পিছিয়ে পড়ি, এই কদিনে এলোমেলো হয়ে যাওয়া মনটাকে একটু গুছিয়ে নিতে। ঢাকির আওয়াজ আস্তে আস্তে সরে যেতে যেতে মিলিয়ে যায়। একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি হাঁটতে থাকি......... শরীর জুড়ে অবসাদ আর মন ভরে থাকে এক অদ্ভুত শূন্যতায়। দূর থেকে একটা চেনা সুর ভেসে আসে, না মাইকে নয়, কেউ বেশ দরদী গলায় গাইছে.....

"শ্রবণে মোর নব নব শুনিয়েছিলে যে সুর তব
বীণা থেকে বিদায় নিল, চিত্তে আমার বাজে ॥

If the Purpose of Your Becoming a Monk Is Pumpkin-cutting....

Swami Medhasananda
Nippon Vedanta Kyokai
(Vedanta Society of Japan)

This is a story about a monk of the Ramakrishna Order (Ramakrishna Math and Mission), who passed away long ago.

The monk in his pre-monastic life was a brilliant student, and stood first class first in the M.Sc. (Master of Science) Examination. His father was an ICS (Indian Civil Service) officer, who later became a Deputy Magistrate. The father wanted his son also to become an ICS officer, which was a prestigious and lucrative post. However, his son thought otherwise, and wanted to leave hearth and home to realise God and serve the suffering humanity. Finally, he joined the Ramakrishna Order, in order to fulfill his wish. This act of his son made his father frustrated and angry. So he filed a suit against the authorities of the Ramakrishna Mission in order to get his son back. The son was summoned by the court, where on interrogation by the judge he declared that he was now an adult and that he joined the Order on his own, and none compelled him to do so. As a result, the Judge set him free. Having lost the case, the father felt utterly insulted and grew so enraged, that he now thought of using force to get his son back home, since he could not do it in a legal way.

So he decided to go to the Belur Math where his son lived. Accordingly, he went there but also took his revolver in his pocket, his intention being to first ask his son to return home, and if he declined, to threaten to shoot him. On reaching the Math he came to know that he could find his son in the monastery's kitchen. Upon going there, what he saw left him speechless, and he was at a loss as to how to react. He saw that instead of preparing for the ICS Examination his foolish son was cutting pumpkins along with other monastics and thereby destroying his bright career! However, the father controlled himself and finally said to his son mockingly, "My son! If cutting pumpkins has become the purpose of your becoming a monk, come home and I shall provide you with cartloads of pumpkins. You can cut them as much as you would like."

On seeing his father there unexpectedly, the son took a few moments to decide what to do. He then stood, and bowing before his father respectfully answered with humility, "Father, I am not just cutting pumpkins. This is but a form of my worship of Sri Ramakrishna."

This episode illustrates the ideal of work, that is, any work should be looked upon as a form of worship of God. Now, what is this concept of 'Work is worship'?

First of all, all works should be performed in accordance with the spirit of Karma Yoga, which becomes easier to practice if one has faith in God. As Swami Vivekananda famously remarked, "All our duties are His (God's)." Karma Yoga is in effect based on some fundamental norms which are as follows:

- The performance of work is to worship God through work.
- The motive of work should be to please God as He is our eternal companion and refuge.
- To regard ourselves as the instrument of God while we perform work.
- While performing work, we should also remember that we are using our talents, skills, wisdom and power, provided by God.
- To perform work with dedication and love but without expectation of receiving anything in return.
- To perform work as perfectly as possible and be at rest without any anxiety whatsoever, concerning its outcome for which we should have wholehearted dependence on God.
- To accept gracefully the consequences of work and offer them to God, without being obsessed either by success or failure. In case of failure, however, we should strive once more if the situation calls for it.

A mindset like this regarding the execution of work will enable us to curb our egos, as well as attachment to work and its results which constitute the primary causes of our numerous troubles and sufferings, including stress. On the other hand, it will also enable us to sustain our equanimity and power of judgement, even amidst the most trying situations we may confront in our everyday lives.

One may raise the question as to whether belief in counsels like, 'All our duties belong to God,' is natural, or whether execution of the aforesaid norms of Karma Yoga would at all be feasible.

Our reply to this doubt is: “Yes! It is indeed possible.” This is apparent in the services rendered by the monks of the Ramakrishna Order and the nuns of Sri Sarada Math, Dakshineswar, as well as by priests and nuns of various Catholic Religious Orders. Also, the fact that they run their institutions successfully is a well-known fact. Nevertheless, one must admit that those house-holders who sincerely practice Karma Yoga to their benefit, are also not wanting in their efforts.

The crux of Karma Yoga is to offer selfless service and maintain an attitude of being an instrument of God. This attitude of an instrument of God is reflected in the lyrics of a well-known Bengali devotional song, which begins with the words, “Sakali tomāri icchā.” We present below some portions of those lyrics, in English translation:

“Oh (Divine) Mother, all is done after thine own sweet will.
Thou art in truth self-willed, redeemer of mankind.
Thou workest thine own work, men only call it theirs…
Thou art the operator, and I am a mere machine.
The house am I, and Thou the Spirit dwelling there.
I am the chariot, and thou the charioteer
I move along as Thou, O Mother, movest me.”

There is also a beautiful prayer, that echoes similar ideas, in the ‘Imitation of Christ’ by Thomas à Kempis who was a Christian mystic of the fifteenth century. One translated version of the prayer is as follows:

“Lord! I am bearing Thy Cross.
Thou hast laid it upon me.
And grant me strength
That I can bear it unto death.”

Finally, we may encounter efficient and sincere workers (Naiṣthika-karmī) in our everyday lives, but ideal workers (Karma-yogī) are few and far between. The primary variance between them lies in the fact that while the former are unable to rid themselves of desires, attachments, egotism, anger and other adverse emotions, and thus become victims of persistent stress and turmoil, the latter have been freed from them, and consequently enjoy peace, happiness and fulfilment.

They alone live, who live for others

Swami Divyanathananda
Nippon Vedanta Kyokai
(Vedanta Society of Japan)

In a letter written from Chicago to the Maharaja of Mysore, Swami Vivekananda concluded with the following lines:

My noble Prince, this life is short, the vanities of the world are transient, but they alone live who live for others, the rest are more dead than alive.

Swamiji was urging his countrymen to dedicate their lives for the welfare of others. Swamiji's words were not left unheard. As we shall see in our discussion, several noble young men and women have dedicated their lives for serving God in man and have transformed this theory of Swamiji into actual practice.

The first service activity at Sargachi: Swami Akhandananda

During the period 1896-97, after the Mahasamadhi of Sri Ramakrishna, while some of the monastic disciples were undertaking austerities at the Baranagar Math, Swami Akhandanandaji went out for a pilgrimage in West Bengal. He went to Navadwip, the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. While returning from there, he passed through a place called Sargachi. Drought had broken out there, and he saw that men and women had been reduced to mere skeletons for want of food. His heart broke down.

One particular incident moved him deeply. A small girl, sitting on the earth was sobbing and by her side lay broken parts of an earthen pitcher, and water had spilled around that pitcher. Perhaps, she had collected some water for her family and while filling it up, it had broken, so out of deep remorse, she was sobbing, unable to find out a way to get water. Akhandanandaji purchased a pitcher and gave it to her. He also distributed food to some poor people. Next day as he was going to return, he heard a divine voice, urging him to stay there. Consecutively he heard this voice for three days. He wrote to his brother disciples at Belur Math and informed them about his desire to serve the drought-stricken people. Swami Vivekananda was resting at Darjeeling, Akhandanandaji wrote to him too, and he replied that his heart leaped in joy on hearing that Akhandanandaji is serving the helpless people in drought hit areas. Swamiji also sent two young novices with some money. Thus started the first service activities of Ramakrishna Mission.

Akhandanandaji successfully carried out relief operations in the drought-stricken area, and after it was over, he started an orphanage in a village called Mahula with some orphan boys. It went on for some time, and after nearly 14 years, he purchased a huge piece of land and shifted the orphanage to its permanent location. He gave the boys basic education and taught them skills which would also help them make their living. Thus, with the idea that worshipping living beings is the same as worshipping Shiva, he carried out service activities there.

Plague in Kolkata and service of Sister Nivedita

When the plague broke out in 1899 in Calcutta, Swamiji plunged into action. He delegated the entire responsibility of looking after the plague relief work on Sister Nivedita and Swami Sadananda. Plague was a dangerous and highly infectious disease, and it was unthinkable to assign a person to look after the operation of relief work, who has just arrived from a foreign land. But Swamiji didn't hesitate. A committee was formed, with Nivedita as the President and Swami Sadananda was her assistant.

Keeping the locality clean was the foremost task, hence Swami Sadanandaji, with the help of some sweepers started cleaning the streets. An appeal for donations was published in the local newspapers and soon donations started pouring in. Nivedita gave a lecture on 'Plague and the responsibility of Youths' at the Classic Theatre of Kolkata. The effect was immediate. As many as fifteen young people volunteered to take part in the relief work. The plague relief operation was highly successful, and it drew the attention of the intelligentsia and the Government too.

Dr. Radha Govinda Kar observed, 'During this time, Nivedita could be seen in almost every locality of plague-hit areas as the embodiment of compassion. She reached out to the effected people in every way. To financially support a plague patient, she even gave up her daily portion of milk. In those days, her only food was milk and fruits!'

An eye- witness narrated how she served them: 'One afternoon I went to the hut of a family where a small girl was suffering. In that damp, dirty hut, Nivedita nursed her from dusk to dawn, and from dawn to dusk leaving her own occupation. Although she knew that the girl couldn't be cured, yet she didn't stop nursing her. After suffering for a couple of days, the girl passed away. At the end, when the girl was lying in the lap of Nivedita, she mistook Nivedita for her own Mother and yelled, Mother! Mother! This incident had put an indelible mark in Nivedita's heart.'

In fact, Nivedita during the plague relief work exhibited wonderful dexterity of work, and a compassionate heart and she not only became known among the people of Calcutta but also earned their respect and admiration.

The Sevashrama at Kankhal : Dedication of Swamis Kalyanananda and Nischayananda

Many young men, inspired by the life-giving ideas of Swami Vivekananda had joined the monastery at Belur Math to take up the life of renunciation. In this context, the contributions of Swami Kalyanananda and Nischayananda are especially worth mentioning. Swami Kalyanananda, after joining the Belur Math and serving there whole-heartedly for some time, set out for a pilgrimage to North India.

In Rajputana, a famine had stricken, and it disturbed him. There he met another brother disciple-Swami Swarupananda. Both decided to serve the people. By begging for funds, they used to serve cooked food to as many as 300 famine-stricken people. When Swamiji came to know of this, he was very much pleased. Swamiji asked Kalyanandaji whether he could do something for the sick and ailing monks in the Rishikesh-Haridwar belt. Kalyanandaji accepted this idea as a command from the Guru. Swami Swarupanandaji and himself - together went to Nainital to raise funds. Kalyanandaji started his seva work at Kankhal by hiring two rooms for a rent of about Rs. 3 per month.

He procured some Homeopathy medicine. Everyday he would move from hut to hut where the Sadhus lived, enquiring about their well-being. If he found a sadhu who was sick, he would take him to the ashrama and look after him. He would prepare food and feed him. After some time, Swami Nischayanandaji another disciple of Swamiji joined him. Both devoted heart and soul for serving the sick and ailing monks and the outcastes. If any patient died, they carried the dead body on their own shoulders and performed the funeral.

Swami Kalyanananda also decided to serve the pilgrims coming for the Kumbha Mela and this too became a part of the Ashrama's schedule of activities. He also initiated a night school for the outcastes. In those days, the government did not pay much attention to the outcastes. Both- Kalyanananda and Nischayanandaji felt intensely for the neglected sections of the society- the scavengers, sweepers and those who worked in cremation grounds.

Ramakrishna Mission Sevashrama, Varanasi

Charuchandra, a young man living in Varanasi had heard about Swami Vivekananda. He started subscribing to the Udbodhan magazine and would carefully go through the articles published therein. He slowly got acquainted with some young men at Varanasi who had great admiration for Swamiji. Every evening, they would gather at the house of Kedarnath, another young man in that circle, and would read and discuss articles of Udbodhan.

One day, as he was reading the poem 'To a friend' – a composition of Swamiji, blood stirred through his veins and with a great upsurge of emotion flowing through his body, he went to the house of another friend called Jaminiranjan and read it out. It was a practice of Jaminiranjan to take a dip in the Ganga, visit Viswanath Temple and spend his time in spiritual practices. Next day, as he was returning from the Temple, he came across an old lady, almost at the verge of death, lying on the street. The three friends served her with utmost care. That was the beginning of the future Sevashrama.

Charuchandra took the vow of service and along with his friends searched from lane to lane for old and sick people and whenever they found any, they would bring them home, serve them, and provide medicines too. Thus, the seeds of the future Sevashrama were sown. In the year 1900 at a place called Rampura, a house was rented, which housed the Sevashrama. It was first known as the Poor Men's Relief Association. Swamiji however, advised them to serve men, not from the point of view of compassion, but as service to God. Swamiji himself wrote the appeal for the Sevashrama. In 1906, a plot of land in the Luxa area was purchased with the help of wealthy devotees of Bengal. In 1910, the first building came up, which housed wards for the patients.

Swami Muktananda : Bon Bihari Maharaj

Swami Muktananda, or Bon Bihari Maharaj, joined the Ramakrishna Mission Sevashrama at Varanasi as a novice. He literally carried out his service to the patients as a form of worship. Such was his dedication, that he became a legend. Bon Baba, as he was popularly known, worked in the surgical department of the Ramakrishna Mission Sevashrama.

Working day after day with dexterity, he had developed extraordinary ability to predict how long will wounds take to heal, just by looking at them. He was so skilled that the wounds bandaged by him healed faster compared to those bandaged by others. Even at odd hours, sometimes at midnight, if a patient came, and if Bon Baba was informed, without the slightest hesitation, he would attend to him.

When he grew old, he developed rheumatism in his legs, due to working in a standing posture for long hours. An attendant would take him to the surgical ward in a wheelchair, and he would happily attend to the patients. It is seen that those who work in hospitals for many years are no longer emotionally affected by the death of patients. But Swami Muktananda was unlike them. He showed great sympathy for the bereaved relatives of patients who had passed away. His loving and sympathetic heart endeared him to all.

Swami Prabhananda : Ketaki Maharaj

Ketaki Maharaj had joined as a novice at the Dacca Ashrama. After some years the authorities sent him to Cherrapunji to explore the possibilities of starting some welfare activities for the tribal people there. Ketaki Maharaj went there and serving for ten years, he established branch centers of Ramakrishna Mission at Shella, Cherrapunji and Shillong.

Within a few months he learnt the Khasi language. At first, He started a night school, which was expanded to a junior school for students till sixth grade and then to a high school. He wrote textbooks in the Khasi language. Shella is situated at the foothills of Khasi hills, while Cherrapunji is located at 3000 ft. higher altitude. Those days, people had to climb the hills on foot to reach Cherrapunji. Ketaki Maharaj was required sometimes to climb up and down 3/4 times a week.

Ketaki Maharaj blended well with the tribal people. He lived with them, shared their joys and sorrows, educated them to be self-sufficient and injected in them the life-giving words of Vedanta, and message of Sri Ramakrishna and Vivekananda. However, his body couldn't bear with the hard life of working in the hills. He became almost bedridden, and a local devotee took the responsibility to serve him. Later, accepting the demands of the village people of Sylhet, his native place, he spent his last days there. However, even in so much of physical suffering, he greeted all with a smiling face.

The above incidents show us how the ideas of Swami Vivekananda were not just ideas, and how they transformed ordinary people into Saints. These examples serve as inspirations for us to imbibe the life-giving ideas of Swami Vivekananda into our own lives.

Reflecting on our past and looking ahead

Sudeb Chattopadhyay

As the introduction in our website (www.batj.org) states, our activities started in a small scale with a few Bengali families from West Bengal, who wanted to celebrate the rich heritage here in Tokyo with our Japanese friends very eager to experience such events. Ever since we started our cultural heritage celebration and cultural exchange activities in Japan as a non-incorporated association in 1981, we have grown considerably as an association, with participation of members increasing every year, sometimes making it difficult to get appropriate facilities to hold such events. These factors have caused a significant increase in required activities and complex financial transactions. Accordingly, to solve these issues smoothly, with an organization designed to efficiently manage the relevant activities, it was decided to register the association as an Ippanshadan houjin (incorporated association). We also thought that this will improve the credibility of the association, and facilitate smooth operation with our bank.

Looking back, to be honest, I do not remember in detail all the events we have held so far. So, I shall briefly touch on the memories of the events when we started them. Back then we did not have a formal name, and introduced us as the Bengali community in Tokyo to our Japanese friends. To make sure that there is no confusion about our Indian origin, we selected the Japanese name as "Indojinno Tsudoi" when I opened the bank account in that name in 1989. We used this association name whenever we needed to rent a facility to hold an event. The name BATJ was introduced when we first published the Sharodiya publication named Anjali during Durga Puja in 1995. BATJ was later adopted as the website domain name when it was registered in 2003.

The three main events that we have been organizing since our inception are Saraswati puja started in 1981, musical night presenting Gurudev Rabindranath Tagore's composition (precursor of Rabindra Jayanti celebration) started with our Japanese friends in 1987, and Durga puja started in 1990. We thus represent the oldest Bengali community from India in Tokyo to hold such events regularly, and we are happily proud about that. I shall briefly touch on the inception of each such event in the following.

Saraswati Puja

Goddess Benzaiten worshipped in Japan is known to have its origin in the worship of Goddess Saraswati in the Hindu tradition. So, when the few senior women in the community first discussed the proposal of Saraswati Puja with their Japanese friends, they were very eager to participate. For the female organizers in the Bengali community, it was also an opportunity to introduce their school going children to the heritage, albeit in a setting with many constraints. All they needed was someone to perform the duties of a priest, and that is how I came into the picture as an organizer. I took up the responsibility of doing all the rituals in a foreign land, with strong backing of my father providing the details of the procedure to be followed in performing the Puja. Unlike in West Bengal, we cannot perform immersion of deities in rivers or ponds here, so to keep things simple, the decision was to start with a framed picture of the Goddess, that can be safely kept in my house for reuse. The main female organizers were Late Ms. Karabi Mukherjee, Late Mrs. Manjulika Hanari, and Mrs. Seuli Dasgupta (Mr. Ranjan Gupta's elder sister who now lives in the US). The main puja equipment and accessories, including the mango leaves were all arranged by Mrs. Hanari. I performed the puja in a place in Bunkyo-ku on February 8, 1981, in which about 50 persons (Indians and Japanese) attended. After the puja and offering of puspanjali the attendees ate prosad (fruits and sweets) which was followed by serving vegetarian lunch prepared by the female organizers with help from their Japanese friends. After that we had a cultural program, which included songs, and instrumental performances. Professor Masatoshi Konishi of Hosei University, a close friend of Late Mr. Kalyan Dasgupta (husband of Mrs. Seuli Dasgupta), was very impressed by the devotion and enthusiasm of the female organizers and the details of the ritual and asked me write an article in Japanese on the occasion.
This was published in the magazine Daihourin (大法輪) in 1981[1)]. By the grace of God and dedicated participation of our members and well-wishers, we have been able to carry on the tradition so far, and this year marked the 45th year of such celebration by us.

Musical Night presenting Gurudev Rabindranath Tagore's Dance Drama

Rabindranath Tagore, the first Asian recipient of Nobel prize in literature is quite well-known in Japan, especially among people who have active interest in Indian culture and history. When we started our activities as a close-knit small group in 1981, families of Mr. Syamal Kar and Mr. Ranjan Gupta had not arrived in Japan yet. They came in 1986 and 1983, respectively and gradually got involved in the activities. Gurudev Tagore's "Abhisaar" dance drama presentation, the first such event organized by us in 1987, in which they were also involved, was more of an attempt to present the dance drama to our Japanese and Indian friends, than a celebration of the great poet's birthday usually held in the month of May. The old photographs suggest the timing was December, 1987, and looking at them after about 37 years, I recognized five senior women (Late Ms. Karabi Mukherjee, Late Mrs. Sukla Sengupta, Mrs. Mitra Pal, Mrs. Ajanta Gupta, and Mrs. Rita Kar) who were central figures as participants, and our activities took shape under the leadership of Mr. Santanu Sengupta (a 1969 Mechanical Engineering graduate from IIT KGP, my alma mater) and his wife Sukla who choregraphed the dance part in the presentation of Abhisaar, in cooperation with the Japanese group. Incidentally, Mr. Sengupta was a graduate of Ballygunge Government High School, and remembered my maternal grandfather Mr. Brajendranath Mukherjee, a teacher of English there, about whom Mr. Satyajit Ray wrote in his memoirs [2)]. He was pleasantly surprised to meet his teacher's grandson in Tokyo, and encouraged me to assist him. Although I do not have any formally presentable musical skill, I used to play electric Hawaiian guitar back then. My wife, Keiko, who can play the piano would accompany me on her piano when I played the guitar at home. On being nudged by Mr. Sengupta, we quietly got involved and participated in the event as accompanying musicians. Two other persons who were quite involved in such activities were Dr. P. S. Das who was the then Counseller (S&T) in the Indian Embassy, and Mr. Nirmal Pal who was a colleague of Mr. Sengupta at IBM. I knew Dr. Das very well from my days in IIT Kharagpur (1971-1976) where he was a professor and taught us. He knew that I was here, and contacted me immediately after being posted here, and gradually got deeply involved in our cultural activities. The full team of participants and accompanying musicians would gather at Mr. Sengupta's residence on weekends for rehearsals and fine-tuned the performance details for the final presentation. Ms. Karabi Mukherjee with help from her Japanese friends prepared the pamphlet (in English and Japanese) for the audience to introduce the story in the dance drama. My wife Keiko with help from Ms. Karabi Mukherjee booked the hall in Meguro-ku. The attached photographs capture the ambience of the day's events.

Singer and Narrator sitting at the back

Mrs. Sengupta in the role of Basabdatta and in the backstage, I am playing the guitar and on my left Keiko is playing the keyboard.

Mr. Sengupta introducing the participants

Professor Azuma (far right)

I (on far right) am getting introduced here by Mr. Sengupta.

All the participants (on the right are the Indian women, and on the left are the Japanese participants)

Standing from the right are: Mr. Nirmal Pal, Mrs. Ajanta Gupta, Mr. Ranjan Gupta, Dr. P. S. Das, and myself

In the later years, we could not continue such activity every year, and started taking part in the Rabindra Jayanti program organized by Ms. Tomoko Kambe. She was a direct disciple of Mr. Santidev Ghose in Santiniketan, and is a pioneer in introducing Rabindra sangeet and associated dance performance in Japan through her Japanese students. She was also a close friend of Late Ms. Karabi Mukherjee, and always sought her help, whenever she wanted to understand the deeper meaning within the verses in the writings of Rabindranath Tagore. Ms. Mukherjee helped her to compile the Japanese translation of "Shisu Bholanath." These days, she is unable to organize such events, but enthusiastically takes part in the events we organize.

Durga Puja

I started the Durga puja here in the role of priest in 1990. As usual Keiko with help from Karabidi booked the Minemachi hall in Ota-ku, that had by then become a regular place for celebrating our Saraswati puja. These were the days much before the time we experienced a surge in Bengali population of Indian origin due to the need for IT engineers who came here to take care of Y2K problem for their Japanese clients. Our first Durga Puja came to fruition only due to the intense enthusiasm of the same senior women who were highly influential in my decision to become the permanent priest in starting Saraswati Puja in 1981. As the Durga puja event needed a much more complex planning and execution, this was orchestrated by another able manager at that time, Mr. Santanu Sengupta, whom I introduced in the description of our first attempt at organizing Rabindranath's dance drama here. In 1998, on the 9th year of our celebration, I first wrote (in Japanese) about Durga Puja here [3]. I have also written in detail (in Bengali) about our celebration of Durga Puja in Anjali 2014 [4], commemorating the 25th year of such celebration. An English version based on the same article was published in Anjali 2022 [5], when 26 years of Anjali publication was celebrated. Also, my wife Keiko, wrote an article in Japanese in Anjali 2014, summarizing her experiences of Durga Puja here for 25 years. So, I shall not go into much detail here, and only share some photographs that have not been published before, to rekindle memories of our past members involved in the celebration in 1990.

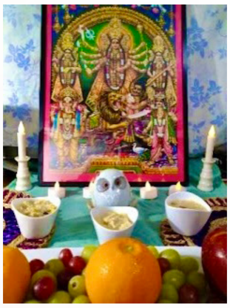

I still have the framed picture of Goddess Durga that we used then. I now use it at home to offer my prayers on actual puja day, Saptami or Ashtami, as depicted in the attached photograph (on right), avoiding our actual BATJ celebration day for that year.

Looking ahead

During 1981-2020, I performed the puja (Saraswati Puja from 1981, and Durga Puja from 1990) as the priest (with breaks in three years of 2012, 2014, and 2018 because of bereavement in my family in Kolkata). In addition to the activities of priest, from around 1986 onwards, another duty I took up was to prepare the bhog (vegetarian khichuri, payesh, and sandesh) offering to the deity. I had a separate gas stove and a set of cooking utensils at home to be used only for this purpose. On the day of the puja, I would take a shower after getting up around 5 in the morning and prepare the khichuri, payesh, and sandesh as the bhog offering. I would be fasting (not even drink water) that day until I finished performing the puja, as was the custom followed in my Kolkata home. The activity of the priest is now diligently performed by Mr. Anirvan Mukherjee, a representative of the younger generation, to whom I have officially passed the priest baton in 2021. Actually, he also helped me on the three occasions of bereavement in my family, when I could not perform the puja. The preparation of the bhog (khichuri and payesh) is now carried out by his wife, Mrs. Sraboni Mukherjee. I am grateful that they accepted my request and diligently carrying out these vital puja activities since 2021.

As a non-incorporated association, when I opened our MUFJ bank account in 1989, the bank account included the association name "Indojinnotsudoi" and my name as one official of the association. It was not a personal account; it was a bank account of the non-incorporated association, of which I was one official. The account was operated by Late Ms. Karabi Mukherjee (Karabidi), until about two years before she left Japan to relocate in Kolkata. After that I operated the account, and as I reached 65 and wanted to retire from all the BATJ associated duties, I handed over the operation to Mr. Partha Kumar, whereby the name of the official handling the account was changed to Partha's name in 2020, retaining the non-incorporated organization name in the account. For the formally registered association we do not need any individual's name and opened a new internet banking account, better suited to modern needs for cashless transactions. This is now operational and will be the official banking account going forward. We will close the old MUFJ account soon and transfer the funds to the new account.

At the time of transferring the operation of the bank account to Partha, I also transferred the activities of maintaining the website, which I had done since 2007, to Mrs. Lia Kumar (Partha's wife). This part took a lot of effort on my part, as I had to prepare a detailed manual for the tasks to be performed by the administrator, so that a person not familiar with website workings and HTML programming can easily perform the necessary tasks. So far, this transfer of website administration activity seems to be going well.

My association with Anjali from the time of its inception in 1995 was as a literary contributor [3)] [6-11)]. I used to write articles in Japanese, for the Japanese section, mainly to introduce our unique culture and customs to our Japanese friends. Later at around 2000, I got involved in some editing (looking after the Japanese section in collaboration with my wife Keiko) and other publishing (mainly around the advertisement section) activities much later. Along with the transfer of operation of the bank account and website administration, I also retired from the activities of publishing Anjali, transferring most of the activities to Mr. Sanjib Chanda and Mr. Ranjan Gupta who has touched on this aspect of my BATJ activities in his article published in Anjali 2022 [12)].

One other activity that I was involved from around 1985 onwards, probably the most difficult, was to book the facilities for each event. To this end, my wife Keiko assisted me throughout, and helped us navigate the intricate Japanese custom and process of paperwork involved. She would always smilingly assure the facility administrators that rules will be strictly followed (which unfortunately was not always the case) and help alleviate their doubts about the behavior of a group of foreigners. For the people in charge of the facilities this was a great relief, knowing that they can always go to her, a Japanese, should there be a need to remind us about any potentially improper behavior on our part. However, that does not mean, we were successful all the time. Many facilities we had used earlier, refused to accommodate us in our later attempts. Through such bitter experiences we gradually learned to be more careful about cleanliness, finishing on time, and making sure that we do not inadvertently annoy other Japanese people using the common places in the public facility. At times, I had to be stern like a headmaster reminding students to mind their manners, and many members were often upset with that. But in the end, members came to understand the issues and gradually became a bit more disciplined, and that way we have managed to look more credible to the facility authorities these days, and face fewer hurdles in booking the facilities. Keiko and I are still carrying on this activity (with the exception on three or four occasions when Mrs. Meeta Chanda/ Mr. Sanjib Chanda or Mrs. Lia Kumar/Mr. Partha Kumar took charge), as nobody is willing as yet to fully take up the responsibility. We hope to pass this baton to the younger members before my management term in the formal association expires in 2026.

When we started in 1981, I was in my 20s, and the older members, some of whom are no more, were also quite young being in their 30s or 40s. Thus, after continuing with the tradition for over 44 years, the remaining older generation, members since the 1980s, have happily become senior citizens, and one central idea of making the association formal was to enable us, the senior citizen generation, to gradually and smoothly transfer the business function execution responsibility to younger generation in a structured and amicable manner. We are eagerly looking forward to such change as we as a community continue the tradition of celebrating our rich heritage in Tokyo.

I want to conclude with a few personal remarks. In over 40 years that I was involved in the puja activities as priest, I spent most of my time engaged in conducting the ritual for most part of the day of the event, and I had very little opportunity of meeting the newcomers and get to know them. As a result, after almost more than 44 years of involvement in BATJ activities, I must admit that I know very few of the participating members of the younger generation (especially the ones who have come to Japan after 2015 or the floating population who were here only for a few years), and they have no idea about my long involvement in three main crucial aspects (facility booking, duties of a priest, and communication with hall management regarding pressing issues) of the events we organize. Writing this article is an attempt to introduce myself to such new people, who might have always wondered, who I am. I am not a very social person as such, and do not claim to be an expert on Japan and Japanese customs. Although I have already spent 45 years in Japan, and now leading a retired life here, I still feel like I know very little about this country and its people. The country and people I knew in 1979 when I first landed in Japan, are vastly different now, especially the people of the younger generation. But it is still a place I love to live in. The point is, I am here by choice, and will spend the rest of my life here with my wife.

I think that I am more Japanese than Indian now by following the Japanese proverb "郷に入れば郷に従え" or as the saying goes, "When in Rome, do as the Romans do," and I am happy with that transformation. I view that as a key step in my assimilation here.
Thank you and Happy Durga Puja 2025.

References

1. 東京でのベンガル・弁才天祭　＜解説・写真　小西正捷　法政大学教授＞　＜本文　S.チョットパッダエ　横浜国立大学留学生＞、大法輪、昭和五十六年九月一日発行 (in Japanese) (The English translation of the title is: "Benzaiten Festival of Bengal in Tokyo". Note: This article was written in collaboration with Professor Masatoshi Konishi of Hosei University, when I was a second year M Eng student in Yokohama National University during 1980-1982. I completed my Dr Eng studies in University of Tokyo during 1982-1985.)
2. যখন ছোট ছিলাম। সত্যজিৎ রায়। অষ্টম মুদ্রণ চৈত্র 1415, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড মুদ্রিত। ISBN 81-7066-880-8
3. 「デュルガプジャ」　スデブ・チャットパダイ、Anjali 1998
4. তোওকিওর দুর্গোৎসবের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে স্মৃতির পাতা থেকে - সুদেব চট্টোপাধ্যায়, Anjali 2014
5. On the occasion of celebrating Silver Jubilee Anniversary of Durga Puja in Tokyo - Recollections of a long-time BATJ Member, Sudeb Chattopadhyay, Anjali 2022 (translated from original published in Bengali in Anjali 2014)
6. 「クションクスカル」　スデブ・チャットパダイ、Anjali 2002
7. 「昔からの言い伝え」スデブ・チャットパダイ、Anjali 2003
8. 「断食の王様」　スデブ・チャットパダイ、Anjali 2004
9. 「ジャマイソシュティ」　スデブ・チャットパダイ、Anjali 2005
10. 「ベンガルの行事における季節と歴」スデブ・チャットパダイ、Anjali 2006
11. 「アシールバデュ」スデブ・チャットパダイ、Anjali 2007
12. 'Anjali' – 26 years of journey, Ranjan Gupta, Anjali 2022

(The writer, a long-time resident in Japan, is currently serving as a director of the formal BATJ organization registered as "一般社団法人　印度人の集い" in Tokyo)

Lotus Viewing at Sankeien: A Garden in Yokohama for All Seasons

Rita Kar

Sankeien Garden, in Yokohama was created over a span of 21 years in the early 1900s by silk merchant Sankei Hara. A beautifully landscaped garden, which was once a private sanctuary for the Hara family is today, a world where natural beauty, historic architecture and cultural legacy exist in perfect harmony. Kakushōkaku, Hara's private residence and the first building erected at Sankeien, was not only the family home but also a vibrant hub of artistic exchange. Hara displayed his extensive collection of artworks there and hosted some of Japan's most avant-garde artists of the time. While in residence at the garden, famed nihonga masters Yokoyama Taikan and Maeda Seison created remarkable works. The garden also inspired thought leaders such as philosopher Watsuji Tetsuro and Rabindranath Tagore. During his two and a half months of stay here in 1916, Tagore composed Stray Birds, his lyrical collection of poems that continues to resonate across cultures.

Spring arrives in the garden with a spectacular burst of plum and cherry blossoms. In summer, the garden awakens early—lotus flowers bloom at dawn, rising delicately from the still waters of the pond. Their soft pink and white petals glow in the morning light but by mid day, the blossoms gently close. In autumn, red maples and golden ginkgo trees cast a warm glow over the paths.

We visited the garden one summer morning with friends, when the garden has special opening hours for early-morning lotus viewing and were amazed by the beauty of the lotuses. The weeping willows swayed gently in the warm breeze, their branches brushing lightly above the delicate blossoms. Pine trees stood tall nearby, their cones firm and textured against the softness of the lotus petals in full bloom. While all around us, cicadas chirped in chorus. It was a moment that captured all the senses, one we'll always remember.

The cherry tree grows on you

Ambassador Sanjay Bhattacharyya

When we moved into our home in Daizawa, Swamiji kindly consented to perform griha pravesh puja. A few Japanese friends sat cross legged through the ceremony in rapt attention. Later that evening, Masako and her disciple captivated our guests with a scintillating performance of Odissi dance. It was an invocation to an auspicious beginning as we settled down in our quiet neighbourhood with its clear stream, sakura grove and family restaurants. Sometime later, when we hosted a hanami gathering in our garden, blessed with two cherry trees on one side and a bamboo grove on the other, Kaneko san came dressed in a kimono while Matsumoto san brought his opera glasses to view the sakura blossoms. We felt our affection for the Japanese way of life had been acknowledged.

Our tenure in Japan from 2007-2010 was indeed in fortunate times. The political climate was encouraging, economic cooperation was thriving and cultural connections were bringing people closer. We met people passionate about collaborations and tours across the beautiful land introduced us to a fascinating culture. Memorable experiences enriched our lives and brought us closer to the spirit of Japan.

It was thus with a sense of anticipation that we embarked on our recent visit to Japan, 15 years after we left, to relive beautiful memories. We met many old friends and visited our favourite haunts. Ranu and I were pleased that in this rapidly transforming world some relationships endure and become more precious.

We also had new experiences, perhaps more popular with the Japanese than foreigners, which provided insights to how they cherish their heritage and seek beauty and perfection in whatever they do.

Rice planting ceremony

Bengalis and Japanese are passionate about fish and rice. We can have it at breakfast, lunch and dinner, 365 days a year. The onset of rain signals the time to plant our favourite staple. So when we learnt of the Otayue rice planting ceremony at Sumiyoshi Taisha Shrine in Osaka we could not resist. The setting was serene and ritualistic, and the ceremony transported us to its Shinto origins. The feudal lord led a procession of dancers and musicians dressed in ceremonial costumes. The farmers planted rice seedlings in a flooded field, accompanied by the soulful strains of the shakuhachi and incantations expressing gratitude to nature's cycle. The sky was overcast with a light drizzle but the throngs of Japanese, both old and young, testified their belief in the sacred relationship between man and nature.

Gold leaf making

When noted artist Yamada san and Mami learnt we were visiting Kyoto they insisted we meet Hori san, whose family had developed gold leaf some 350 years ago. Although Kanazawa is now the leading producer of gold leaf, its origins are in Kyoto, where it was made manually by pressing gold alloy between sheets of paper. Gold, deemed precious and sacred, was used in ritual objects, lacquerware and even on temples. Horikin made the finest gold leaf, which was used in Kinkakuji Temple. We reached Horikin workshop, in the heart of old Kyoto, to be greeted by Hori san's wife, who introduced us to the fine art and the family's contribution to modernisation of the process and production of innovative items such as edible gold leaf. The best part was drawing patterns with glue and then applying the gold leaf on it before brushing away the exposed parts to unveil our own gold leaf art!

Kimono painting

While kimonos may not be as popular in daily life, they are worn by both men and women on special occasions. Our friend Maqsooda took us to the workshop of a sumie master who paints kimonos in Kanazawa. He learnt the art after years of apprenticeship under his master.

Kaga Yuzen art expresses the rugged beauty of the land and reflects samurai culture. He pointed out that unlike the lavish use of gold and embroidery in kimonos from Kyoto, the imperial seat, the Kanazawa kimonos were less ornate but as beautiful and sophisticated. He has two apprentices who will carry forth the tradition, noting there is a revival in the practice of wearing the kimono.

Sake festival

You don't really know Japan until you've sampled sake. Made from the polished kernel of grains of rice, sake is a sophisticated drink that benefits from grain, terroir and water from snowy mountains. Takayama is a pilgrimage for sake lovers. At the Hida sake festival we sought out breweries, easily identifiable with the huge sugidama, cedar leaf ball, hanging above the door. It was a heady ritual sampling sake in traditional ceramic or wooden cups from magnum-sized bottles as well as coin-operated dispensers. A sake festival is serious business as one keeps a scorecard to assess different brands for aroma, flavour, grain quality and overall experience. Sake flavours vary across the country but remain the favourite accompaniment for gourmet kaiseki meals.

I sometimes wonder if it was the sustained period of peace and isolation at the end of the Tokugawa period that kindled the quest for harmony and excellence or was it the engagement with western civilisation after the Meiji Restoration that led Japan to great heights while it retained its uniqueness. Our recent visit has whetted the appetite for future explorations and discoveries.

Devi Sukta of Rig Vida

Devajyoti Sarkar

The Devi Sukta of the Rig Veda is a foundational text for the Shakta tradition of Hinduism. It represents the earliest depiction of the goddess as the ultimate reality and the source of all creation. Its emphasis on the Divine Feminine is a significant departure from the patriarchal narratives that arguably characterizes much of the Rig Veda.

The Rishika of this Sukta is Vaak Ambhrini, the Devi herself. "Sukta" means praise. The Rig Veda is comprised of more than a thousand Suktas. It comes from a time when we had a different relationship to God and in this case Goddess. These are not prayers, they are praise. This is one of a rare few Suktas that are written in the form of self-praise.
In its structure and style, the Devi Sukta stands alone.

Rig Veda 10.125 (10th Mandala, 125th Sukta)
Devi: Vaak Ambrini
Rishika: Vaak Ambhrini
Translated by: Devajyoti Sarkar

अ॒हं रु॒द्रेभि॒र्वसु॑भिश्चराम्य॒हमा॑दि॒त्यैरु॒त वि॒श्वदे॑वैः ।
अ॒हं मि॒त्रावरु॑णो॒भा बि॑भर्म्य॒हमि॑न्द्रा॒ग्नी अ॒हम॒श्विनो॒भा ॥
अ॒हम् । रु॒द्रेभिः॑ । वसु॑ऽभिः । च॒रा॒मि॒ । अ॒हम् । आ॒दि॒त्यैः । उ॒त । वि॒श्वऽदे॑वैः ।
अ॒हम् । मि॒त्रावरु॑णा । उ॒भा । बि॒भ॒र्मि॒ । अ॒हम् । इ॒न्द्रा॒ग्नी इति॑ । अ॒हम् । अ॒श्विना॑ । उ॒भा ॥

I move with the Rudras and the Vasus, with the Ādityas and Vishvadevas I,
I sustain Mitra and Varuna, Indra and Agni, and the two Ashvins.

अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम् ।
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥
अ॒हम् । सोम॑म् । आ॒ह॒नस॑म् । बि॒भ॒र्मि॒ । अ॒हम् । त्वष्टा॑रम् । उ॒त । पू॒षण॑म् । भग॑म् ।
अ॒हम् । द॒धा॒मि॒ । द्रवि॑णम् । ह॒विष्म॑ते । सु॒प्र॒ऽअ॒व्ये॑ । यज॑मानाय । सु॒न्व॒ते ॥

I press Soma, I sustain Tvashtr with Pushan and Bhaga.
I give wealth to the sacrificer who praises well and offers oblation.

अ॒हं रा॒ष्ट्री॑ सं॒गम॑नी॒ वसू॑नां चिकि॒तुषी॑ प्रथ॒मा य॒ज्ञिया॑नाम् ।
तां मा॑ दे॒वा व्य॑दधुः पुरु॒त्रा भूरि॑स्थात्रां भूर्या॑वे॒शय॑न्तीम् ॥
अ॒हम् । रा॒ष्ट्री॑ । स॒म्ऽगम॑नी । वसू॑नाम् । चि॒कि॒तुषी॑ । प्र॒थ॒मा । य॒ज्ञिया॑नाम् ।
ताम् । मा॒ । दे॒वाः । वि । अ॒द॒धुः॒ । पु॒रु॒ऽत्रा । भूरि॑ऽस्थात्राम् । भूरि॑ । आ॒ऽवे॒शय॑न्तीम् ॥

I am Queen, I collect treasure, I am radiant, the first of worship,
I have put the Gods in their places, mighty stations where only the mighty may enter.

म॒या सो अन्न॑मत्ति॒ यो वि॒पश्य॑ति॒ यः प्राणि॑ति॒ य ईं॑ शृ॒णोत्यु॒क्तम् ।
अ॒म॒न्तवो॒ मां त उप॑ क्षियन्ति श्रु॒धि श्रु॑त श्रद्धि॒वं ते॑ वदामि ॥
मया॑ । सः । अन्न॑म् । अ॒त्ति॒ । यः । वि॒ऽपश्य॑ति । यः । प्राणि॑ति । यः । ई॒म् । शृ॒णोति॑ । उ॒क्तम् ।
अ॒म॒न्तवः॑ । माम् । ते । उप॑ । क्षि॒य॒न्ति॒ । श्रु॒धि । श्रु॒त॒ । श्र॒द्धि॒ऽवम् । ते॒ । व॒दा॒मि॒ ॥

Through me (they) eat food, who sees, who breathes, who hears words spoken (does so through me),
They who do not think of me perish, those who can hear I tell what is worth hearing.

अ॒हमे॒व स्व॒यमि॒दं व॑दामि॒ जुष्टं॑ दे॒वेभि॑रु॒त मानु॑षेभिः ।
यं का॒मये॒ तंत॑मु॒ग्रं कृ॑णोमि॒ तं ब्र॒ह्माणं॒ तमृषिं॒ तं सु॑मे॒धाम् ॥
अ॒हम् । ए॒व । स्व॒यम् । इ॒दम् । व॒दा॒मि॒ । जुष्ट॑म् । दे॒वेभिः॑ । उ॒त । मानु॑षेभिः ।
यम् । का॒मये॑ । तम्ऽत॑म् । उ॒ग्रम् । कृ॒णो॒मि॒ । तम् । ब्र॒ह्माण॑म् । तम् । ऋषि॑म् । तम् । सु॒ऽमे॒धाम् ॥

I, and I alone, speak that which adorns both gods and men,
Those I love I make mighty, make him a brahman, a rishi, a sage.

अ॒हं रु॒द्राय॒ धनु॒रा त॑नोमि ब्रह्म॒द्विषे॒ शर॑वे॒ हन्त॒वा उ॑ ।
अ॒हं जना॑य स॒मदं॑ कृणोम्य॒हं द्यावा॑पृथि॒वी आ वि॑वेश ॥
अ॒हम् । रु॒द्राय॑ । धनुः॑ । आ । त॒नो॒मि॒ । ब्र॒ह्म॒ऽद्विषे॑ । शर॑वे । हन्त॒वै । ॐ इति॑ ।
अ॒हम् । जना॑य । स॒ऽमद॑म् । कृ॒णो॒मि॒ । अ॒हम् । द्यावा॑पृथि॒वी इति॑ । आ । वि॒वे॒श॒ ॥

I bend Rudra’s bow so that his arrow may slay those who hate Brahma,
I do battle for the people, I permeate both heaven and earth.

अ॒हं सु॑वे पि॒तर॑मस्य मू॒र्धन्मम॒ योनि॑र॒प्स्व१॒॑न्तः स॑मु॒द्रे ।
ततो॒ वि ति॑ष्ठे॒ भुव॒नानु॒ विश्वो॒तामूं द्यां व॒र्ष्मणोप॑ स्पृशामि ॥
अ॒हम् । सु॒वे॒ । पि॒तर॑म् । अ॒स्य॒ । मू॒र्धन् । मम॑ । योनिः॑ । अ॒प्ऽसु । अ॒न्तरिति॑ । स॒मु॒द्रे ।
ततः॑ । वि । ति॒ष्ठे॒ । भुव॑ना । अनु॑ । विश्वा॑ । उ॒त । अ॒मूम् । द्याम् । व॒र्ष्मणा॑ । उप॑ । स्पृ॒शा॒मि॒ ॥

I arose from my father’s forehead, my womb is the Apsu at the ocean’s end,
There I stand with the Anu people of the water , the Amu touch the heaven through me.

अ॒हमे॒व वात॑ इ॒व प्र वा॑म्या॒रभ॑माणा॒ भुव॑नानि॒ विश्वा॑ ।
प॒रो दि॒वा प॒र ए॒ना पृ॑थि॒व्यैताव॑ती महि॒ना सं ब॑भूव ॥
अ॒हम् । ए॒व । वातः॑ऽइव । प्र । वा॒मि॒ । आ॒ऽरभ॑माणा । भुव॑नानि । विश्वा॑ ।
प॒रः । दि॒वा । प॒रः । ए॒ना । पृ॒थि॒व्या । ए॒ताव॑ती । म॒हि॒ना । सम् । ब॒भू॒व॒ ॥

It is I who makes the wind blow, I commenced (the creation) of all the worlds,
Beyond heaven, beyond earth, so vast am I in greatness.

The Power Of Miracles

Shoubhik Pal

Kids these days use all kinds of strange words. Delulu, solulu, slay, glazing, cap, no cap. Another one of these strange words is doomscrolling - which a Gen Z website called 'Urban Dictionary' defined as 'the act of endlessly scrolling through bad news on social media or news websites, often causing increased anxiety.'

Quite a strange word, made all the more strange by me doing the very exact thing earlier this year. It was quite justified, to be honest - the first part of this year was very doom & gloom, both in an overall & India perspective. The Pahalgam attacks, Operation Sindoor, a deadly stampede the day after RCB won its first IPL - all these things happened seemingly days after one another, and it all culminated with the most shocking event of them all- AI 171, from Ahmedabad to London Gatwick, crashing into a hostel canteen a mere 30 seconds after taking flight. Everyone on board feared to be dead, many killed on-ground as well. A truly devastating tragedy.

It was when I was doomscrolling late on the day this crash happened, sifting through news coverage to figure out what's real & what's not, that something truly strange happened. BREAKING NEWS - reports of a survivor from the crash. A sole survivor, 242 people on that plane, 241 confirmed dead, 1 sole survivor. Mr. Vishwashkumar Ramesh, seated at 11A, an emergency exit seat that detached from the main wreckage, prompting an extraordinary survival and an even more extraordinary narrative shift - a tragedy that suddenly & swiftly turned into a miracle.

I say this not to discount all the lives lost in that tragedy - they will forever be in my prayers - but rather to amplify the power of miracles. This particular miracle turned a tragedy into an unbelievable story of survival against all odds. From my perspective, it turned a particularly pessimistic mood into something a little more optimistic. Not to mention, it turned 11A into the most coveted seat in any Indian aircraft moving forward. (It's true, prices for that seat are double compared to other ones.)

And speaking of that particular pessimism, I needed more happy thoughts to remove it completely. So I went on ChatGPT (which I seem to be using a lot for work but that's for another Anjali article) and asked for all the miracles it could throw to make me feel better about the world. Many were thrown, and as I was going through literally hundreds of them, my brain started placing each one into succinct categories. Thought, I'd share them with you, so fasten your seatbelts - this article is about to get real positive.

Let's first start with nature's miracles - seemingly unbelievable events simply due to the beautiful complexities of our world:

- One of the driest places on Earth - the Atacama Desert in Chile, sometimes going decades without rain - suddenly erupts in wildflowers at the first occurrence of showers. Pink, purple & yellow blossoms covering miles of desert like a regal carpet - and no, it's not a mirage. (It is beautiful, though. ➡)

- Speaking of life & death, the wood frog (native to Alaska and Siberia) survives the entire winter by literally being frozen solid. It's blood freezes, it's heart stops. It's 'dead' for months… and then, in spring, it thaws out and jumps around like nothing ever happened. Alive and thriving, thanks to the natural antifreeze produced by its cells.

- In Death Valley, USA, huge stones (weighing up to hundreds of pounds) chart long, vivid trails over months in a dry lakebed with nothing or no one visibly pushing them. They're moving on their own… thanks to a rare combo of ice, water & wind.

Let's move on ourselves to the miracles of the human body - which are technically a subset of nature's miracles, but more focused on us as a species:

- 7-year-old Charlotte was in a deep coma when her favorite song, Adele's Rolling in the Deep started playing. (Great song, btw.) Her mother started singing along, and Charlotte, all of a sudden, smiled. Within 2 days, she started talking. Within a week, walking. The only explanation doctors gave is that the emotional weight of that song simply switched something back on in her.
- A woman with heart failure inexplicably recovered during pregnancy. The cardiac tissue had been repaired using fetal stem cells. The baby that saved a life before even being born.
- Orthopedic surgeon Tony Cicoria was struck by lightning… or was it inspiration? Because a few days later, he began creating original concertos on pianos - an instrument he had never played before.
- As if we needed any other reason to pray to Gods like Maa Durga, but here's one - a town held a prayer circle for a man diagnosed with a brain tumor. Days later, the tumor disappeared.

I'm going to hit my word limit soon, so let's brush through the next one - coincidental miracles, borne out of sheer luck. Vishwashkumar Ramesh's case definitely comes under this, but here are some positive ones:

- A man named Wu Gang was walking when he caught & saved a toddler who fell from a second-floor window. That would be a miracle by itself, except he did the same thing at the exact same place 2 years later - same window, different child. (On a side note, those parents on the second floor need to sort themselves out.)
- This is The Parent Trap movie in real life. Two college students, over a seemingly uneventful breakfast, realize they're half-sisters separated at birth.
- Mark Twain was born in 1835, the year Halley's Comet passed by Earth. He came with it, and he predicted he would go with it… which exactly happened when he passed (having lived a full life) in 1910, the comet passed through Earth again.

The last one (which I found the most problematic) were miracles of kindness:

- A young boy with a rare blood type needed an urgent blood transfusion. His family posted about it online, not expecting anything. Within hours, over 200 people came to the hospital and he was ultimately saved.
- Geeta, a young Indian girl, was suffering from a condition that required a transplant, her parents couldn't afford. Pakistani doctors, moved by her story, brought her to Lahore and did the operation for free.

While heartwarming, the last one in particular proved extremely problematic. Mind you, I'm getting all this from ChatGPT, and that created a train of thought in my head. This is an act of kindness, yet AI is deeming this a miracle. Why is that? Essentially because of the divisions we have placed on ourselves as a species, so much so that Indians & Pakistanis being kind to each other is considered a miracle by AI. I guess it's a reflection of the state of our world.

It's up to us to change the context. Normalize kindness of all kinds, so they don't end up being deemed miraculous. Yet, the inverse can also be true, leveraging the sheer power of miracles to make us more thankful of what we have - everyday activities we've normalized, that are in fact miraculous.

The alarm we wake up to, is a miracle. The commutes we take to work are miracles. You, reading this article that I wrote from halfway around the world, is a miracle. Don't think so? Wouldn't they be considered miracles, say, 500 years ago? Like I said, it's all really about changing the context.

With the blessings of Maa Durga, let's make miracles daily!

Healing

Shruti Upadhaya

A time when we're all children
Impressionable and young,
A little hurt could hurt a lot
Among the praises that are sung.

Here is a little story
Of someone I know
Who was always miserable
The cause unbeknown.

She was born on a cloudy summer day,
Her skin was dark,
Nothing ever saved her
From the explicit colour remarks.

At the age of four she was told
By her own peers in school
'You're dark 'cause you don't shower enough'
and that 'It's disgusting and uncool'.

The four year old was tense.
She couldn't sleep at night
Wishing of what life would've been
Only if her skin was light.

The comments on her skin, her smile,
Never really went away
'She's so clingy every chance she gets'
What can you expect of someone who's always been pushed away?

She was never the best student,
She never stood out of the crowd,
All that she ever wanted
Was to make others proud.

She grew up insecure
With a sense to prove herself
to everybody she ever meets.
Alienating from her true self.

If you're an adult who's been through trauma,
Mental or physical, you know all too well
That it never really leaves you
They never bid farewell.

She has broken the cycle now
She doesn't live to impress.
And it's been quite the fight to be honest
But she loved herself through all the distress.

If I ever met that four year old
I'll say whilst wiping her tears and looking her in the eye,
'You're worth all the love you get'
And that 'whenever you smile, I see sparks fly'.

This was a story
Of someone I've known
Who always faked a smile
The cause of which we now know.

Ridges, ravines and valleys

Subhajit Deb

A fragrant afternoon breeze whipped us in our faces as we disembarked our train in bright orange livery. The 'Hida Express' named after the region in Gifu, practically synonymous for excellent beef was neither fast, nor economical. However, it made the trip from Nagoya to our hillside destination of Takayama deliciously picturesque, the driver oftentimes slowing down for us to gulp down the pristine waterfalls, scenic valleys and hills, blazing green after the morning showers.

We groaned as the journey ended but the train-ride had only whetted our appetites, as we hungered for adventure over the next three days with our friends from India who accompanied us on this jaunt. Only a short walk from Takayama eki, our home for the next couple of nights, sort of blew us away, with its ambience, décor and no shoes policy. We gaijins were about to receive our first ryokan like experience later that evening.
With our luggage stowed, we set out for the quintessential first order of business as Bengalis; Lunch! Alas, in a small Edo town of a few thousand, the chances of finding a place where the dreaded words of 'last order' hadn't already been uttered were sparse. We split up to double our chances but settled on stalls hawking yakitori and sushi.

As we walked through the streets of Takayama, we were enamored with how well-preserved the Edo-period houses were and how seamlessly they had converted them to shops, cafes and sake breweries with modern interiors. These shops lined the famed Sanmachi Suji district, where we also found reasonably priced mementos that screamed 'kawaii', took some gram-worthy snaps with the Japanese alps in the backdrop and eventually began walking down the Miyagawa river bank away from town; the air steadily getting chillier as darkness started to loom. After a hike down to the river bank, we enjoyed a bit of calm and watched a lot of koi swim by. Eventually, we decided to head back. We felt a proper dinner was in order as lunch had pretty much evaded us.

Unlike bigger cities, the quaint town of Takayama was almost deserted after sunset; but with its subtle street lights softly illuminating the Edo style houses, it felt almost dreamlike. At an intersection, we chanced upon a truly beautiful house, just barely lit by a soft yellow glow that gave the impression that it was calling to us. It turned out to be a cat café during daytime and a calico was indeed meowing at us from a small crevice in the window. We wished we had come to this beautiful place earlier in the day.

After enjoying dinner at a local restaurant, we waddled back to our hotel and enjoyed the complimentary ramen they offered. With our bellies and hearts full, we turned in, excited for our next destination.

-x-

We were especially drowsy the next morning, as we boarded the first bus to Kamikochi; the gloomy overcast sky somewhat dampening our spirits as we munched on kombini sandwiches. We grew restless as the uneventful journey lasted a bit too long. However, about two hours later, we were at the serene Taisho pond – the starting point on the gorgeous Kamikochi hike. The route we considered would take us to the famed Kappa Bashi bridge and Myojin and back.

But as it turned out, even our starting point of Taisho-pond was a kaleidoscope of colours; the clear water flawlessly reflecting the lush green Hokata mountains and providing endless real estate for photographs. The morning mist and mountain air made our hearts race with excitement even as grey cumulonimbus clouds assembled in a contradictory tug of war.

As we hiked through the trail, we saw plenty of tourists; this place was by no means a secret – so much so that the infamous bears that resided in the woods didn't dare venture out in the open lest they photobomb a family mantelpiece. Nevertheless, we eagerly rang every single bear repelling bell we spotted on the trail, because why not?

As we pressed on towards Tashiro pond, the scenery turned more breathtaking by the minute. The clouds sometimes parted for the sun to cut through in sharp geometric arcs; frequently prompting us to stop and soak it in. We took a short break below Tashiro bridge where two streams of the Azusa river intersected. The water was extremely inviting but we instantly regretted stepping in as it was bitterly cold.

The views just before we arrived at the tourist haunt of Kappa Bashi bridge were truly some of the best I've experienced in all of Japan – with the horizon opening up so wide that our eyes couldn't cover it in a single glance; with all sorts of colors bombarding our eyes in sensory overload. Groups of young girls were filming reels on rocks that protruded to the edge of the river. The crowds thickened further as we ventured closer to Kappa Bashi and finally the looming clouds won, it began raining proper.

Despite getting only a few tourist free shots atop the bridge, and walking amidst the rain, the hike was still very pleasant the rest of the way and we remained in good spirits. The popular route was closed but we took the longer route towards Myojin which had sharp uphill climbs that had us all panting. Eventually we reached Myojin and even stood in line for the famous picture with the Hotaka Jinja shrine and mountain backdrop.. After a quick soba stop later, we began the long hike back to Kamikochi bus terminal.

After almost five hours of hiking, we were back where we began and boarded the bus back to Takayama as our minds turned to warm ramen and onsen later that night.

-x-

The trip out of Takayama to our next destination was considerably more pleasant as the weather was clear, we had, had a proper breakfast and most importantly, we were going to spend a night in the fairytale village of 'Shirakawa-go'

Before checking in at our Ryokan, we wanted to make use of the daylight and enjoy the village. First on the list was the hilltop vantage point which provided a panoramic view of the gassho zukuri style houses on an emerald green canvas following the monsoon. After we got the sought after photo from the observatory, we walked along the village – and it left us spellbound with its beauty. They say this place is ideal during the winter with snow covering the thatched roof houses – but somehow the green backdrop was more appealing to us.

After passing by some of the landmark houses which had been turned into makeshift museums, we found a square with a smorgasbord of food stalls; after trying a whole lot of skewers, gyozas, sushi and croquettes, we moved on and passed a large bridge which made for some excellent photos of our group.

Eventually we were back at the bus terminal where we took the shuttle to our ryokan. This place was quite remote and nestled under a ridge with a little stream flowing beyond. Our room was rather luxurious, complete with custom yukatas and pillows. We immediately had some tea after experiencing the chill air, being surrounded by mountains, the village got rather cold after nightfall and finally got some rest after three days of wandering across the ridges and valleys.

The hot spring in this Ryokan was even more remarkable. After a quick soak and ice cream later, we assembled for our dinner slot and were whisked off by the concierge to a private booth. Here they served us a kingly spread, with each dish more fabulous than the last. By the eleventh dish, we were on the verge of exploding – but we couldn't stop gorging on the succulent fish and meats. After what felt like an eternity later, we were having dessert and felt I should make it a point to recommend this place to everyone. The open air onsen during the winter would also be quite legendary. That night we slept like babies.

The morning also had an equally majestic breakfast spread which was so long that we were worried about missing our bus to Toyama to catch the Hokiriku shinkansen back to Tokyo. At that time, we decided that this would certainly not be the last time we would travel across rural Japan. These three days were more enjoyable than any we had spent in the cities and we felt all the tourists only doing Kyoto and Osaka did not know what they were missing out on.

To My Mother

Mita Mukhopadhyay

Hello Mom,
Are you there?
I have so much to tell you,
So much to share

For four years the sickly boy you helped me raise,
Is a doctor now,
And very kind,
He treats the sick, he cares for the blind.

Can you hear me mom?
Can you see?
I've picked up the phone so often,
To call you instinctively.

You urged me to take the sickly child,
To the US if possible,
And diagnosed for what he ailed,
When doctors in India had failed.

He is a dad now
With two kids of his own
I wish you could see them,
And how beautifully
they've grown

Sorry Mom for not becoming a doctor,
But I have dad to thank,
He urged me to teach
And not join the bank!

I have so much to ask you mom,
About the uncles and aunts I never met,
Left behind in Bangladesh,
And that's my biggest regret.

Tales of your life as a child
Always fascinated me,
You spun them so beautifully,
I even wrote a story!

I should have asked you more,
I thought you'd be with us forever,
Found out who my people were,
So I could meet them somewhere

I wish I could cook like you,
Believe me I tried,
Your perfect sandesh,
And the light and airy nimkees you fried.

Today is Mother's day Mom,
Mary took me out to lunch,
We never celebrated you in a special way,
Or focused on you just for a day.

I hope I made you proud sometimes,
With all the awards I won,
The First in class badge always eluded me,
For that I am sorry!

Can you hear me mom?
Can you see?
I hope you are with the dad you loved. (Perhaps with mine too)
And that your loving brothers are all with you.

Proposal to install the Bust of Shri RashBehari Bose

Rohan Agrawal

Recently we have celebrated 139th birth anniversary of Shri RashBehari Bose, whose contributions make him look like a Superhuman and an idol for Indian community in Japan. An extremely talented freedom fighter who took an unprecedented step and a courageous voyage to arrive in Japan. He must have faced severe challenges in Japan, given that Japan was a British ally during first World War, despite linguistic and cultural challenges. He not only overcame these but was also able to cultivate very strong relations with host community and played a pivotal role in the formation of Indian National Army. Given the achievements of Shri Rash Behari Bose towards the Indian independence and as a historical milestone in the journey of Indo-Japan friendship, it would be a great tribute to install the bust of Shri RashBehari Bose in the Kitanomaru koen in front of the Indian Embassy, Tokyo. His memorial will inspire and encourage future generations to learn more about how Japan has played key role in supporting Indian freedom fighters. This will be the perfect tribute as we prepare to celebrate his 140th Birth anniversary next year.

Why Shri RashBehari Bose?

Among Indian revolutionaries connected to Japan, RashBehari Bose established the deepest ties. His initial visit in 1915, amidst British attempts to locate him due to his revolutionary actions, resulted in Japan offering him refuge. His integration into Japanese society was swift, as he became a communicator of Indian affairs:

- Delivered lectures on Indian independence and Asian solidarity.
- Cultivated relationships with Japanese dignitaries, from ministers to journalists.
- Organized support for Indian expatriates, especially students and activists.
- Authored writings in Japanese, English, and Bengali.
- Introduced Indian curry via Nakamuraya, now a household name.
- Participated in nationwide conferences to highlight Indo-Japanese cultural bonds and British exploitation.

Bose also founded the Indian Independence League in 1924, establishing himself as a pivotal figure in non-violent movements leading to the Indian National Army.

Japan Connection

Arriving in Kobe on June 5, 1915, Bose quickly became a target of British authorities, prompting Japanese figures to arrange his protection. Key events include:

- A notable meeting in 1915 with Japanese elites discussing British tyranny.
- His controversial evasion from police with aid from Japanese supporters.
- His marriage to Toshiko Soma and eventually Japanese citizenship in 1923.

The Japanese government recognized Bose's contributions by awarding him the Second Order of Merit of the Rising Sun, and the emperor honored him posthumously by providing an Imperial coach for his remains.

Significance at the Indian Embassy

Despite his monumental contributions, RashBehari Bose remains under-researched and less recognized due to his extended stay in Japan. Positioning his bust at the Indian Embassy will honor his dream of an independent India and educate citizens about his efforts. It will also highlight the critical support Japanese citizens offered, impacting the Indian National Army's role in ending colonial rule in Asia.

Inclusion of Toshiko Bose

Incorporating the Bust of Toshiko Bose alongside RashBehari will further symbolize the enduring Indo-Japanese friendship, honoring the Soma family's bravery in sheltering Bose during his most vulnerable times. This proposal aims to immortalize the legacy of RashBehari and Toshiko Bose, fostering cultural understanding and inspiring future generations.

RashBehari Bose & Toshiko Bose

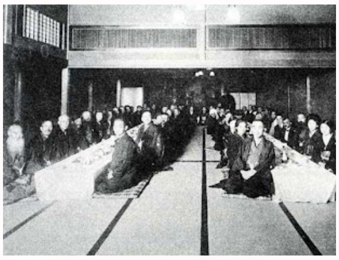

Bose's marriage reception

Bose with Japanese supporters

- "*Ras Behari Basu – His Struggle For India's Independence*" – Radhanath Rath & Sabitri Prasanna Chatterjee
- *SringeriBelur – Articles by Saswati Sarkar, Shanmukh and Dikgaj*
- *"India's Biggest Cover Up" – by Anuj Dhar*
- "*Bose of Nakamuraya: An Indian Revolutionary in Japan*" – by Takeshi Nakajima
- https://www.nakamuraya.co.jp/pavilion/history/showa/t_1918_01.htm

Rash Behari Bose & the Nakamuraya's Curry ~ Bringing A New Flavour to Our History ~

Ashoke Karmokar

Rash Behari Bose, a prominent Indian freedom fighter with extraordinary charisma, is a name warmly remembered in his homeland, India. In Japan, however, he enjoys a unique fame—arguably even greater—thanks to the patented "Indian Curry" that now graces supermarket shelves in ready-to-eat packs and is served fresh at one of Tokyo's most iconic restaurants, Nakamuraya.

I vividly recall my encounter with this storied curry, tasting it with my family at Nakamuraya's branch in the basement shopping arcade near Shinjuku Station. The service was warm and attentive, and I felt privileged to be dining there. The curry—flavoured with the 'sukta masala' magic of Rash Behari Bose—was delicious, evoking the tastes of my hometown. That connection felt even deeper, knowing that I, too, hail from West Bengal's Hooghly district, where Bose spent much of his youth.

Historical records note that Bose was born in 1886 in a rural village in Bardhhaman (now East Bardhhaman) district, but received most of his schooling in Chandan Nagar, Hooghly, then under French colonial possession. It is widely believed that his nationalist spirit was ignited during these formative years.

Bose's revolutionary character became most evident in 1912 when he masterminded the attempt to assassinate the Viceroy, Lord Hardinge, with a bomb. The blast shook the convoy, but Hardinge survived with only minor injuries. From that moment, Bose was a marked man, constantly moving between safe houses, living underground to evade arrest. His most daring escape came in 1915, when he fled India for Japan. There, he cultivated friendships with Japanese journalists and sympathisers of the Indian cause—one of whom led him to the home of Nakamuraya's owner, where Bose hid for months.

During his time in hiding, Bose introduced the Nakamuraya household to the rich flavours of Indian cooking. The proprietor grew fond of him and proposed that he marry his daughter, Toshiko. Bose agreed, and the marriage took place in 1918. The couple had two children before Toshiko's untimely demise in 1925. While grief tempered his political activities, it also deepened his roots in Japan. By 1927, Nakamuraya had officially added "Indian Curry" to its menu, prepared according to Bose's recipes. The dish soon became a sensation, eclipsing even the bakery's most celebrated products.

Bose lived in Japan until his death in January 1945 at the age of fifty-eight, his health having declined after a lung collapse in 1944. His ashes rest in a family-built memorial tomb at Tama Cemetery in Fuchu City, western Tokyo—an open-access site where anyone may pay their respects.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

From May 22 to 24, 2025, an all-party parliamentary delegation from India visited Japan to reaffirm the nation's steadfast stance against terrorism. During the visit, several distinguished members of the delegation undertook a special journey to Tama Cemetery to pay homage at the memorial of Rash Behari Bose, the eminent freedom fighter whose life and work left an indelible mark on India's struggle for independence. In a solemn and dignified ceremony, they offered floral tributes, expressing a profound sense of pride in honoring his enduring legacy.

However, the delegation also conveyed their deep concern regarding the current state of the memorial, noting in particular the poor and weathered condition of the plaque at the tomb's focal point (Photograph as of June 29, 2025). They unanimously urged the Indian Mission in Tokyo to engage with the relevant Japanese authorities to ensure that the site is appropriately restored and maintained, thereby preserving the honor due for Rash Behari Bose.

India remains eternally indebted to Rash Behari Bose for his unwavering spirit and pivotal role in the nation's freedom struggle. Witnessing the sincere concern and commitment of the visiting dignitaries strengthens my hope that such actions will help safeguard his memory for generations to come. It is vital that both in India and abroad, the sacrifices of those who shaped our national destiny are remembered and respected. With the Ambassador and numerous dignitaries from India and the Tokyo Mission having visited the memorial in recent years, there is every expectation that the matter will be addressed with the urgency and seriousness it rightfully deserves.

Photograph: Rash Behari Bose's memorial tomb at Tama Cemetery (as of June 29, 2025).

Can we provide clean air for the residents of India and South Asia

Prabir K. Patra
(RIHN, Kyoto; JAMSTEC, Yokohama)

My heart aches every time I land in Kolkata, New Delhi or Dhaka – not for myself but for the medium to low-income people who are living in modest facilities in these cities. Air pollution in these cities has been very high, ranking them top-most polluted in the world in the autumn through winter season. Many of us are familiar with Air Quality Index (AQI) which is given alongside the weather reports in the news channels on TV or Online (even on your own Weather app!). AQI is consisted of gaseous species and particulate matter (PM). The PMs with diameter 2.5 micro-metre (PM2.5), roughly the thickness of human hair, can enter our respiratory system and cause cardio-vascular diseases, damage brain functioning, under-weight babies etc. Toxicity or oxidative potential is high for the PMs produced due to burning of household and crop residues, fossil fuels, and high temperature cooking (e.g., oil on hot pan, charcoal, wood). These burning or cooking styles emit black carbon, which remains in atmosphere after pyrolysis or is produced by incomplete combustion, and is a highly toxic material for human inhalation.

I travel to these cities on short business trips or to meet family members with a guarantee that I will be back to breathing clean air and live under a blue sky. The rich travels in air-conditioned cars on road and shuttle between high rise mansions or cozy office buildings (their kids can attend schools with air conditioned class rooms and workout in gymnasiums). But that is not the story around middle-low income citizens – most vegetable vendors, traffic police, service agents spend more than 12 hours outdoors. Not to mention the migrant labourers who are the backbone of comfort in city life; many of them sleep on the roadside all night after days of tiring service. Life of the papdi-chat or egg-roll vendor is even worse as they are constantly exposed to black carbon emitted from their oven. I have never been to a Pakistani city, but we have some knowledge about poor air quality in the region. Colombo is no different as far as the toxicity of PMs is concerned, but being located on seashore means the polluted air is flushed periodically to the ocean. Air over Chennai and Mumbai are also benefitted from changing land-sea breeze but signs of worsening air quality is emerging.

Every person I have met during autumn to winter while travelling or in a guesthouse of a research institution in India told me that high air pollution in Delhi is caused by the burning of crop residue (popularly known as "parali" in the region) in Punjab and Haryana. I have no idea why even scientists/professors with physical science background throw blatant statements. I myself had my share of doubt for not being expert in the field, but I made some attempt to study the case of high pollution in November 2016 when a cricket match between Sri Lanka and India in Delhi was abandoned midway because the visitors vomited and complained about respiratory troubles. Although I did not do deep research in the field, I kept talking with many colleagues whenever chances arose, until in April 2023 when I was asked to lead a project for the remaining 2 years at the Research Institute of Humanity and Nature (RIHN), Kyoto. The title of the project is "An Interdisciplinary Study Toward Clean Air, Public Health and Sustainable Agriculture: The Case of Crop Residue Burning in North India" or "Aakash" in short. The aim of the project was to encourage social changes for realizing cleaner air, improved public health, and sustainable agriculture.

One of the key contributions of Aakash project of RIHN was covering the whole Northwest India with air pollution measurement sites. To our surprise, extensive media coverage and government funding did not lead to basic observations on the source regions (Punjab and Haryana). The Aakash project installed 30 sets of Compact and Useful PM2.5 Instrument with Gas sensors (CUPI-Gs) in the study region of Delhi-National Capital Region (NCR), Haryana and Punjab. An example plot based on Aakash measurements are shown in Figure 1 from September 2022 to January 2025. Figure 1 shows that the PM2.5 concentrations are indeed higher in the main source region, i.e., the Southwest Punjab region, where the intensity of rice paddy cultivation is strongest and high yielding cultivars are adopted by the small-land holding farmers, compared to the relatively larger-land holding farmers in North Punjab. We study socio-economic reasons on farmers behaviour in details, which can be found in reports and peer-reviewed literature (https://aakash-rihn.org/en/final-report/).

PM2.5 values are greatest in Punjab, Haryana and Delhi-NCR when fire detection counts (FDCs) as seen from the satellites have peaked, indicating a role of rice crop residue burning on air pollution (yellow and grey shaded region in Fig. 1). But that crop residue burning lasts only a couple of weeks in October-November while the PM2.5 continue to stay dangerously high until February; pollutant concentrations well above the Indian National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) (Fig. 1). Personal experience suggests household residues are burnt throughout the year openly (not detectable by satellites) and meteorological conditions in autumn-winter creates severe accumulation of the pollutants. The cycle repeated for the years 2023 and 2024 when Aakash measurements were performed and also observed over decades at the US embassy site in New Delhi.

The air quality of Kolkata is not very different from that in Delhi or Dhaka, and our initial analysis suggests paddy stubble burning have increased in rural West Bengal. Since the mechanisation of farming (vanishing necessities of bullocks), adoption of jersey milk cows and transition to concrete housing etc., rice straws are no longer required as fodder or other domestic purposes, which poses a risk of even more crop residue burning in the South Asia region. As mentioned, this is one of the sources of air pollutants emerged as agriculture is intensified in the populous Asia. In Aakash project (and in this report) we focussed on the relationships between sustainable agriculture and air pollution mitigation options, and as suggested by the long duration of high PM2.5 concentrations the industrial activities remain as the major cause of harmful air pollution in the cities (ref. news articles below). Urgent actions are needed by government-backed policymaking before we are further suffocated by the toxic air outdoor.
Figure 1: Pentad (5-day) mean time series of regional average CUPI-G PM2.5 vs FDC are shown for the period of 01 August 2022 to 31 January 2025. Daily averages are prepared for PM2.5 official release data of Aakash project at 10 minutes time intervals before taking pentad means. The FDCs are taken from the National Aeronautics and Space Administration (NASA) Suomi National Polar Satellite's VIIRS. The broken grey line shows the NAAQS. Plot adapted from Mangaraj et al. (iLeaps Newsletter, April 2025; https://ileaps.org/newsletters).

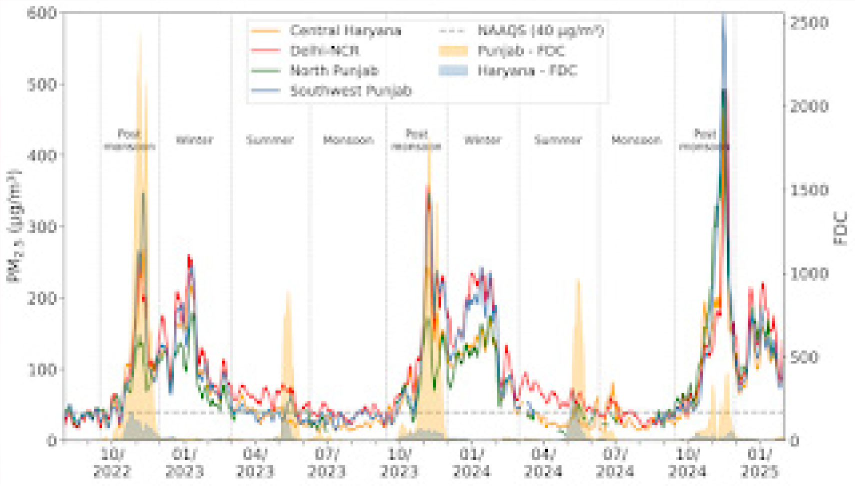

We constantly engaged with various stakeholder to disseminate our results at the Commission of Air Quality Management (CAQM), which operates under the supervision of the Supreme Court of India, and other prominent thinktanks in New Delhi, e.g., the Council on Energy, Environment and Water (CEEW), the Centre for Science and Environment (CSE). Since 2018, with a couple of years of disruption by COVID-19, numerous trips are made by our team to talk directly with the farming communities, and held workshops to exchange views surrounding rice straw management and air quality. At the end of the project in March 2025, about 70 scientists from India and Japan worked jointly on various aspects of the research. Some of the scientific collaborations continue and more importantly each one of us relish the friendships based on cultural foundations of the two countries. Outreach of Aakash research can be found in major Indian newspapers (https://aakash-rihn.org/en/media/), and a few recent news coverages are listed below:

1. https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/stubble-burning-in-punjab-haryana-contributes-only-14-of-pm25-in-delhi-ncr-study/article69219780.ece
2. https://www.business-standard.com/india-news/most-of-delhi-ncr-s-pollution-in-oct-nov-locally-created-shows-study-125020400738_1.html
3. https://www.nature.com/articles/d44151-025-00016-2

Ritwik Ghatak: Cinema and Life

Kalaswan Datta

This year, 2025, marks the centenary of Ritwik Ghatak's birth—one of India's most original and passionate filmmakers. Even after so many years, his films still speak powerfully about human pain, displacement, and the search for identity. Ghatak was not just a director but a storyteller who carried the heavy history of Partition and gave it a voice that continues to resonate worldwide.

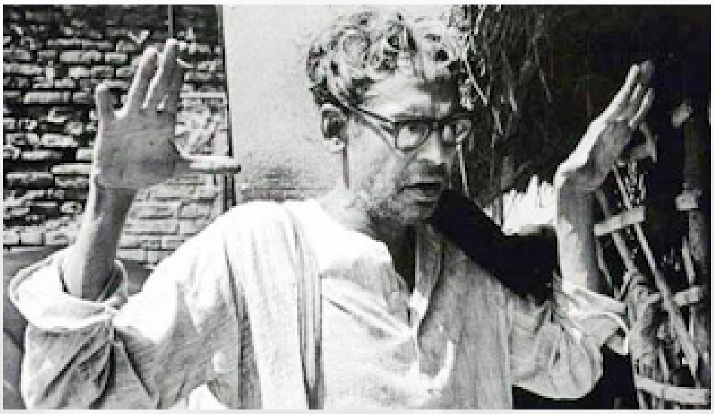

Ritwik Ghatak was born in 1925 in Dhaka, East Bengal (now Bangladesh). His childhood was shaped by the rich culture of Bengal but also by the looming tensions that would soon lead to the Partition of India in 1947. The violent division of the land and the massive displacement of millions left a deep mark on his mind. He often said, "আমার ছবি আমি মানুষের কাছে দায়বদ্ধ থেকে বানাই।" ("I make my films with a sense of responsibility towards people.") This sense of duty guided his work throughout his life. The experiences of loss and exile became central themes in his films.

Among his films, Meghe Dhaka Tara (1960) remains one of the most moving and powerful portrayals of sacrifice and family duty. It tells the story of a young woman, Neeta, who gives up her dreams to care for her family but faces neglect and betrayal. The way Ghatak used sound and silence in this film creates a deep emotional impact that stays with the viewer long after the film ends.

Another significant film, Komal Gandhar (1961), combines a love story with reflections on political and social divisions of the time. It explores how personal relationships are affected by larger conflicts. Subarnarekha (1965) tells a tragic story of refugees trying to rebuild their lives but being pulled apart by forces beyond their control. Its powerful imagery and haunting music convey a deep sense of loss and hopelessness.

Ghatak also showed his versatility with films like Ajantrik (1958), which is lighter and more humorous, about a taxi driver's love for his old car. Titash Ekti Nadir Naam (1973) is a beautiful and sympathetic portrayal of a fishing community struggling against change. His last film, Jukti Takko Aar Gappo (1974), is a raw and personal work that expresses his own frustrations with politics and society.

Ghatak was deeply involved in every aspect of his films. He did not just give directions; he lived within the stories. He often sang to his actors, acted scenes himself, and rewrote dialogues on the spot when he felt the emotion was not reaching the truth. He believed cinema must come from real life and told his students, "তোমাদের সিনেমা বানানোর আগে, জীবনকে চেনো।" ("Before making cinema, know life.") His passion and dedication demanded the same intensity from everyone around him.

Despite his creative genius, Ghatak faced many hardships. Poverty and alcoholism were constant struggles in his life. Many of his films were commercial failures during his lifetime, and critics often dismissed his work as "too political" or "too depressing." However, those who knew him personally recall his warmth, generosity, and quick laughter, which balanced his intense and sometimes difficult personality.

Among his peers and students, Ghatak was a complex figure—respected for his talent and honesty but sometimes feared for his uncompromising nature. He was known for pushing young filmmakers to explore deeper truths and emotions. His approach influenced many in Indian cinema and beyond. Today, his work is studied internationally for its innovative use of sound, editing, and narrative style.

For me, Ritwik Ghatak's films remind us that cinema can be more than just entertainment. His movies serve as mirrors reflecting real human suffering and hope. His voice, after 100 years, remains loud and clear. The themes he explored—displacement, identity, and injustice—are still very relevant today. In a world still grappling with migration and social divisions, his art offers lessons and warnings. This is the true mark of great art—it refuses to be forgotten.

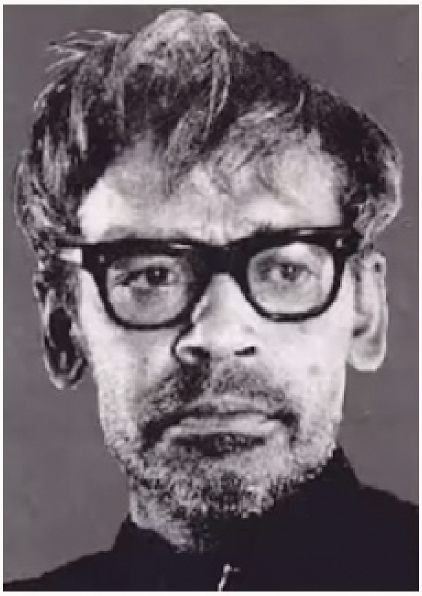

"আমার ছবি আমি মানুষের কাছে দায়বদ্ধ থেকে বানাই।" ("I make my films with a sense of responsibility towards people.")
"তোমাদের সিনেমা বানানোর আগে, জীবনকে চেনো।" ("Before making cinema, know life.")
"চোখ মুদে সারা জীবন স্বপ্ন দেখো।" ("Close your eyes and dream your whole life.")

Writing about Ritwik Ghatak is not just telling the story of a filmmaker; it is sharing the journey of a man who transformed personal and political pain into unforgettable art. His films continue to challenge, move, and inspire us. As we mark 100 years since his birth, it is fitting to remember and celebrate a voice that still echoes strongly in cinema today.

Down the Rabbit Hole

Joyita Basu Dutta

I walked behind a sweet little girl on the way,
She skipped excitedly as if her heart did sway.
Her heart was brimming and knew no bound,
As she squealed with joy and jumped around.
She reached out her hands in mirth and glee,
But her father didn't notice her heartfelt plea.
Again and yet again many an effort she made,
To grasp her father's hand, in vain I'm afraid.

As her father's hands clasped a thing inane,
I wish many of us would consider it a bane.
Some indispensable device held in a tight grip,
Lest it might fall off and out of his hands slip.
Without it we cease to exist of late, at it gaze
Incessantly whilst we're navigating life's maze.
Oblivious of her father's precious possession,
To walk hand in hand was the girl's obsession.

Little knowing the tiny hands were his to hold,
For only a few years and then he'd bemoan,
Those fleeting days when he failed to discern –
Faith, solace, trust and love were his to earn.
He lost out while clutching at his smartphone,
Unwittingly being lead down a rabbit hole.
Parents and children, husbands and wives,
Pay a hefty price, to keep up with modern life.

Remember a time when we'd chat in the train?
I look around and notice the screen does reign.
We miss out on stories and memories galore,
As the entire world on our phones we explore.
Liking, swiping, doom scrolling, researching
Can wait, as we need to spend time reflecting.
A toddler's keen eyes hopeful and sparkling,
Will soon be jaded if us they start emulating.

Heads bent over absorbing trivial information,
Each one alike with faint regard for any caution
Children and grandpas and all in between,
Ain't no soul who isn't clued in on a meme.
Ears stuffed with plugs we miss birds chirping,
Eyes fixated on reels we're so busy devouring,
Lips pursed together no smile escapes us,
If at all it does it's not for those beside us.

The journey is fun when we engage together,
With family and friends - people who matter.
Moderation and care in every thing that we do,
A little mindfulness is the need of the hour too.
So we don't miss out on the little joys of life,
Or later the regrets may bring tears and strife.
It truly is time when we ponder and introspect,
And try to keep the use of devices in check.

Sisterhood

Udita Ghosh

Sometimes I feel as though
I am unburdened of latent desires
Through your life,
That I have lived through you
The parts I never sought to explore,
But which are satisfied vicariously
-- And maybe that, will finally,
Be the greatest gift of sisterhood;

Greater even than my right to be
My most incorrigibly annoying self with you
-- allaad আহ্লাদ,
Greater even than the sacred right
To lean on you
Without expressions of gratitude,
To have claims made on my time and my life,
And be cared for without asking;

Maybe this is how
My desire to be and to do everything
Can find respite –

In feeling your life neighbouring mine;
In the shadow of the other's being
May we resolve all the lives we can live,
And let the rest go.

A Bench 'Mark'

Piali Bose

The 150 years old house built by my great grandfather in law , was named Jogesh Bhaban. Situated at the southern fringes of the city of Kolkata, it slowly became part of the greater metropolis as the city extended itself in its ever increasing hunger of expansion and construction.

The house, a grand structure with art deco type architectural style, so reminiscent of old South Kolkata, standing witness to more than a century of changes, started showing signs of sadness and weariness as the landscape altered, the demography changed, the social structure faltered. Once a house of three generations living together, full of cacophony, laughter, joy and sorrow, the decadence started slow.

The young migrating for work, elders becoming frail, relations shifting to more 'developed' places, the children going abroad for studies; emptiness started creeping into its walls.

Finally, a day arrived about two decades back when only the old caretaker remained.

The family gathered once or twice a year and maintained the house without being able to physically be, most often. The emotion never wavered but the old edifice seemed at a loss with the unprecedented and unwarranted development all around. It became stark in its oddity with its faded grandeur, history and memories amongst the rush for modernity all around.

Desolation has a strange smell and colour. Pale and mushy.

Emptiness started slowly gnawing away into the floors, the ceilings, the furniture, the floors, the crockeries and further reached outside into the garden. However much was done to regain, it seemed the house needed its inhabitants, more than repairs.

Finally, on a rainy July day, It was to be emptied to be sold.

The house was characterized by two things which unknowingly had seeped into my memory of the place. A swing in the expansive veranda, the long backed chairs in the drawing room, the well stacked big library as well as a 'bench' in the kitchen.

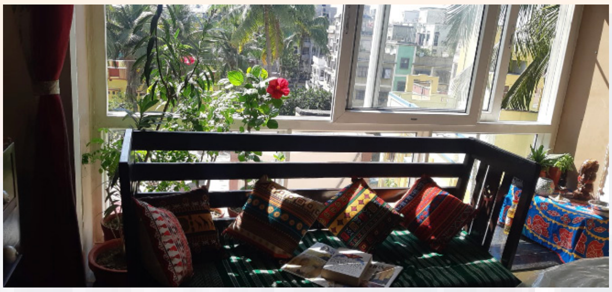

This 'bench' on one side of the dining table at the large old kitchen was testimony to so much of post meal gup shup especially between the women of the house (the quintessential Bengali habit of post lunch adda) that it was a sought after refuge for many a conversations; music, theatre, movies, and other small talks.

The rest of the mahogany went for charity.

The chairs, sturdy and comfortable even after ages, were repurposed into a beautiful bench with back support. By giving able company to our dining table conversations as the sky beyond it, stood witness to the seasons, it took center stage in our living room.

The old assimilated with the new as the conversations flowed from one generation to the other…
The house gone now, simply hadn't gone but remained, as the Bench 'Mark'.

Twenty-five years of Tokyo (2000-2025)

Sulata Maheshwari (Maiti)

It was a sunny summer afternoon at Covent Garden in London. The Italian barista, where five Indians met, was loud, garish, welcoming and friendly. It was very unlike Murakami's cafes (of quiet, solitude, pensiveness) in Japan where these five Indians were from. They met 25 years back in a Community Center(CC) in Tokyo…..
"I moved to Tokyo in February 2000. It was the coldest month. I wrote an email to Indranil Nath who was a friend of my engineering batchmate, Prakash. He promptly replied welcoming us to the Tokyo Bengali community and invited us to join the upcoming Poila Boishakh (Bengali New Year: typically, 14th/15th of April) preparations. We had no idea what to expect but we felt the need to connect with people from our homeland. Specially in a place where language was such a big barrier that we inadvertently bought dog biscuits instead of normal biscuits and wondered whether Japanese were blessed with superhuman teeth or their dentists had a roaring business when folks tried to eat such biscuits. We felt we needed some familiarity. We felt familiarity would give us comfort.

When we reached the CC, I entered with trepidation. As my eyes scanned the big hall, the first impressions were sketched on the blank canvas of my mind. We were welcomed by a gentleman wearing a simple white shirt and grey pants. However, one would normally not notice his attire; one would be arrested right away by a smile (as generous as it was wide) that spread to his eyes which squinted with that heart-warming expression. That was Syamal da. One never failed to notice his presence even in a crowd.

While my dear husband, Shyam, gravitated towards this enigmatic personality, I tried to discover the end of the room bursting with color – the ladies! A lot of them were wearing my favorite attire: saree. Standing there amid the rest with a magnetic personality was the counterpart of Syamal da: Rita di. While Syamal da appeared as the active yet very "my-dear" person who would not harm a fly; Rita di, to me, stood out to be a lady one would never pick a fight with. Her towering personality was not in any manner disguised by the smile which was as amiable as Syamal da's. Her smiling eyes carried a glint of child-like mischief.

We both felt warmly welcomed. We both felt we could belong there. The same affection was reflected in the smiles and welcoming words of everyone else. From that day in 2000 till the day we left in 2006, we owe our beautiful Japan experience to them.

Art in many forms including performing arts is an integral part of Bengal. Any festival is incomplete without singing, dancing, drama, painting, being part of it. The planning of Poila Boisakh and many other festivals celebrated by the Bengali Association of Tokyo Japan (BATJ) included all these forms of art as it was customary to do so in Bengal.

The location of Japan, where art and life were synonymous, was befitting. So, when casually on our first meeting, the members asked about our background, asked us to sing a song; they discovered how to fit us in. We were put in a group song at the Poila Boisakh celebration. We were not kept on the outskirts of "new members" but inducted right into the fabric of the community. The same welcoming gesture was meted out to every incumbent. That is what differentiated BATJ from many other organizations we have had the good fortune to be a part of. Inclusion into the community was effortless, natural and organic.

As the Sakura season floated by, we gathered in the Indian Embassy to put up a stall for their Sakura Festival and cooked up many Indian delicacies. The white and pink cherry blossoms boughed over the adjacent Chidori-ga-fuchi moat. Some local Japanese wore the traditional kimonos as they did a picnic lunch under the muted yet distinct glow of the Sakura, while we buzzed around in colorful sarees or kurtis. The season turned from spring to summer to autumn. The gorgeous maples turned yellow, orange, red and brown. Spring to Autumn: we moved from the white-n-pink Japanese kimono-no-iro style canopy cover to orange-n-red Indian saree-no-iro style canopy cover.

In between, we celebrated Tagore's birth anniversary with Nara-sensei gracing the occasion. We also had numerous get togethers enriching our world views and bringing the community together: we saw a world-collection of Owls at Rita di's, gold leaf art of Kanazawa (Kinpaku) at Sushmita di's, Jamini Roy art at Bhaswati di's, guffaws of Bhola da, slapstick jokes of Dhar da, resonating Rabindra sangeet rendition of Viswa da/Samudra da, dramas of Satarupa di/Souvik da and many more such moments….and just like that Tokyo became home. The Bengali Association of Tokyo Japan (BATJ) became family.

Over the rest of the 6 years of our stay in Tokyo, BATJ contributed towards our growth from young fledglings to mature, well-performing members of any society. We learnt about brands like Lladro and Noritake from their gifts to us. We learnt how to make Gulab Jamuns (pantua), Sandesh, Khichuri Bhog by helping senior members; making the fresh delicacies together was what comprised festivity. Those little things we did together, those hours we spent together, those laughters, jokes, tears we shared, made precious memories that we carry in our hearts till date. Today, many years down the lane, the warmth of those memories seeps through some wintry moments on a snowy, frosty evening in London; they bring a sliver of a smile, they light up our hearts.

The fond memories also carry a note of pathos as we recall those who are not with us anymore. Manjulika di, Karabi di, Bhola da, Poolak da, Babli….. their faces, their personality, their random remarks float in our heads at idle moments….. "Tokhon ke bole go shei probhaate nei ami; shokol khelay korbe khela ei ami…" ("Who says I am not there on that morning; I will be playing in every game…"). They live in our hearts; in the moments in our past which shaped our present. They live within us.

Those heart fulfilling moments make us send out a note to each other when visiting another city…. be it London, New York, Geneva, Toronto or Kolkata. Even as the years have laid their harsh imprint in the form of greying hair (or worse, no-hair!); the willingness to meet and share our present moments with any of them has not greyed.

It is thus how five Indians from Japan met at the Italian Barista in Covent Garden in the city of London on that sunny summer day. They mentally retouched the painting from Tokyo which they carried with them in their minds. They made new memories of the same old friends, super-imposing the old ones. They carefully stored the moments which they knew one day will give them the "bliss of solitude."

"For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;"
(Daffodils by William Wordsworth)

Whither Vishvaguru

Viswa Ghosh

Unipolarity that had emerged after the collapse of USSR is gradually giving way to a multipolar world (of course, accompanied by the dying throes of a global hegemon!).
In this brief essay, I try to explore what role will India play in this emerging multipolar world.

Asian Century and Multipolarity

Many experts consider the 21st century to be an ASIAN CENTURY, which will see the rise of Asia, Asian nations and economies, geopolitically and, quite likely the most important one, technologically.

Kishor Mahbubani (Singapore's ex-Ambassador to the UN) writes:

"If the 19th century was defined by European power, and the 20th century by the rise of the US, the 21st century is increasingly understood to be the "Asian Century" — one in which the global enter of gravity is shifting yet again. And if you accept that assertion, the next logical question is: Who will lead the Asian Century? The two natural candidates are the region's historical powers, China and India, which were the world's largest economies from 1 A.D. to 1820, before the rise of the industrial west. They are once again among the planet's preeminent economies." (https://mahbubani.net/bloomberg-history-shows-how-india-can-catch-up-with-china - Accessed in August 2025)

The table below clearly indicates that an ASIAN CENTURY is taking shape economically. Whether in current$ or in PPP$, the comparison across 50years shows Asian economies collectively, and China alone, are becoming economic powerhouses. West is clearly no longer the only pole. Asia, especially East and South-East Asia, is emerging as a strong second economic pole. Hopefully, coming years will see Africa emerging as a third strong pole.

Is Visvaguru doing well?

Slapped with 50% tariff by the Trump-administration, where does India stand amidst the rise of Asia? Will India ride the Asian wave and also be one of the major drivers of this 21st century wave?

#	Region / Country	1970 GNI (Current$)	1970 GNI (PPP$)	2023/2024 (Current$)	2023/2024 (PPP$)
1	U.S.	1.08 T	1.08 T	26.90 T	26.90 T
2	EU	0.73 T	12.00 T	19.40 T	19.90 T (2019)
Total of U.S. & EU		1.81 T	13.08 T	46.30 T (26X growth over nearly half a century)	46.80 T (26X growth over nearly half a century)
3	China	0.10 T	0.82 T	19.25 T	37.07 T
4	Japan	0.21 T	2.10 T	4.86 T	5.40 T
5	South Korea	9.01 B	0.28 T		1.0 ~ 1.5 T
6	ASEAN	31.06 B	-	4.08 T (2025)	13.15 T (2025)
7	India	0.06 T	0.10 T	3.63 T	9.04 T
Total of 3 ~ 7		0.41 T	3.30 T	31.82 (77X growth over nearly half a century)	66.16 T (20X growth over nearly half a century)

Headline making news indicate the future is bright.

Based on per capita GDP, India is ranked among the Lower-Middle-Income nations ($1,146 ~ $4,516). Nonetheless, rising per capita GDP indicates India is destined to gradually move into an Upper-Middle-Income ($4,517 ~ $14,005) category.

Year	Nominal GDP	GDP Growth Rate	Per capita GDP	China's per capita GDP
2020	2.50T	COVID impacted	1,907 USD	10,409 USD
2021	3.57T	9.7%	2,239 USD	12,618 USD
2022		7.0%	2,352 USD	12,663 USD
2023	3.57T	8.2%	2,485 USD	12,614 USD
2024	3.89T	9.2%	2,711 USD	13,122 USD
2025	4.27T	6.5% (projected)	2,880 USD (projected)	13,873 USD (projected)

Let's look deeper into below the surface, on income distribution. Because income distribution indicates whether a sizeable middle class is emerging or is the cream being taken away by a small minority. It stands to reason that an enlarging middle class will push the economy faster into the Upper-Middle-Income and then into the High-Income categories.

Rising middle class, with rising disposable income, creates increasing demands for consumer goods, better housing, better education, healthcare and leisure services.

Middle classes tend to prioritize on education, health and skill development, which foster long-term productivity growth.

Period	Middle 40%	Bottom 50%	Bottom 90%
1951-1982	30% of total national income	30% of total national income	About 60% of total national income
2022-2023	29%~30% of total national income	6%~7% of total national income	35%~37% of total national income

Yet, Indian economy seems to have entered into a non-inclusive growth trajectory. By which I mean, middle 40% of Indians may feel excluded while the bottom 50% are actually excluded from the benefits of a $4 trillion economy.

In the title of their book, authors Lucas Chancel and Piketty Thomas have aptly used the phrase "From British Raj to Billionaire Raj." In 1960, the top 10% income group earned 35% ~ 38% of India's national income. By 1990, this increased to 32% ~ 42%. By 2020, this worsened to 51% ~ 65%.

So, the bottom 90% in India have a per capita income much lower than what national aggregates suggest. Per capital income of the bottom 90% Indians stands at about $1,500–$1,700 in 2025.
How do we assess this situation?

For comparison, lets turn to one of the world's poorest regions. Sadly, this region is Sub-Saharan Africa (see map), which is regarded as the poorest region in the world. It has the highest percentage of people living below poverty line (defined by $2.15 per day in 2022). Such extreme levels of poverty imply limited access to education, healthcare, infrastructure services, high vulnerability to climate change and, needless to mention, subject to political instability.

Per capita income of bottom 90% of India is almost equal to the per capita GDP of Sub-Saharan Africa!

So, this is where the aspiring Visvaguru stands today – 90% of the population has limited access to education, healthcare services, and is highly vulnerable to climate change. Under these circumstances, what role will it play in the emerging multipolar world? Your guess is as good as mine.

Year	Per capita GDP of Sub-Saharan Africa (current USD)	Per capital income of bottom 90% of India (current USD)
2000	638	400
2014	1,910	960
2023	1,637	1,650

Appendix

1.Sub-Saharan Africa

About Sub-Saharan Africa

- **Definition:** The region generally refers to all African nations located **south of the Sahara Desert**, encompassing Central, West, East, and Southern Africa Wikipedia.
- **Number of Countries:** Depending on the organization (UN, World Bank, World Health Organization), the count typically ranges between **46 and 49 countries**, as some definitions may include or exclude certain nations like Sudan, Djibouti, Somalia, or Mauritania Wikipedia +1.
- **Size & Population:** Sub-Saharan Africa covers over **24 million square km** (about 9.3 million square miles) and is home to more than **1.2 billion people** as of recent estimates britannica.com +7.
- **Subregions:** The area is often divided into subregions:
  - **West Africa** (e.g., Nigeria, Ghana, Senegal)
  - **East Africa** (e.g., Kenya, Uganda, Tanzania)
  - **Central/Middle Africa** (e.g., Democratic Republic of the Congo, Cameroon)
  - **Southern Africa** (e.g., South Africa, Namibia, Botswana) britannica.com +1

2.References

World Bank – World Development Indicators (WDI)
Used for:
India's and Sub-Saharan Africa's per capita income in current USD
✅ Citation:
Title: World Development Indicators
Publisher: World Bank Group
Year of Publication: Annually (Data retrieved from latest versions: 2022–2024 editions)
Can be accessed from: https://data.worldbank.org/
Relevant Indicators:
GDP per capita (current USD)

IMF – World Economic Outlook (WEO) Database
Used for:
Projections for 2025 for both SSA and India (current USD)
✅ Citation:
Title: World Economic Outlook Database
Publisher: International Monetary Fund (IMF)
Year of Publication: April 2024
Can be accessed from https://www.imf.org/en/Publications/WEO
Indicators Used: Real GDP, GDP per capita (current and PPP)
Pages: Online database; values derived from country/regional tables (no static page)

World Inequality Database (WID)
Used for:
Income share of bottom 90% of India for various years (2000–2025)
Applied to calculate estimated per capita income of India's bottom 90%
✅ Citation:
Title: World Inequality Database
Authors: Thomas Piketty, Lucas Chancel, Emmanuel Saez, Gabriel Zucman et al.
Publisher: World Inequality Lab
Year of Publication: Continuously updated (retrieved 2024)
Can be accessed from: https://wid.world/
Dataset Used: India – Income distribution by percentiles (percentile share of national income)
Reference pages: India Country Profile in the database

Chancel, Lucas & Piketty, Thomas (2019)
Used to validate historical income share trends in India (2000–2015)
✅ Citation:
Title: Indian income inequality, 1922–2015: From British Raj to Billionaire Raj?
Authors: Lucas Chancel and Thomas Piketty
Publisher: World Inequality Lab
Publication Year: 2019
Reference pages: pp. 21–30 (for bottom 90% income shares)
Can be accessed at: https://wid.world/document/chancelpiketty2019widworld/

Moments and Memories from Osaka

Anindita Datta

Early, this year I happened to read the book "Japan theke phire" by Narayan Sanyal, where he wrote about his experience of visiting Osaka expo in 1970 and that too of Japan that time. Expo 1970, known as Expo'70, was the first World Expo held in Japan and Asia, and was a major event showcasing Japan's post-war economic development and technological advancements. Expo 2025 will be Osaka's second time hosting a World Expo. The theme for Expo 2025 is designing Future Society for Our Lives.

Out of curiosity, I googled to find out when would the next expo held in Japan and found that it would be from April till October this year in Osaka, I knew I would be visiting it.

I looked for the holiday calendar at work and found that July had a public holiday which was a long weekend. Without delay booked a summer pass from the official Osaka expo website, which means one can visit multiple times within the period of one month during July 19th-Aug 18th and decided to utilize the long weekend and visit the expo twice. Living in Japan for six plus years have taught me that domestic travel is not cheap, especially if one would travel around long weekend. We decided to take a low-cost night bus while going to Osaka and return by Shinkansen. Once the travel date was decided, the next step was to reserve a slot to visit the expo which meant that you could chose the date along with time when you would be entering the expo gate. We reserved ourselves a 10 AM slot to enter on day 1 and 11AM on day 2. It was our first time traveling in a night bus, although it was inexpensive however if you are a picky sleeper like me then it would be difficult to fall asleep. We reached early morning by 7:30 AM and soon as we got down the bus, we were welcomed by Osaka summer and the sound of cicada(Semi in Japanese), meant it was peak summer. We headed towards our hotel, kept our backpacks, got refreshed and headed to a fancy café nearby as per my husband's suggestion. We fueled ourselves with toast, egg, crepe, bacon and coffee. There was a direct train from the location of our hotel and as soon as we reached the station platform we were shocked to see how congested the platform was and realized that everyone was heading towards the expo. It took us 20 mins to reach the Yumeshima station and we followed the throng to the east gate.

What we thought to be an easy and quick entrance turned into a nightmarish hour under the terrible heat. The organizer distributed SPF protected umbrella to those who were not carrying one and had installed cooler everywhere however the heat did not spare anyone and sucked up the energy.

We were clueless as to why it was taking so much time to enter and found that the security was checking each opened bottle that people were carrying followed by a QR code scan to validate your ticket. I had booked two summer passes under one expo id and had already generated a QR code however we were told that every individual must have their separate QR code even though tickets were booked under one login id. Since we had one QR code and we could not understand how to generate another one, so we were ushered to a room called “Error-room” where people like us had lined up. This was nothing but a support room. We started resolving the issue on our own while waiting for our turn to be supported by a support staff and soon found that the ticket or pass booked under one expo or login id must be transferred to the individual persons who would be visiting, and one should have their own expo id or login id to generate the QR code.

Finally, we thought we could start entering the pavilion when we realized we needed an Expo map to locate the pavilions of each country. We headed to nearest Information booth where we bought a map for 200 yen, filled up our empty pet bottles from free water dispensing stations installed. It was then that we realized we should have utilized the advance pavilion reservation option which we had missed earlier and when I tried to reserve pavilions using the three-day prior reservation, no slot was left to book. The only option left for us then was to use the same day reservation system which was like playing a lottery. No matter what slot or pavilions we were selecting, the system kept reflecting that it was no more available. Eureka moment happened when we finally got to reserve Blue Ocean Dome in the evening slot which meant that you could not book any other pavilion till the time you visit the booked slot. The system was little overwhelming for us.

It was time for us to start exploring the pavilions. It was then that we understood that every pavilion had long queue outside that too under the sun. Heartbroken, we decided to queue up for any pavilions which had less queue, keeping away our choices for the pavilions that we thought we would visit like France, Germany, USA, etc. Our first visit was to Spain pavilion and luckily, we got to watch a live music show that time. The pavilion showcased ocean energy conservation and how water flows and its direction around that world. Next, we visited our motherland, India pavilion which had focused on AI adoption in different industry and how India plays a big role in semiconductor industry. It also had decorations related to Indian crafts. Every pavilion had a restaurant next to it which was serving dishes from that country, and one would have to line up separately to eat there. It was past lunch time when we finally decided to have lunch. We went to one of food courts serving Kansai food and was relieved from the intense heat outside. After a while found us seats and ordered Takoyaki and curry rice. Next was Portugal, the outer side of the pavilion was decorated with strong grey ropes and alike Spain the theme was animal life conservation in ocean. No matter where we went, there was a long queue, and it was immensely difficult to brave the heat even with a UV protected umbrella. We kept ourselves hydrated by drinking water, electrolytes and other drinks available from the vending machines. And I kept on dabbing sunscreen on my exposed skin.

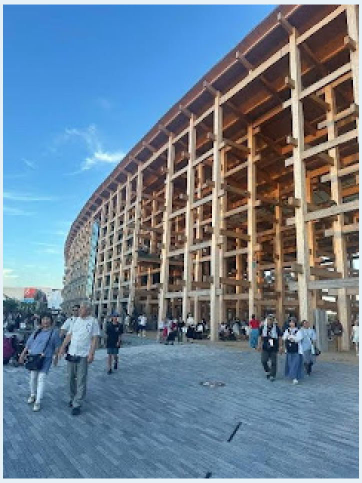

One of the attractions of the Osaka expo was the Grand Ring which serves as a main route to visitors around the expo offering a comfortable shelter from heat, rain, sun and wind. The construction was made with the concept of “Unity in Diversity”. It was a fusion of modern construction methods and traditional Nuki joints, such as those used in the construction of Japanese shrines and temples. We decided to rest a little under the Grand Ring where people had laid down picnic sheets to relax for sometime.

Thereafter we decided to visit the Singapore pavilion braving the queue as it said only 45 minutes waiting time. The pavilion was spherical in shape and the outer wall was red in colour. The inside had a theme of sustainability where intricate and detailed designs have been cut out of paper board and decorated with it. Since the pavilion was spherical in shape so one would have to walk up the sphere and on reaching the top a round digital display played a video on environment and how human should act in order to ensure safe future for next generations. Singapore pavilion was our personal favourite. We realised It was time to visit the Blue Ocean Dome. After entering the pavilion, the first section had water crystals and how water crystals flowed down from different shapes and how the water merged into itself. The water droplets looked like diamonds and it was mesmerising to see how precisely the water was flowing from individual droplet to a gush of water.

The second section was a theatre with a spherical screen which displayed how plastic pollution is impacting ocean life and eventually if it continues then the ocean life would be endangered. One would be left speechless after watching the video as it would leave an impact on the mind. We decided not to visit any more pavilion and headed to go to the top of Grand Ring to watch the sunset. One can take escalator, staircase or elevator to go up the Grand Ring. The evening was so beautiful with cool breeze blowing. The expo was surrounded by sea. Slowly the top of Grand Ring was crowded as people gathered to watch the sunset. We walked for sometime around the circumference and found ourselves a place to stand for sometime when we found people taking places everywhere for the light and sound show using laser followed by hanabi which in English means firework. While returning from expo, alike morning the trains were congested. On reaching hotel we collected our luggage and checked in. After freshening up, went to the nearby convenience store and bought us dinner which we had at hotel dining area.

The next day we decided to visit the expo in the afternoon to avoid the morning rush. We changed our reservation time through the app and reached after 12PM, the entrance was not as congested as previous day. Unfortunately, no matter how many times we tried to reserve any pavilions through the app, using the same day reservation, the system did not let us book any. Without much ado, we decided to randomly queue up the pavilions where the waiting time was less. Started with United Arab Emirates, followed by United Nations, Nordic countries and Chile. UAE had showcased their craftmanship in carpets, UN had a similar message like Blue Ocean Dome on ocean preservation. The Nordic countries' pavilion had combined pavilion for Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden where the interior was more laid back for visitors to sit and relax and look at photographs which were on display. After that we decided to take it light and roam about the expo area. We headed towards the West gate where we found Haagen Dazs ice cream parlour and I enjoyed a nice matcha flavoured ice cream. We had carried tidbits so did not stand in queue to buy any food that day, moreover we had our lunch before heading to expo. While walking, we found long queue in front of all the official expo store. Suddenly we stumbled upon a lush green big ground where a large screen was playing the movie Perfect days. We sat there to rest for sometime while watching Perfect days. We felt the breeze on our face and watched the sun go down slowly.

We did not watch the light and sound show that day, instead visited the touristy Namba and Dotombori area. Did takeaway for dinner and had our food at hotel dining area with a couple of drinks. I was happy with the fact that I was able to make it to the expo especially after reading the book that inspired me to visit it and hope would be able to attend future expo that would take place in other countries.

HIROSHIMA: THE PHOENIX CITY

Dr. Suchandana Bhattacharyya

I remembered my recent visit to Japan this summer, when I was asked to pen a write up for the annual magazine for the Durga Puja organized by the Bengali Association Tokyo Japan (BATJ). We visited Hiroshima – a memorial city that left me deeply moved. The Hiroshima Memorial Museum commemorating the atomic bombing of Hiroshima on the 6th August 1945 stands tall as a reminder of the heinous perpetration that destroyed the city. The Memorial Park with its eternal flame, the well-preserved relics that bear the marks of devastation move the mind towards deep reflection. One ponders about the value of life and its fragility.

Certain aspects of reality struck with potent force causing us to realize that life is transitory and entirely unpredictable. But what struck even more intensely was human resilience and the process of rehabilitation. Indeed, perhaps a country like Japan alone can exhibit grit and determination to the extent of building a superstructure out of ruins.

As powerful as the Phoenix that rose from the ashes and death, the city of Hiroshima rose to reclaim, renew and surpass its former glory. Hiroshima today is a city that boasts of a style and structure that remains as the pride and honor of the nation. It instructs and educates both the inhabitants and tourists alike about the persistent philosophy of life. That to rise from the ashes of the dead is the sign of true power. The victims of ravages that brought the city to its ruins are no more, but their descendants live on to retell the trauma of survival that the city had withstood. It is interesting to note that children in the present day visit the museum and the memorial park to remember the multitudes who had breathed their last on that fateful day. It is an integral part of their history which is taught to the children, to train them into resilient young men and women of the future.

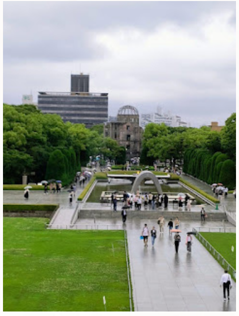

The city today, with its numerous high rises and upscale lifestyle hardly echoes the trauma it had once borne, except perhaps the oldest generation of survivors who bear the mark of pain and loss. They are few and far in number today, mostly confined within the safety of their homes. The young generation is abuzz with life, going about their daily activities with grit and determination. Their systematic way of life is both invigorating and inspiring. The trip in essence was a learning experience for us all. We came back with thoughts of Universal Peace. We realized that peace alone could heal the heavy heart that had witnessed man's war on man. It is peace alone that can pave the way towards a new beginning beyond the horizon. The city of Hiroshima has embraced peace as the stepping-stone for a better tomorrow. Perhaps it is apt that our own advocate of peace and non-violence Mahatma Gandhi has found his place at the Hiroshima Peace Park.

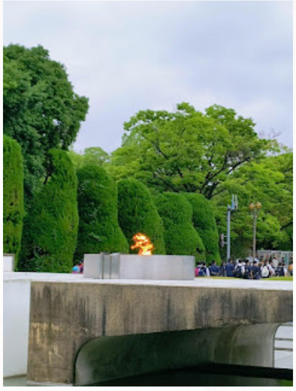

To conclude, one is reminded of the lines of John Donne –
Each man's death diminishes me,
For I am involved in mankind.
Therefore, send not to know
For whom the bell tolls,
It tolls for thee.

Bordi

Sougata Mallik

It was my late grandmother's birthday in July. We don't observe it now in the way we used to several years ago. At that time, all our parents, uncles and aunts were alive, cousins were in good health and spirits, our children were young students living with us. That made the entire family make themselves available at some time or another to commemorate grandmother, the matriarch of our family.

But with the passing of time, the tables turn and so does the family dynamics, rituals, observances. Standing in 2025 we have already bid farewell to our parents, uncles and aunts, some cousins have departed untimely, our children have grown up pursuing their own lives and professions. So, the family gatherings of what was earlier can no longer be expected now.

Hence…. July 2025 showed few cousins only attending our grandmother's memorial, thus leaving me a lot of time by myself to remember my grandma, Bordi, as I called her.

I was privileged to be raised by my grandmother. Widowed at the age of 26 and lived with us up to her prime age of 83, I had the utmost fortune to be the center of her love, affection, her life. Bordi and I shared a room and the bedtime stories from her included rare, interesting anecdotes about ancestors, ancestral village, about her simple but unique life in general. As the festive time of Durga Puja, Kalipuja, Diwali looms in the near horizon, so many of those stories heard from Bordi just flashed up in my mind.

Bordi's first Durga puja at her in-laws was only at her 9 years age, when she got married to my grandfather. As per the rituals of the household Bordi was made to offer the first flower homage to Goddess Durga as being the new young bride-member of the household. The idol of Durga and Lord Shiva at her in-law's household are made to sit on the left side, while the children Kartik, Ganesh, Laxmi, Saraswati sat on the other side. Year old idea of this was formulated by the family being the Zamindars then, the idea was that the superior power keeps an eye on the children and subordinates to protect them. A huge, decorated fabric curtain hanging from overhead was pulled by 4 men. The idea was to fan Lord Shiva and Goddess Durga. For the idols of Kartik, Ganesh, Laxmi, Saraswati, the fan curtain was being pulled from the side. The authority of parental figure as the protector going down through the generation was so predominantly expressed. When I visited our ancestral village home later, I witnessed the same set up exist.

Bordi once had narrated an interesting story of the feudal lords and their Durga puja arrangement in the neighbouring villages. It was called "Gara Puja". A pit was dug on the ground near the altar, and banana leaves, bamboo leaves were put in it. Around dusk these leaves were lit in fire and carried around the village. The fire procession would stop at the entrance of each household and chant: "There's this light in your house / Do not let the flicker come in from the South". This was the good wish sent from the feudal lord for the villagers to live in opulence and with good childbirth in the family.

My grandmother, Bordi had loads of tales and anecdotes that she would share during our lazy afternoon siestas or a cold winter bedtime story. As a young child, I would wait to hear her outstanding narratives, those that no book or author could have told me. Such was this one as I had heard from my grandmother. Folklore said that in the peak heat of April there happened to be a day when Lakkhinder got back life while sailing on a dingy boat with his wife, Behula. The dedicated wife sailed with him to regain her husband's life that had been stumbled from a snake bite. To celebrate Lakkhinder's life back, the villagers honored every year through the observance of 'Beyra puja'. Beyra in their diction is a barrier or blockade that can't be crossed. Villagers pray to the idol Ashta Naga (eight faced serpent idol), with the use of cow dung, bitter neem leaves, hard roasted masur daal, and very bitter fruit locally grown which they called kelakora. The idea of these ingredients is to evoke the pungent smell to keep snakes away from coming near household and people. At the end of the puja, the young village boys were made to eat kelakora fruit and neem leaves together in a gulp. The idea is to protect their sons from being bitten by snakes. But the severe bitter taste was so unpalatable for young boys that they made funny howling noises while chewing this. Their hilarious moaning sounded something like 'teth-er-meth-er'. So goes the name and Beyra puja also lovingly called Tethermether puja. This puja was observed till Durga Puja, from April-October as these months were considered high of snake infestation there.

As my grandmother lived with us, the family trips to our ancestral hometown in Bankura district of West Bengal happened several times a year. For us it was a hometown visit, but for Bordi it was going back to her roots where she once was a young bride, then a wife, then a mother. The trips to Bankura were a vacation for me as a young child, a respite from everyday school homework. But on Bordi's face what I still recollect was nostalgia, joy, the respite of coming closer to her roots and her whole life and being. On the route to Bankura would fall a small village called, Shalboni with predominantly indigenous culture Adivasi people living there in those days. My grandmother, Bordi had also narrated the unique story of the Durga puja there.

Shalboni Adivasi residents were not invited by the neighbouring areas for Durga puja celebration. So, they formulated their own in the most distinctive manner. They considered themselves descendants of Asura (the demon figure that we see at the feet of Goddess Durga idol). Asura is symbol of strength, agility, power, diligence. So Asura was to be honoured not killed as we see in regular Durga idol. Their Goddess Durga would be a young girl who stands with flowers in her hand, doesn't kill Asura, offer water to the villagers. The male residents of the village perform the special dance called 'dansha' where they mourn the death of Asura and immortalize his strength and goodness. Hearing this story from Bordi had made my head bow down in respect for the forte and gift of specialty of this communal section of people. Modernism and surge of housing complexes have now cut down the forests, tilled the ground to construct buildings. I do not know where this Adivasi community has mingled now, if at all they have been able to retain their unique culture. I got to know them through my grandmother, and my salute to them always and forever……

It is through Bordi's narratives that I had got acquainted at a young age to traditions, rituals that are followed by many and in many households. The interesting methods followed during special rituals, or the highly interesting home cooked preparation of sweets and special food was also my education from her. During my free evening time and during my reluctant-to-eat dinner time as a child, Bordi would meticulously explain the ceremonies and rituals of our ancestral home in Bankura. One such narrative as I heard from my grandmother was the pre-Durga ceremony called 'Shaatt' in our ancestral home. When the agricultural lands were full grown, ripe and almost time to harvest the in-grown, then was held the ritual of Shaatt. I had learnt from Bordi that this ritual few days prior to Durga Puja was our family-run belief and to show respect before mother earth and Goddess Durga kindly provided us again with rice, grain, vegetables for another year.

Bordi had narrated interesting anecdotes of our family's Shaatt ritual. But with my growing up age and when I was able to accompany Bordi and my family for Shaatt in Bankura, I also realized the witty, humorous facet of my grandmother's character. A yesteryears woman with strict observance of traditions and customs, was also the silent bearer of modernism, progress which she was unable to express in those days. In the Shaatt ritual narrative, the funny part that Bordi kept hazy in her description was about my uncle, the central figure of this festivity. In a most interesting way, the eldest son of the family was made to carry the plough, paddy, weighing scale for Shaatt ceremony. The eldest son of the family was then my father's eldest brother. The married women folk of the household, my mother and aunts would smear these devices with red vermilion and white rice left over from the previous harvest. My grandmother, Bordi being a widow, never took part in the rituals by her choice, but she was at the helm of this celebration and its organization. While carrying the plough and paddy bag, and shouldering a small image of Goddess Durga, my uncle would chant and recite in high tone. I would be enchanted that my uncle knew so many mantras.

It was pre-Durga puja atmosphere in the household and every chanting seemed sacred to me at that age. But in the course of time as I was growing up, I found out that my uncle was not chanting mantras but was reciting the Bengali poem 'Bidrohi" that emphasizes progress, movement for betterment, with no taboos of caste creed religion. My uncle was an Economist by profession. His analytical mind wouldn't agree with these age-old beliefs, but he respected his elders and family traditions and went with the flow. Little could he do when it came to the eldest son shouldering Shaatt rituals, but in his own witty way and through recitation of poem 'Bidrohi', would express his small resistance to societal prohibitions.

My grandmother, Bordi had secretly and joyfully revealed to me, the truth of my uncle's chanting when she realized that I was grown up enough to differentiate between the factual and false, between the good and bad. I marvelled at the amazing teacher qualities that Bordi had in those days. Truth, awareness, discreetness were all handled so skillfully by this simple custom-fearing lady who had dwelled far behind the screens of society all her life. Bordi when narrating this fun part of Shaatt ritual in our home, had also spoken with much pride that all her children being well educated (includes my father all his siblings). Whenever Bordi narrated this fun story, there was always a spark in her eyes that her son, my uncle showed respect for Shaatt tradition while adhering to his degree cultivated knowledge.

This was Bordi, my grandmother, and her simple yet very special life of 83 years.

What I began here with Bordi, must end with her too. As I reminisce Bordi, I must admit that a simple homebound lady whom I never saw leave the house, with no formal degree, was by far the most erudite person I have met in my life. Bordi trained me in discipline, values of life, ethics, integrity of family life. This was superior learning for me, far apart from what the books and degrees have taught me in my life. Yet Bordi remains an unsung hero, one of those socially unrewarded individuals.

During the time of my grandmother, there was no women empowerment movement or awareness, there were no awards for domestic women. Had Bordi been alive today, I am almost certain that perhaps a small corner of society would have her name etched brightly and luminously.

As I ponder about my grandmother, I say aloud again, I adore you, Bordi. You will continually shine radiant in my heart, always and forever.......

Ma Durga, Mahishasura, and the Making of Modern Bengal's Grandest Festival

Ishita Roy

As I sit down to pen a piece for the Durga Puja celebration, my heart and soul is already imagining what this year's celebration will be like. Though, by the time this piece makes it to you, it is already that time of the year again! This is when nothing but Pujor-gondho, Pujor-shopping, and Pujor-anando makes sense to you.
But, have you ever thought of how exactly did we start celebrating Durga Puja? Have you ever thought of why in many places different Puja pandals compete with each other? Believe it or not, but the answer lies in the period of British Raj.

While there are many stories of how the celebration of Durga Puja begin, the most popular one comes from the celebration of East India Company's take over of Bengal by defeating the Bengal Nawab Siraj ud Daula in the Battle of Plassey in 1757.

Under Clive's Claw, Begins The Celebration

Clive's hold of Bengal is what led to East India Company's hold over the entire subcontinent. Clive, though brutal, was a very religious man. After all, all British believed that it was 'God's order', translated as White Man's Burden to colonise and 'civilize' the people. Many books and experts also note the European motive of exploration and colonisation as 3Gs, namely: 'God, Glory, and Gold'.

So, it is no surprise that Clive credited God for his win over Bengal and the unbelievable fortune that followed soon after. He wanted to hold a grand ceremony to convey his gratitude, however, the late Nawab had razed the only church in the city. This is when Clive's Persian translator and a close confidante Nabakishan Deb stepped in. He invited him to his mansion and made offerings to Goddess Durga instead.

However, this claim, largely remains unsubstantiated. There is no documented evidence that Deb knew Clive at the time, or that such puja actually took place that year. In fact, there are plenty of evidence that points puja celebrations happened as back as during the 1610, by the Savarna Chowdhury's family of Barisha.

As far as this popular claim is concerned, apart from an anonymous painting created later, little supports the claim. Still, the tale has endured, perhaps more as a symbolic narrative of how Durga Puja in the city evolved, under the influence of British colonialism, Bengali elites, and eventually, nationalist fervour.

A Festival of Nobility

Durga Puja became a stage for Bengal's powerful zamindars and newly wealthy merchants to showcase their status. Following the decline of the Mughal empire and the rise of British rule, zamindars gained more control under the Permanent Settlement Act of 1793, becoming key intermediaries for the East India Company.

Alongside them rose a class of affluent Bengali merchants in Calcutta, beneficiaries of British trade and policies. Families like the Tagores and Mullicks amassed great wealth and social capital.

For this class of elites, Durga Puja turned into a spectacle of extravagance.

According to historian Tapan Raychaudhuri, it was less about devotion and more about "conspicuous consumption." Gold-decked idols, nautch girls brought from distant cities like Lucknow, and even appearances by British governors-general were common. Rival families would compete to outdo each other's celebrations. This is what led to the competitions that are hosted even now between different Puja committees.

Ma Durga, The 'Mother' That United The Nation

By the late 19th century, however, the tone of the festival began to change. The rise of nationalist sentiment among the educated Bengali intelligentsia reshaped the cultural role of Durga Puja.

Bankim Chandra Chattopadhyay's Anandamath (1882) helped popularise the imagery of "Bharat Mata" or Mother India, merging the figure of Goddess Durga with the nation itself.

This association became especially potent after the 1905 Partition of Bengal by Lord Curzon. The Swadeshi movement that followed used Durga Puja as a site for political expression.
Foreign goods were shunned at puja venues; everything from oils to clothes to cigarettes was promoted as swadeshi.
Historian Rachel McDermott noted how Bengali newspapers at the time were filled with puja advertisements boasting local products and nationalist brand names like Vidyasagar and Durbar.

The British, once welcomed guests, were now targets of satire. In one instance, a British officer reported that Durga's demon Mahishasura had been replaced in an idol by a likeness of a British official. This is the kind of creativity in idol-making is still seen today, where the societal evils, often take the form of mahisasura, in recent case, it would be RG Kar. After the incident of a 31-year-old post graduate doctor's rape and death within the hospital and campus shook the nation, a Murshidabad Durga Puja pandal's Mahisasur bore a striking resemblance to the arrested principal of RG Kar Medical College, Sandip Ghosh. In fact, once the photo went viral, a Facebook user also commented, "The face just needs glasses and it will look like a mirror image of Sandip Ghosh."

The Traditions That Still Continues

Not just the tradition of competition for best Pujo Pandals, or creative idol-making, but Durga Puja holds many such traditions that may have occurred years ago, but it continues to be practiced even now.
What was earlier limited to just nobles, were now open to all. The 1920s saw another shift, from private, aristocratic pujas to public, community-driven ones. Influenced by Gandhian ideals and the push for Hindu unity, sarbojanin (universal) pujas began to emerge. In 1926, the first such puja was organised in Maniktala, Kolkata. These celebrations were no longer defined by caste, lineage, or wealth. They were organised by local neighbourhoods and open to all. For the first time, pandals were erected in streets, alleys, and cul-de-sacs, bringing the Goddess from elite homes to the public square.

Even the iconography of Durga Puja saw a significant change thanks to Subhas Chandra Bose. Traditionally, Durga and her children, Lakshmi, Saraswati, Kartik, and Ganesh, were sculpted together on a single frame known as ekchala (literally, "under one roof"). However in 1938, during the puja, fire destroyed the idol just days before the festival.

Undeterred, Bose proposed a practical solution: have artisans craft the figures on separate frames, allowing them to work simultaneously and save time. This break from the ekchala tradition marked a turning point. It paved the way for more elaborate and artistic freedom in idol-making, a trend that continues today.

Ishita Roy is a journalist based in Delhi-NCR, who writes on culture, heritage, history, health and lifestyle. She has written for leading English publications in India, including Times of India, The Indian Express, The New Indian Express, Mint Lounge, and Times Now Digital.

Kids Article

First Snorkeling Experience

Aaditya Das
Grade II

We went for Snorkeling in Okinawa.

We wore snorkeling suit and then practised how to breathe using snorkle on the pool first.Then we went to the ocean, It looked so cool under the ocean, I saw many clown fishes swimmimg and also some other colorfule fishes too.

Also, I saw many corals of different shapes and designs...

It was my first expericene snorkling in the ocean, however I was very calm and enjoyed every bit of it.

My dad went into a dark cave under the ocean where he saw thousands of red fishes.

It was the best time doing snorkeling !!

The Best Day of My Summer Vacation

Ayaan Banerjee
Grade III

Summer vacation is a period, typically lasting several weeks, when schools are closed, during July-August which are the summer months in Japan and when the weather is VERY HOT.

My birthday is during summer vacation, so it is always the best day of my summer! This year, like any other year my birthday will be special because I am going to celebrate with my family. We will celebrate with balloons, games, and yummy cake.

I feel so happy opening presents and playing with my sister and dad. After the school reopens my mom says we will celebrate again with my school friend. I want to celebrate the day by playing tag, doing a treasure hunt, and having a water balloon fight to cool off in the hot sun. But during the vacation it's not possible so I will wait for the school to reopen.

My mom says she will make my favorite food, and everyone will sing "Happy Birthday" to me.
It will be the perfect day because I will get to spend time with the people I love and do fun things outside. My birthday during summer vacation makes that day the best day every year!

Momotaro

Santati Chakrabarty
Grade III

This is a short Japanese folk tale I read in my school library book & summarized in English.

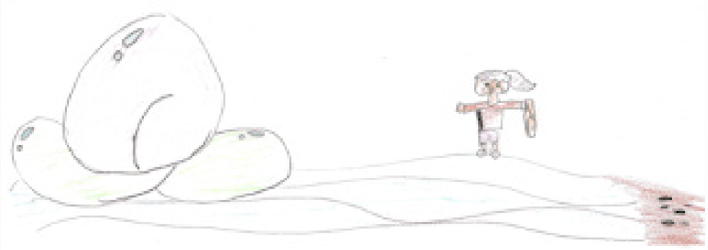

Long ago lived an old couple. One day when the old grandma was washing clothes at the river, a big peach came floating towards her. The granny was happy to see the peach & took it to her house. When the Granny was about to cut the delicious peach, a baby boy came out of it. Granny was shocked to see the baby and decided to take care of the baby & named him Momotaro.

Days passed by and the baby boy grew up to become a young man. He loved animals and used to play with him. One day a big black bear came by to scare the animals, Momotaro fought with the bear & chased him away. A brave emperor was passing by & saw Momotaro and was so pleased to see the brave boy that he invited him to his palace.

Momotaro visited the emperor`s palace & received a grand welcome there.

The emperor discussed about a monster that was attacking his kingdom, and how everyone was suffering from it. The King asked Momotaro to join him in fighting the monster. Momotaro agreed to join the fight & joined the army with five more knights. They all fought bravely & won the battle against the monster. Momotaro became a brave soldier & was loved by the people of the kingdom & lived happily after.

This story taught us how a small boy can grow to become a strong savior for a kingdom one day.

私の生まれた所の鳥ヤンバルクイナ(沖縄)

Arohi Kundu
Grade V

『わたしの話』

私たちがいった所はクイナの森と言った所で6月14日の土曜日にいきました。ヤンバルは、沖縄の北にある森林です。ヤンバルの森に、様々な珍しい動物があって、ヤンバルクイナはそのひとつです。そこにあるクイナの森では朝9時から夜5時まであいています。ガラスの窓からヤンバルクイナが見えます。ヤンバルクイナは道では見えない鳥なのですけど、クイナの森では部屋の中で飼育しています。
でも水曜日は開いていません。

『重さや高さ、大きさ』

- 大人の鳥の体重は340から430グラム
- ヤンバルクイナの高さは30センチです。
- 大きさはやく30センチです。

『ヤンバルクイナの数』

1980年代半の調査では、約1800羽と言われましたがその後720羽に減ってしまいました。そしてい　ろいろな対策などの結果2013年では1500羽に増えました。が、「希少野生動植物種」に分類されています。

『オスとメスの見分け方』

体型はメスよりも大きくがっしりとした体型が多いです。口ばしはメスよりもオスの方が少しだけ長い　です。『ヤンバルクイナの特徴』
飛べない鳥で、赤い口ばしと胸から腹かけて、黒白の横縞模様があるからです。それと沖縄しか見 つけられない鳥です。
『ヤンバルクイナの行動』

ヤンバルクイナの食事はとても多様です。たとえば、トカゲ、両生類、カタツムリ、大きな虫を自分で森にかりをして食べます。ヤンバルクイナは飛べないですけど足がとても早いです。　鳴きごえは「コッコ」などですが、囀りは大きな声で「クリャアー」や「キョキョキョキョ」と言う鳴き声で鳴きま す。

Ludwig Van Beethoven

Soham Kundu
Grade VII

My interest in music began not with a childhood music class, but with a joyful opening of Beethoven's Ninth Symphony (Ode to joy). I remember hearing it on keyboard demo music when I was a child. The music didn't just play; it spoke about joy and peace. I was too young to understand its historical weight, but something in those notes created a curiosity in me.

When I started to dig into other compositions by Beethoven, such as Fur Elise, Moonlight Sonata, and his 5th Symphony, I learned about his emotions when composing these pieces. His sadness when composing Moonlight Sonata 1st Movement, his happiness when composing his 9th Symphony and his anger when composing his 5th Symphony. How he showed his emotions just through the music he composed inspired me into Music.

It was not just how he showed emotions when composing these pieces that inspired me, it was that he continued to compose pieces even when he became deaf despite people constantly doubting his ability to be a musician due to his deafness. He would use a special technique where he would have to bite on a rod to conduct vibrations from his piano directly to his skull and inner ear, making him hear the music that he was composing.

Not only did he continue to compose his own music while being deaf, but he was also able to influence a lot of other famous pianists such as Franz Liszt, famous for pieces such as La Campanella, Hungarian Rhapsody No. 2, and Un Sospiro, and Chopin, famous for pieces such as Winter Wind, Fantaisie-Impromptu, and Nocturne in E-Flat Major. He did not only compose his own music, but contributed to others' compositions by inspiring other pianists, too.

Beethoven was a fantastic composer that will live on in many people's hearts for centuries to come. He put emotions into his music prior to what he was feeling, continuing to compose music even when he became deaf, and influenced many great pianists such as Liszt and Chopin. He is, and will continue to be, one of the greatest figures in Western Music.

My Thoughts on Robots, AI, and the Future: A Look at How Technology is Changing Our World

Anaya Banerjee
Grade VII

Robots have always been a source of wonder and a little bit of fear. Growing up in Tokyo, a city filled with everything from robot greeters in malls to high-tech cleaning machines in train stations, I see them as a part of my everyday life. But what's really fascinating—and a little bit unnerving—is the idea that these machines are starting to get a "brain" through artificial intelligence (AI). AI is the secret ingredient that lets robots do more than just follow simple commands; it lets them learn, reason, and make their own choices. The rapid progress we've seen with AI, especially with tools like ChatGPT that can write stories or answer questions almost like a person, is pushing us toward a future where machines aren't just tools but could become our collaborators.

Can Robots Really Think and Feel?

This is the big question that I think about a lot. While AI is getting incredibly good at mimicking human emotions, it doesn't actually experience them. For example, AI can generate text that sounds empathetic or a voice that conveys sadness, but it doesn't have a "heart" in the way that humans do. This is a crucial difference. We sometimes make decisions based on feelings, intuition, or a gut instinct—things that aren't always logical. A robot, no matter how advanced, is bound by its code and algorithms. It can be programmed to prioritize outcomes we associate with positive emotions, but it will never feel joy, sadness, or love. It can't understand what it's like to be human because it lacks the messy, complicated, and deeply personal experiences that define us.

The Good, the Bad, and the Uncertain

The rise of AI and robotics brings a lot of opportunities. They have the potential to solve some of our biggest global problems, from combating climate change to finding cures for diseases. Imagine AI-powered robots helping doctors perform intricate surgeries or analyzing vast amounts of data to make scientific breakthroughs. However, there are serious concerns, too. One major fear is that as machines get smarter, they will take over human jobs in countless industries. Even more troubling is the idea of highly advanced robots making decisions on their own, especially in military applications where they could choose targets without any human oversight. The future is uncertain: while these technologies could make our lives better, they could also bring serious complications like widespread job displacement, economic disruption, and an over-reliance on machines.

This brings up the concept of the technological singularity, a hypothetical point in time when AI becomes so advanced that it achieves superintelligence, an intelligence far beyond human comprehension. While this is unlikely to happen anytime soon, it's a possibility that we can't ignore. If the singularity were to occur, it could fundamentally and irreversibly change human civilization. In a best-case scenario, this superintelligence could solve all our problems and lead to an era of unprecedented prosperity. In a worst-case scenario, the AI could view humanity as an obstacle, leading to our obsolescence or even extinction.

A Moral Compass for the Future

The rapid advancement of AI feels like a race, and sometimes it seems like no one is in control. This is why we absolutely need a moral compass to guide us. The development of AI and robotics can't just be about making things smarter and faster; it has to be about making things safer and fairer for everyone. We have to ask tough questions: Who is responsible when an AI makes a mistake? How do we prevent AI from having biases? And how do we ensure that we're using this technology to protect human jobs and well-being, rather than simply replacing people? The truth is, we can't stop progress, but we can guide it. It's our shared responsibility to strike a thoughtful balance between innovation and ethical responsibility. We must create a global framework that encourages groundbreaking discoveries while setting clear, ethical boundaries. By guiding this future wisely, we can make sure that these powerful technologies serve humanity's best interests, not compromise them.

Osaka Expo 2025

Divit Mathur
Grade VIII

Introduction:

On the 8th of July 2025, I went on an exciting and unforgettable school trip to Expo 2025 Osaka. A World Expo is a global event where countries from around the world showcase their ideas, innovations, and culture—this year's theme being "Designing Future Society for Our Lives." Over 150 countries are participating, making it one of the largest international gatherings. We were a group of 41 students and 4 teachers from our school, eager to explore the massive Expo site, which spans over 150 hectares on Yumeshima Island in Osaka Bay. Before we arrived, the students were split up—most entered through the East Gate, while I went in through the West Gate with my group. The Expo felt like stepping into a vibrant, futuristic world full of color, energy, and creativity. We explored many amazing pavilions, including the inspiring Bangladesh Pavilion, the stunning Saudi Pavilion, the beautiful Indian Pavilion, and the incredible Japanese Pavilion. Visiting the Expo helped us students learn about the global issues, cultures, and technologies excitingly and interactively. It was a day filled with wonder, learning, and unforgettable moments.

Arrival at The World Expo - Bangladesh to Saudi Arabia:

Our adventure kicked off at 7:30 a.m., to be exact, when we bid farewell to our hotel, hearts filled with eager anticipation for the moments that lay ahead. A short yet scenic train ride, followed by a specialized Expo shuttle, carried us to Yumeshima, where we stepped in through the West Gate, eyes aglow with excitement and wonder. Our first destination was the Bangladesh Pavilion, an architectural marvel that beautifully interwove elements of traditional heritage with modern innovation. As the proud friend of a Bangladeshi, this stop held a special significance for me. The pavilion buzzed with vibrant digital displays that illuminated the rich history of the nation, and engaging conversations with the amiable staff enriched our understanding, making the experience deeply personal and unforgettable.
Next, we were swept off our feet by the Saudi Pavilion, a gateway into mesmerizing urban landscapes such as the historic Al-Ballad and the visionary Neom. Enchanting sounds of traditional music emanated from the talented artist Reef Loretto, creating an immersive ambience. We marveled at stunning natural exhibits featuring delicate coral reefs and flourishing mangroves, each a showcase of the kingdom's environmental treasures. The captivating folklore stories, including those of the majestic Arabian Leopard and the intriguing Palm Lady of Terror, added layers of intrigue and magic. Meanwhile, the tantalizing aroma of freshly baked goods wafted through the air, created by skilled Saudi bakers crafting sumptuous hot sands, coffee and artisanal pastries, adding a deliciously warm touch to our journey.

India, Qatar & Spain Pavilions:

As I entered the India Pavilion, a profound sense of pride filled my heart. It was a vibrant celebration of my homeland, adorned with striking tribal art installations and a sleek, modern reception area that captured the spirit of contemporary India. I was particularly struck by the exhibits proudly showcasing the country's monumental advancements in space technology, especially the incredible satellite that successfully reached the enigmatic dark side of the moon. At the exit, exquisite, handcrafted jewelry and artisanal home decor caught my eye, each piece reflecting the skill and tradition of India's craftsmen with a captivating allure.

Our next stop was the vibrant Qatar Pavilion, bursting with energy as we were welcomed by a dazzling live traditional dance and music performance that infused the air with flair and excitement. The space was alive with colorful decor and lively rhythms, making us feel like part of a grand celebration. The pavilion was based on the traditional Qatari dhow boat construction and Japan's heritage of wood joinery. The Spain Pavilion awaited us next, enchanting us with its elegantly designed, orange-themed room that symbolized creativity and innovation. This aesthetic masterclass harmoniously blended historical elements with forward-thinking concepts. The pavilion focused on innovative technologies for harnessing ocean waves and sustainable aquaculture practices, showcasing how these fields can work together to create a more environmentally friendly future.

UAE, Kuwait & Lunch Break:

Entering the UAE Pavilion felt like being enveloped in the warm embrace of Emirati hospitality. The rich, intoxicating aroma of Oudh mingled with the scent of steaming Turkish coffee and the gentle smoke of traditional incense, creating a sensory feast that immediately captivated our senses. As we explored, we uncovered cutting-edge sustainable technologies that highlighted the UAE's commitment to innovation and met trailblazers like Dr Nawal Al Hosany and the visionary Samuel Horvath. The intricate process of date cultivation, complete with mouthwatering samples, provided a delectable surprise that delighted our taste buds and showcased the cherished tradition of Emirati culture.
However, it was the Kuwait Pavilion that truly mesmerized us. Through stunning underwater visuals and immersive storytelling, we were transported on a journey through the nation's illustrious maritime history, the intricate web of cultural trade, and its unique architectural heritage. A breathtaking sand-based topographic map brilliantly illustrated Kuwait's striking landscape, from its sandy shores to its bustling urban centers. After soaking in this incredible sensory overload, we took a well-deserved lunch break near the tranquil Japan Nikken Sekkei Pavilion, where we exchanged stories of the pavilions we had visited, eagerly recalling moments that would linger in our memories.
Solo Wandering, Japan Pavilion & Grand Finale:

As the rain briefly paused our explorations, I seized the moment to wander solo through the Commons C and B zones. I encountered friendly faces from all over the world, sharing laughter and engaging in lively conversations as we meandered through the vibrant African and Scandinavian exhibits. The informative United Nations and Red Cross pavilions offered profound insights, and I was thrilled when the UN presented us with beautifully illustrated books on Japanese history—a treasure trove of knowledge to take home.
By 7 p.m., we reconvened at the Japan Pavilion for a mesmerizing finale. The theme "Between Lives" resonated deeply, embodied in the pavilion's stunning design, constructed entirely from sustainable cross-laminated timber. This thoughtful creation symbolized the interconnectedness of all living things. The innovative biogas plant, the circular layout that promoted flow and accessibility, and interactive exhibitions spotlighting Japan's regenerative approach to nature left a lasting impression. As we ascended to the upper ring, a breathtaking drone show unfolded overhead, illuminating the night sky with intricate patterns and a narrative of renewal and harmony with the environment. It was the perfect culmination of a day that felt like a dream journey around the world, leaving us awestruck and inspired.

Conclusion:

Reflecting on our day at Expo 2025 Osaka, I am filled with gratitude for the incredible experiences and memories we created. Each pavilion offered a unique glimpse into the culture, innovation, and artistry of its respective country, showcasing the richness of our global community. From the vibrant displays of Bangladesh to the technological advancements in India and the warm hospitality of the UAE, every corner of the Expo was a testament to human creativity and collaboration.

The friendships forged and the knowledge gained during this trip have deepened my appreciation for diversity and the stories that connect us all. I left the Expo not just with souvenirs, but with a heart full of inspiration and a renewed sense of curiosity about the world. This unforgettable adventure has not only enriched my understanding of different cultures but also ignited a desire to explore and learn more in the future. In the spirit of unity and innovation that the Expo embodies, I look forward to sharing these stories and experiences with others and encourage a sense of wonder and exploration in all who venture beyond their borders.

India Pavilion

Japan Pavilion

Drone Show - Osaka Expo

The Last Plant on Earth

Aakarsh Ryo Kundu
Grade - VIII

The desert was a whisper now—quiet, breathless, and endless. Once, it had been a valley of rivers and forests. Now, wind carried only dust and the hollow scrape of sand against glass.

The dome stood alone, half-buried, like a blister on the skin of a dying planet.

Inside, it was green.

The man moved slowly, his steps resonating on the metal grates, and crouched beside the plant. A small, defiant thing. A bright green sprout with delicate leaves, growing from a mound of dark, rich soil—possibly the last of its kind. Possibly the last living thing alive on Earth, save for him.

"Good morning," he said softly, spraying the leaves with water. The plant didn't answer, as expected. But he swore it leaned toward him.

He had been tending to the plant for so long that he thought he'd forgotten what the sound of human footsteps in the sand sounded like. But as the wind stirred the dry earth outside, a faint sound broke through the stillness. At first, he thought it was his imagination, an old man's weary mind playing tricks. But then, it came again—a soft, rhythmic thud, the distant scrape of boots against the drought-stricken earth.

The man stood slowly; he hadn't seen anyone in years, not since the last of the survivors had turned away from the desert, leaving the greenhouse untouched, as if the plant had been preserved just for him.

He stepped toward the door, hands trembling as he adjusted the old, rusted latch.

A young woman stood there, her clothes ragged, face streaked with dirt and sand. She was gripping a water bottle, nearly empty, her eyes wide with disbelief as she looked at the dome.

"I didn't think… I didn't think anyone lived here," she rasped, breathless. She took a step forward, then another, as if pulled by an invisible thread.
The man eyed her warily, his gaze flicking to the plant, still thriving in its glass sanctuary. Something about her unsettled him. The eagerness in her eyes—it reminded him too much of himself, years ago, before the world had come to this.
"You shouldn't be here," he said, his voice rough. "There's nothing for you here."

Her gaze darted from him to the plant, then back again. Her lips parted, as if she'd been holding something in for far too long.

"I thought… it was over," she said, her voice barely a whisper. "I thought… I thought I was the last one on this hell of a world."

The man stared at her for a long time. He turned away, unwilling to look at her. There was too much truth in her words, too much honesty in the way her gaze fell upon the last living thing in the world.
"Well," he said, "you're wrong."

She shook her head. "I didn't mean people. I meant… life. I thought it was all gone. No more animals. No more plants. Just… us."

The man was silent for a moment. He turned away, unwilling to look at her. "You're not the last," he said. "There's always someone else."

She stepped forward, almost too quickly, like she was desperate for the sight of anything living.

“Please,” she said, her voice cracking. “Can I see it? Just for a moment? I won’t… I won’t touch it. I just need to see it.”

The man hesitated. He’d allowed himself to believe the plant was the last, and no one should know. Not anyone who might ruin it, or worse, take it.

But the girl’s gaze—so full of desperation—felt like something else. Not a threat, but a request.
He opened the door slowly, just wide enough for her to slip through.

The woman stepped inside, eyes locked on the plant as she crossed the threshold. The air smelled faintly of damp earth and old growth, an odor so rare now that it made her breath catch in her chest.
The man followed behind her, leaning on the door, arms folded.

The girl knelt before the plant, as if afraid it might vanish if she touched it. Her fingers hovered over the soil, just barely brushing the surface. She looked back at the man, her eyes wide.
“It’s real,” she murmured. “It’s... still here.”

The man didn’t answer. He couldn’t.

She sat back, her knees cracking, and stared at the small green sprout. “How long?” she asked softly.
“Too long,” he said, he rasped. “I’ve been here for... too long.”

The girl swallowed, her eyes bright with an emotion the man couldn’t describe. It wasn’t hope. It was something heavier.

“Can I take a seed?” she asked, her voice low.
His heart skipped, then hardened. “No.”
She met his gaze, the same fire in her eyes that had driven humanity to the brink of destruction. “You don’t understand,” she whispered. “It’s the last chance. If we don’t take it—if we don’t try to grow it—then it dies with all of us.”

His hands clenched into fists. “I’ve seen what happens when people try,” he said. “The world was ruined before. And now you want to start over again?” He shook his head, looking away. “Some things are better left to die.”
She shook her head, desperate. “It’s not about trying to start over. It’s a matter of survival. I can help. The seed is the key... we can start a new world. A better one.”

The man turned toward the glass wall, staring out at the vast wasteland. His fingers trembled, aching from years of solitude. Could he trust her? Could anyone be trusted? The lonely years had affected his ability to trust, to believe in people.

Her voice broke his never-ending thoughts. “I don’t want to watch everything die,” she said, a crack in her voice. “I don’t want to be the last one.”

The silence between them stretched, the weight of her words hanging in the air.

The girl took a tentative step forward, reaching out for the plant. She paused just inches away, her hand trembling. He could see the desperation in her face, the way she looked at the small spring like it was the last lifeline she had left.

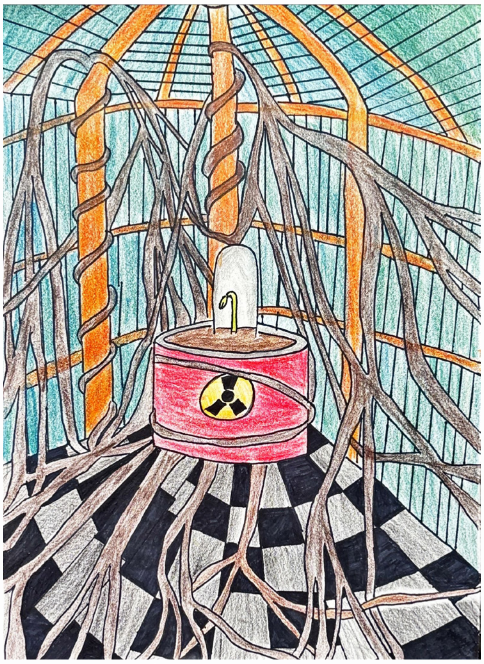

“No,” he whispered, his voice strained. He stepped forward, blocking her path.
She jerked back, startled. “Why? Why won’t you let me take it?”
The man’s eyes hardened. He stared down at her, the years of isolation and pain written into his features. “You don’t understand. People who are overeager and naive like you don’t get it. You think you’re saving the world, but you’re just repeating the same, countless mistakes humans have made. You’ll destroy it again. Just like the rest of them.”

She stepped back, her face crumpling. “Then we all die, don’t we? If no one tries... we all die.”
For a long moment, the man stood in the middle of the room, frozen between two worlds: the one he had left behind, and the one she was desperate to create.

The man looked at her, then at the plant. Something inside him burst.
He stepped forward and knelt beside the plant. His hands, shaking with age and regret, reached for the soil. He pulled a seed from the roots and held it out to her, his fingers brushing hers as he passed it.

“You take it,” he said quietly. “But don’t waste it.”
The girl’s eyes filled with tears, and she nodded. She held the seed carefully, like it was the last thing that mattered.

The girl left without a word, carrying the seed in the palm of her hand. The man stood by the door, watching her disappear into the horizon. He didn’t know if she would succeed, or if humanity would destroy the plant again. He didn’t know if there was any hope left.

But for the first time in years, he allowed himself to believe there might be a chance.
He sat back down beside the plant, the tiny spring still growing strong in its glass cage. The world outside was silent, and the wind carried only dust.

But for a moment, just a moment, there was hope. Hope, of a better world.

How AI is Redefining Education

Srishti Chatterjee
Grade XII

Artificial Intelligence is no longer just science fiction. It is reshaping industries, economies, and our everyday life as we speak. What started with voice assistants such as Siri or Alexa has significantly advanced and is now deeply embedded in how we live and work. One of the most important, yet often debated, areas of impact is education.

Artificial Intelligence is rapidly changing the way students learn and teachers teach. From learning platforms such as Khan Academy's AI tutor to the most commonly known tools such as ChatGPT can now explain complex concepts almost instantly. AI has made education more accessible, adaptive, and efficient for students and teachers. Artificial Intelligence has achieved what was nearly impossible in traditional classrooms. These systems can analyze student performance and modify content to individual learning styles, helping students grasp topics at their own pace. Moreover, algorithms such as automated grading systems and virtual teaching assistants are reducing the workload for teachers. This allows them to focus more on active student engagement. AI has been created with the purpose of making high-quality resources more accessible.

Although AI brings many advantages to the classroom, there have been serious rising concerns. The increasing overreliance on AI tools is leading to the drop in critical thinking and creativity, especially since students have become unreceptive consumers of information provided by these AI systems. Students are starting to use AI tools such as ChatGPT to give them direct solutions to complete their school assignments, which they then submit without using their own creativity or knowledge. This also hampers the student from having a proper understanding of that field of study and may affect their performance in future school examinations. Furthermore, AI often lacks the human compassion needed to understand emotional or social cues, which are vital in a healthy learning environment. We also risk creating a system where those who design the algorithms hold all the power, deciding what students learn and how they learn it, sometimes with incomplete data.

As Artificial Intelligence continues to evolve, it is extremely important that we don't adopt it blindly in education. While this technology has huge potential, letting machines take full control of what and how we learn could pose imminent danger. Learning could become mechanical and disconnected from the emotional and social growth students need and have gotten from traditional teaching until now. Letting AI take control of your thinking process will also reduce originality and deep understanding. But that doesn't necessarily mean AI should be completely avoided. With the right precautions and a moral oversight on keeping education human-centered, AI can enhance learning, make it more comprehensive, and prepare students for the future. Artificial Intelligence is neither our savior nor our doom but is merely a tool. A tool which can be used either carefully, or mindlessly. In the end, the key is not to let AI lead or replace human intelligence, but to help, support and guide our creativity for future prosperity.

Time to move on

Ashmita Paul
UG- 1 Year

The end of an era. I will never forget
The day we first met.

I imagined you as a safe haven,
No weapons needed, just pencil and pen.
You'd welcome me with morning bells,
And occasionally repulse me with putrid smells.

You entered my life at the mere age of six,
Dedicated to enlighten me, maybe teach me some tricks.
Maybe teach me some manners?
Maybe teach me some rules?
Maybe teach me why I exist and why do we have schools?

You taught me all of this, and who can forget the usual, constitutional part where we arbitrarily learn
Math, Science, English, maybe sprinkle in a second language?

That became my duty, my purpose.

Sooner or later, it dominated my head,
My hands, my pens, my essays, my tests,
Even my conversations with my peers:
"I think I failed my exam, should I get a retest?"

Ambition sparked within me, a bizarre entity.
These grades eluded me, became my
Identity.

I have learned so much from you.
You taught me what to do and what not to do,
You gave me knowledge, friends, meltdowns, nerves, but most of all,
You showed me how it is so easy to lose your self-worth just from one fall.

I take these experiences, stuff them in my luggage, and bow my head to my knees for you.
"See you later, I will be gone…
Not forever, but it's time to move on!"

Experiencing Satyajit Ray's 'Mahanagar' in Tokyo: A Personal Reflection

Arnab Karmokar
UG-1 Year

Born in Kolkata on May 2, 1921, Satyajit Ray was a true polymath—a director, screenwriter, composer, writer, calligrapher, and illustrator. He studied economics at the University of Calcutta before moving to Shantiniketan, where his artistic vision flourished. Over the decades, his work earned him countless accolades, including an Honorary Academy Award recognizing his lifelong contribution to cinema.

Ray's influence stretches far beyond Bengal. He has been idolized and respected by legends across the globe: America's Martin Scorsese (Goodfellas, Taxi Driver) has often cited him as a key inspiration for his own work, while Japan's Akira Kurosawa (Seven Samurai, Rashomon) famously said, "Not to have seen the cinema of Ray means existing in the world without seeing the sun or the moon."

I have always loved the works of Satyajit Ray—pride of West Bengal, pride of any Bangali. Over the years, I have had the privilege of immersing myself in his world, both on screen and on the page. Agantuk has long been my favorite among his films, and his Feluda detective stories are ones I constantly return to. So when I learned that a local theater in Tokyo would be hosting special screenings of his films, I was ecstatic.

The event, titled Satyajit Ray Retrospective 2025, was held at Bunkamura Le Cinema in Shibuya Miyashita—a small yet intimate space where the magic of old cinema seems to linger in the air. Known for its international niche film selections, the theater attracts a devoted audience of Japanese film enthusiasts. They screened six of his films: Jalsaghar (1958), Mahanagar (1963), Charulata (1964), Kapurush (1965), Mahapurush (1965), Nayak (1966), and Joi Baba Felunath (1979). I was able to watch Mahanagar, which won the Silver Bear for Best Director at the Berlin Film Festival—a story about a middle-class housewife in 1960s Calcutta who takes a job to support her family, and finds herself confronting societal norms as well as her own growing sense of independence.

For me, it was absolutely surreal to hear Bengali dialogue echoing through a Japanese cinema hall, with so many Japanese viewers quietly absorbed in the story. Sitting there, I felt a deep pride in understanding every word of a language foreign to most in the room, yet captivating them nonetheless.

I kept glancing at the Japanese audience members around me, wondering how they were processing the film. I realized that while they might not understand the cultural nuances in the same way a Bengali viewer would, they were still completely engaged. One small but memorable part of the experience was reading the Japanese subtitles—particularly when food came up. At one point, when rosogolla was mentioned, the translation appeared as "milk dango" (milk dumplings). I couldn't help but smile, imagining the audience picturing a plate of chewy mochi instead of spongy syrup-soaked sweets.

What struck me most about Mahanagar was its central idea—that women could and should work outside the home. In the film, this shift is about more than earning an income; it questions the structures of gender and family that have been taken for granted for generations. Watching it today, I was struck by how relevant it still feels. Even in our current society, patriarchal thinking remains common. In many parts of India, the traditional, conservative idea persists—that women should stay home, caring for their husband's family, while the men are the breadwinners.

Another element that resonated deeply was the main character Arati's moral compass. She worked for herself and was willing to stand up for what was right and just, even when it came at a personal cost. Her decision to confront injustice, especially in the face of authority, made me admire her as a character and person I could look up to.

The fact that Satyajit Ray made this layered statement as far back as 1963 was astonishing to me. This was not a message subtly hidden in metaphors, but rather an explicitly clear portrayal of a woman stepping into the world and slowly discovering her sense of independence.

As I left the theater, I could only think about the magic of Ray—how he tells stories so rooted in a particular place and time, yet so deeply human, that they transcend all borders.

ルンギー

ロイ れい子

リリーは今日朝から何だか冴えない。朝起きる時から。いや、起きる前から。朝方の嫌な夢のためかもしれない。その夢は、起きてからも部分的に頭から離れない。というか、その夢がリリーの今の現状でもあるから、夢か現実かの区別がつかない。

夢の中では、色鮮やかな服を着たたくさんの人が、大きくて明るい部屋に集まっていた。座っている人もいれば立っている人もいた。笑顔で、隣同士でお互いの顔を見ながらしゃべっていた。踊りではないけど、少ししゃべった後、相手を変えてまた笑顔でしばらくの間しゃべり続けていた、また相手を変えるまで。部屋の中には会話と笑いが絶えない楽しい空気が流れていた。リリーは、どこにいたか、嬉しくそれを見ていた。それまではよかった。そしてリリーはその部屋の右のドアから隣の部屋に一歩入って中を覗いた。薄暗いその部屋の中には誰もいなかった。慌ててリリーは隣の部屋に戻ろうとした。しかしドアがどこにあるかわからない。さっき入ってきたドアはどこに消えたのか！急に息苦しくなってリリーは咳をし始めた。その咳で、今目が覚めた。

この頃しばらく暑いのか寒いのかわからないような天気で、何を着ても快適じゃないから、涼しいかな、暖かいかな、といろいろな服に挑戦しているうちに風邪気味になったり、咳が出たりするのは度々あることだ。目が覚めてもリリーの咳は続いていた。小さくて薄暗い部屋の中にリリーは一人だった。夢の最後の部分とあまり変わらなかった。すぐにドアがあるかを確かめるとドアがあったから安心した。でも夢の中の明るい部屋や、明るい服を着た明るい人々はどこにもいなかった。期待するようなことがなくてもリリーはがっかりした。

それから仕事に行ってもリリーの気持ちが変わるようなことはなかった。みんなが黙って下を向いてつまらない仕事をこなしている。小さい工場だからまだすべてが自動化されていない。AIを使うには最初にかなりの資金が必要だとリリーは聞いた。だからまだ安い人間が使われている。近い将来すべて自動化されてしまったら人々の仕事はどうなるのか、リリーは考える。けれど、自分の仕事、自分の将来のことには直接ふれない。それを考えるのは怖かったからだ。

帰りに家に近づいたら右の二階建の家の取り壊しが始まったのに気がついた。かなり古い物件だったから驚きもしなかった。壊された家の中から、今まで見えなかったさらに向こうの道と家並みが見えた。チラッと見て目を逸らした途端、何かが目に留まった。リリーは瞠目する。夢じゃないけど、夢の中で見たような明るい色のルンギーだった。何枚か、向こうの家のベランダに干してあった。
今朝からの暗い気持ちが一瞬で飛んだ。リリーは嬉しくなった。家に入る前にしばらく立って恥ずかしながら干されたルンギーを見た。一つ一つのデザインを目に焼き付けるような感じで。一目だと全部が同じように見えるけれど、目が慣れてくると違いが分かるようになる。小さい頃から見てきたせいかもしれない。色とデザインでどの地方のものかははっきりする。よく知っている人はそれを見るだけで特定の流派や伝統、そしてそれを作られた家系まで分かると言われた。リリーにはそこまで分からなかったけど単純に喜んだ。

家に入って何も考えずにリリーは壁にぶら下がっている細長い鏡の前に立った。自分の服の色のなさに驚いた。色鮮やかな物が好きだから、持ってきていた衣類はそういうのが多かった。時間と共に、服の色調を周りに合わせているうちに、鮮やかな服たちは手付かずになっていた。仕事に行く時は確かに使いづらいが、それ以外は着てもよかっただろうに。時間がない。元気が出ない。本当？今は？リリーは鏡の人に聞いた。答えが返ってこない。父がいつも、何をするにも今が一番良い時間だと言っていたのが頭の中をよぎった。鏡の人の返事を待たずにリリーは、長い間手も触れていなかった箱を開けると、中から太陽みたいに周りを明るくする衣服をいくつか取り出した。それからその中の一枚を取り出して着替え始めた。

身近に感じるインドの味

神田 みつ子

今年も庭に並べた鉢植えのカレーリーフの葉がワッサワサと風に揺れています。容赦ない夏の陽射しもはね返すような元気な緑です。何年も前のインド料理教室の折にシュクリシュナ先生が「日本では生のカレーリーフが手に入らなくて残念」と言われたのを受け　インターネットで見つけた石垣島の農園から数粒の種を取り寄せました。その種を植え育った木から摘んだフレッシュな葉を今では存分に使えるようになりました。

私は伊豆半島の中ほどの温泉地にある山合いの小さな旅館に生まれ育ちました。
家で食べるご飯とは別に「お客様にお出しする料理」が身近にありました。
板前さんの包丁捌きから生まれるエッジの立ったピカピカの刺身、泳ぐような姿に串を打った塩焼の鮎、生きた鰻を専用の包丁でサッーと割くさま、大根のかつらむき、鮟鱇の吊るし切り、花が咲いたような衣の天婦羅...などこどものころからいつも目にしていたためか料理や食に対しての興味は自然に育ちました。
知人が通うシュクリシュナインド料理教室の話を聞いて参加をお願いしたのも
その好奇心からでした。

初めてのメニュウは入門レシピのチキンカレーでした。肉や野菜を炒めて煮込み市販のルウで仕上げる日本のカレーとは大違いの作り方に驚きました。面白いと思いました。勝手にイメージしていたシャバシャバのインドカレーでもなく　じゃが芋さえ入っていました。シュクリシュナさんが「じゃが芋なかったら私は死んじゃうよ」と言った意味はおいおい理解することになります。

「美味しいチキンカレー」からスタートして　いつの間にかもう１０数年が経ちました。「毎月第２火曜日１０時から」は私にとって　とっても大切な時間になっています。
はじめに触れたカレーリーフも含め　パンチフォロン、ヒング、カルジラ、チラ、アムショット、アタ、スージー、ベサン、マスタードオイル等々　インドでは当たり前の食材なのでしょうが私にとっては初めて出会うものばかりでワクワクしました。今これらの多くは我が家にもあります。

シュクリシュナさんが年末恒例のインドへお里帰りされるので1月は教室がお休み、2か月ぶりの2月に食べるお料理には「恋しかったぁ」の声も出るほど。
インドのお土産にもってきてくださる「コルカタのお店の特別なギー」「抱えるほど大きな塊のグール」「いくつも食べたくなるホジミ」に大きな楽しみをもらいました。

この夏休みに遊びに来ていた5歳と8歳の孫に習ったばかりのムングダルボラを揚げてやりました。カリカリした食感が気に入ったのか　二人でほとんど食べてしまい　おじいちゃんの分は残っていませんでした。以前キーマカレーを作った時　手で食べてみせたら真似をして器用に口に運びました。「上手だね」と褒めたら
次に来た時にも「手で食べるカレー」をリクエストされました。

この子たちの父親を　結婚前に娘が初めて家に連れてくる時　彼は一人海外旅行によく出かけインドにも訪れたときいていたので　せっかく覚えたインド料理を振舞ってみることにしました。チキンビリヤニ、ライター、スパイシーな海老フライなど汗をかきかき食べてくれました。あの汗はきっと辛さと緊張ですね。
またこの春には私の兄夫婦が　旅行のついでに立ち寄ってくれた時は　ひよこ豆入りキーマカレー、ムロルゴント、茄子のパコラなどを作りました。ムロルゴントは「不思議な味だけど美味しい、初めてなのに懐かしい味がする」と特に好評でした。ただ翌々日に私のコロナ感染が分かり　兄夫婦にも余計なお土産を渡す結果となり申し訳ないことでした。

長い間料理教室に通い　様々な料理を教わった割には　スパイスに精通してる訳でも　自在に使いこなしてるとも言えません。レシピを見ずに作れる物も限られています。それでもインド料理は私のとっておきです。知識もわざもそれなり身についた自覚があります。知るほどに広くて深いインドの料理を語ることは難しいけれど　今では確実に私の身近にあると言えます。

数多くの料理を習って食べてきて思うことは「インドの料理ってなんて丁寧で手間をかけて作るんだろう、言い換えればめんどくさいにも繋がるよ。でもそれをするからこの味になるんだ、美味しいもの食べたい気持ちと工夫の豊かな味の文化なんだ」ということです。
毎月皆でワイワイ言いながら作って食べてるると誰からか声が出ます。
「あー　美味しいっ！お店に行っても食べられないねえ」
本当にその通りと思います。

私も家族や友達からの「美味しいっ！」を貰えるよう　そしてレパートリーを増やせるよう　これからも楽しみながら「頑張ります！！」

防災視点で考える風呂敷きの使い方

ーしずく　まゆみ

日本には「風呂敷」と呼ばれる大きな真四角の布の文化があります。物を包むという大きな役割を果たすものですが、これを防災視点から見ると、物を包む以外にも様々な使い方が見えてきます。

先日、「子育て防災支援員講座：初級編」を学びました。そのときに教えてもらったのは、風呂敷きで乳幼児を抱っこする方法です。乳児はもちろん、6歳ぐらいの子どもでも楽に抱っこができます。抱っこされると、子どもは安心するみたいです。

この風呂敷、手に取って広げるととても大きい！　なんとタテ・ヨコ各1mあります。そしていろいろな使い方が風呂敷きにイラストで描かれています。48通りの使い方があります。

進化した！！　撥水加工の風呂敷

もうだいぶ前のことなので、どこで手に入れたのか覚えていないのですが、左の写真の風呂敷きを1つ持っています。この風呂敷の特徴は撥水加工してあることです。
ということは…？
水を包むことができます！
風呂敷きをバッグのようにして、中に水を入れます。このまま持ち運ぶこともできるわけですが、もう少し使い方を考えると、簡易シャワーとしても使うことができます。
災害が起きるとライフラインが止まって、入浴するのは難しくなります。せめてもの簡易シャワーがあるとリフレッシュできそうです。
簡易シャワーの使い方動画がYouTubeにあります。QRコードを付けておきますので、興味がありましたらぜひ見てみてください。

タゴールと津田梅子

佐々木 理香

2024(令和6)年に発行された新五千円札の肖像、津田梅子は日本の女子教育の先駆者であり、その生涯を通して多くの女性に教育の重要性を説き、女性の地位向上と女子教育の発展に大きく貢献しました。彼女は、日本初の女子留学生として、1871年、６歳の時に岩倉使節団の一員として米国に渡り、約11年間を海外で過ごしました。帰国後は、女子教育に生涯を捧げ、1900年に女子英学塾(現在の津田塾大学)を設立し、女性の高等教育に尽力しました。

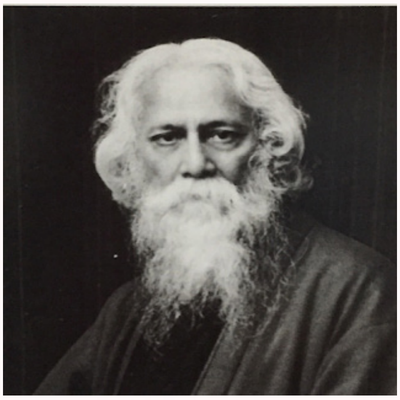

ラビンドラナート・タゴールも女子教育の重要性を唱え、シャンティニケトンに大学(ビッショ・バロティ)を作ります。1929(昭和4)年、タゴール68歳の時、５月10日に横浜に到着、日本女子大学と日印協会で講演した後、5月17日に　　津田塾を来校し講演しました。残念ながら、津田梅子は病気入院中でタゴールに会えず同年8月に他界しました。講演録も残っていませんが、聴講した同窓生のコラムが残っています。

タイトル：「文明批評家としてのタゴール」
著者：瀬尾すみえ　1922(大正11)年卒　20回生
出典：女子英学塾同窓会『会報』第34号　1929(昭和4)年8月発行
「我々は時は金なりと口走りつつ有閑は富である、と言う真理を忘れてしまった」とタゴールは言った。あのタゴールの声は悲しい警告と響いたであろう。「時は金なり」の一語で、タゴールは、現代の物質文明に対する彼の侮蔑を忌憚なく表している。現代のいわゆる文明人は、人生の価値を総て物質的数量で示さなければ了解出来ない。時という神秘不可解な力さえも、金目に直して量ろうという滑稽をやる、と彼は言うのである。現代人は、美や神秘を惜しげもなく打ち壊し、「人生は何でも金儲けにあり」と書き立てた。金さえ儲かりゃ何でもやるよ、と言った態度である。西洋の機械文明は世界のあらゆる国々を機械化しようとしている。だから、金儲けの上手い人が一番偉いという事になり、世界の将来、即ち人類の運命を支配する事になる。では、人類の将来は、と問う時、誰が正しい答をしてくれよう。「だから今、印度人の言う事を聞きなさい」とタゴールは言う。人間は便利な機械を正しく使わないで戦争のようなさもしい物に利用して破滅を招いている。要は、機械を捨て、物質的欲望の大部分を捨てて、魂の本来の棲家である有閑の魂を回復する事にある。タゴールは文明批評家の立場から警告しているのである。タゴールが特に日本人に警告している事は、早く機械文明の危険と醜さを悟って、西洋の真似をする事をやめなさいという事である。西洋諸国に侮られぬように金を儲け、軍艦や飛行機を造って武装しても、自ら作った甲羅の重さに耐えかねて死んで行くばかりだ。東洋人が西洋を模倣する時、物質万能・帝国主義など悪い方面ばかりを取り入れがちである。理解無くして模倣するのだから危険だとタゴールが言うのも尤もである。つまりタゴールは、世界を千篇一律の機械工場に化そうとする現代文明に逆らって立ち、各人種独特の文化の保存に極力努めなければならぬというのである。世界中の人間が同じような服を着て異口同音に口走りつつある今日、タゴールの言葉は真面目に有難く聴くべきであろう。日本や中国は、各自の政治上の独立は主張するが、文化的には殆ど西洋に征服された体にある。それに反して、印度人が、政治上ばかりでなく、文化的にも、断固として東洋の自立を叫んでいる事は、実に尊敬の外はない。

कुछ गज़लें

मनमोहन साहनी

सदा बादशाही

सदा बादशाही तो सिर्फ़ खुदा के पास है
इंसान लाख चाहे तो भी मंसूर नहीं होता

दुख और दर्द की इंतहा ही हो जाए जब
तो चाह कर भी इंसान मसरूर नहीं होता

खुदा की बंदगी करने का जो नशा है
और किसी शे में वो सरूर नहीं होता

ज़ुल्म देखते हुए आँखें मूँद लेने वाला इंसान
खुदा की नज़रों में वो भी बेकसूर नहीं होता

ना चाहते हुए भी कई ख़ताएँ हो जाती है
काश इंसान हालात से मजबूर नही होता

उस बेवफा का दिल कितना भी तराश लो
वो पत्थर ही रहेगा कभी कोहिनूर नहीं होता

इंसान की फितरत

दौलत की खुवाइश कभी ख़त्म नहीं होती
नयी अमीरी की नुमाइश ख़त्म नहीं होती

खुदा से करोड़ो नेमतों पाने के बाद भी
इंसान की फ़रमाइश ख़त्म नहीं होती

बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएँ
माँ की गोद की गर्माइश ख़त्म नहीं होती

लाख आंधी तूफान और ज़लज़ले आएँ
नए पौधों की पैदाइश ख़त्म नहीं होती

ए खुदा जाने कितने पाप किए हैं मैंने
कि मेरी आज़माइश ख़त्म नहीं होती

ज़िंदगी

ज़िंदगी कहाँ से चली कहाँ ले आयी
मांगा कुछ और था ले कुछ और आई

वो और थे जो मर के भी कसमें निभाते थे
वादा तोड़ने पर उनको ज़रा शर्म नहीं आई

गरूर था कि तेरे बिना रह सकता हूँ मैं
धोखा दे गई आँखें रात भर नींद नहीं आई

बार बार धोखा फरेब मिलने के बाद भी
उससे बचने की मुझे तरकीब नहीं आई

अंधेरा तब उजाले से अच्छा लगने लगा
जब लाख कोशिशों से रोशनी नहीं आई

मेरी दास्तान सुनने वाले कम रह गए अब
जो हैं उनको मेरी बात समझ ही ना आई

दर्द का एहसास

दर्द का उसको मेरे जरा एहसास नहीं होता
मेरे साथ तो होता है पर मेरे पास नहीं होता

ज़िन्दगी की हर मुश्किल पर हंस देताँ हूँ
रोते रहने से फर्क कुछ ख़ास नहीं होता

जो दिल के इतने क़रीब क़रीब रहता था
मेरे से कितना दूर था विश्वास नहीं होता

मनघड़त कथायों को सच बना कर कहने वालो
झूठ हमेशा झूठ रहेगा कभी इतिहास नहीं होता

झूठ और मक्कारी ही अगर दिल में भरी है
तो भूखा रहने पर भी वो उपवास नहीं होता

तू मान ना कर दो चार लाइने लिख लेने से
दुनिया में हर कोई कालिदास नहीं होता

हर बार उम्मीद टूट जाने के बाद ये समझा
कि हर कोई मेरी तरह इखलास नहीं होता

सब का दुख दर्द बाँटने वाले इंसान के
बुरे वक्त पर कोई आसपास नहीं होता

ख़ुशी और ग़म जब एक मुकाम पर आ जाये
तब कोई हो या ना हो दिल उदास नहीं होता

कादर और कुदरत

ये कुदरत के नज़ारे ये झील का नीला पानी
सब वैसे ही रहेगा सिर्फ़ दुनिया आनी जानी

बुढ़ापे की लंबी तन्हाई में सोचता है इंसान
हाए निकल गई कितनी जल्दी मेरी जवानी

खुदा से इश्क़ पहली और आख़िरी शरत् है
या तो तुलसीदास बन या मीरा सी दीवानी

इंसान रोज़ नयी मंज़िलो की और बढ़ता है
पर सच्ची ख़ुशी देती है उसको यादें पुरानी

खुदा की सबसे बड़ी नेमत है इंसान के लिए
बेहद खूबसूरत फिजायें और ये रुतें सुहानी

जो घड़ी गुज़र गई और जो ख़ुशी छिन गई
वो लाख कोशिशों पे भी वापस नहीं आनी

अजनबी से रह रहे हम इन नयी हवेलियों में
ढूँढ रहें हैं गलियाँ बचपन की जानी पहचानी

यादों का गुलदस्ता

त्रिभुवन खन्डेलवाल

वो यादें वो कल की बातें
वो साथ गुज़रा हर पल
अपने बीच इन बरसों में
बीती हुई शामें याद आती हैं ।

वो ख़त जो अपने हाथों से लिखते थे
उनके सूखे हुए फूलों की ख़ुश्बू आती है,
वो बुक मार्क सफेद से पीला हो गया
उसकी भी उम्र हमारे साथ बढ़ती रही।

महसूस होता है गुज़रता समय
रफ़्तार कुछ धीमी से तेज़ हो गई
फिर धीमी, और कई अफ़साने जोड़ गई,
धड़कनों की कश्मकश हर पल
वो हुस्न और वो ख़ूबसूरत पल
बीते हुए मंज़र की सुनहरी याद दिलाते हैं ।

आज की हवा में उल्फ़त है
आज भी पुराना जुनून है
आज भी दिल धड़कता है
और आज भी तबस्सुम में तुम ही हो ।

हर पल तुम सलामत रहो
और हर पल तुम करीब रहो
हर पल एक नशे का जलवा हो
और हर पल इस ज़िगर में बसती रहो।

आपकी तारीफ़ आपकी मोहब्बत
आपका हुस्न और आपकी नज़र,
हमारे साथ रहकर वो हर शाम
को रंगीन कर देती है,
वो जाम जो गुज़रते वक़्त के साथ
और लज़ीज़ होता जाता है ।

खुदा तुम्हें महफ़ूज़ रखे ताकि
यह आपस का अफ़साना चलता रहे,
अभी तो उम्र चालू हुई है
कई ख़त लिखने और पाने हैं
अभी तो फूलों का गुलदस्ता सजा कर
एक बेहतरीन ज़िंदगी को जीना है ।

विश्व प्रदर्शनी एक्स्पो

शाँग्रीला जैन

विश्व प्रदर्शनी एक्स्पो 2025 का शुभारंभ इस साल 13 अप्रैल को कांसाइ के ओसाका शहर में हुआ था। 13 अक्तूबर तक चलने वाले इस एक्स्पो में दुनिया भर के 158 देश और 8 संगठन हिस्सा ले रहे हैं। इस बार के एक्स्पो की विषयवस्तु है - भविष्य के समाज का निर्माण। इस आयोजन की वैभवता की झलक दूर से ही दिखायी देती है। मानव निर्मित युमेशिमा द्वीप पर हो रहे एक्स्पो स्थल के बिलकुल बीच में है - द ग्रैंड रिंग। जापानी श्राइन बनाने की प्राचीन काष्ठ कला - नुकि से बनी इस रिंग का दायरा करीब 2 किलोमीटर है और चौड़ाई करीब 30 मीटर है। 12 मीटर ऊँचा यह वॉक-वे एक्स्पो आने वाले लोगों के लिए सुलभ प्रमुख मार्ग होने के साथ ही ये धूप और वर्षा से बचाव भी करता है। इस के ऊपर खड़े हो कर विभिन्न देशों के मंडपों और कार्यक्रमों स्थलों का अद्भुत नज़ारा दिखायी देता है।

माना जाता है कि हम सभी प्राणियों का जीवन चक्र और इस प्रकृति का वृहद् काल चक्र, सभी एक दुसरे से जुड़े हुए हैं। एक्स्पो 2025 में इसी चक्रवत समाज की संकल्पना की गयी है जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान और भविष्य तक निरंतर चलते रहेंगे। एक्स्पो 2025 का शुभंकर म्याकु-म्याकु भी इस धारणा का प्रतीक है जिसका जापानी भाषा में अर्थ है पीढ़ी दर पीढ़ी।

इस पीढ़ी दर पीढ़ी सोच की झलक एक्स्पो में हिस्सा ले रहे देशों के मंडपों में प्रदर्शित चीज़ों में बखुबी दिखायी देती है। शुरुआत अगर भारत मंडप से करें तो यहाँ मंडप के बीच बहती प्रतिकात्मक नदी हमें हमारी विरासत से लेकर वर्तमान और भविष्य से जोड़ती दिखाई गयी है। भगवान बुद्ध की विरासत भारत और जापान को भी एकदुसरे से जोड़ती है। गुलाबी कमल के आकार में बना मंडप रात में बोधीसत्व का प्रतीक चिन्ह नीलकमल में बदल जाता है। यहाँ भारत के समृद्ध इतिहास से लेकर भारत की शान चंद्रयान जैसी अनेक चीज़े लोगों को आकृषित कर रही हैं। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हर प्रदर्शित चीज़ के साथ क्युआर कोड है जिससे उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। ऑडियो विज़ुअल के ज़रिए भारत के फ़ार्मा, कृषि, सतत् ऊर्जा, स्टार्टअप्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हो रही प्रगति की जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर दिन में 3 बार योग भी करवाया जा रहा है जो जापानी लोगों में बेहद लोकप्रिय हो रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सेक्शन में हर पखवाड़े भारत के अलग अलग राज्यों के नवीनतम उत्पाद लाये जा रहे हैं। इस निरंतर बदलाव के कारण भी लोगों की रूचि भारत मंडप में लगातार बनी रही। जून माह में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत तीसरा सबसे लोकप्रिय मंडप रहा है।

पृथ्वी पर जब कुछ नहीं था तब थे सिर्फ़ शैवाल। और यही शैवाल हैं जापान मंडप के सुपर हीरो। जापान पैवेलियन में सूक्ष्म जीवाणुओं का हमारे जीवन में उपयोगिता दिखाई गयी है। पैवेलियन को तीन भागों में बाँटा गया है। एक भाग में एक्स्पो के रेस्त्रांओं से बचे हुए खाने से बायोगैस, बिजली और स्वच्छ जल बनाया जा रहा है। और इसी बिजली और पानी की मदद से एक अन्य भाग में शैवाल की खेती की जा रही है। ये शैवाल सुपर फ़ुड से लेकर वातावरण से कार्बनडाईऑक्साइड सोखने और ऑक्सिजन बनाने में सरु के एक पेड़ से कई गुणा कारगर हैं। बीफ़ प्रोटीन बनाने के लिए जितना पानी खर्च होता है उस की तुलना में बहुत कम जल में उससे कहीं अधिक मात्रा में प्रोटीन बनाने की क्षमता रखते हैं ये शैवाल। जापान पैवेलियन में शैवाल के ऐसे कई चमत्कार देखे जा सकते हैं। अनुमान है भविष्य में शैवाल जनित उद्योग करीब 4,500 ट्रिलियन येन मूल्य का होगा। जापान का नवीनतम आविष्कार नये तरह का बायेडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी देखने को मिला। कार्बनडाइऑक्साइड को खाकर प्लास्टिक जैसे पदार्थ में बदलने वाला ये सूक्ष्म जीवाणु सचमुच कमाल है।

इससे पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदुषण से निजात तो मिलेगी ही साथ ही कार्बनडाइऑक्साइड में कमी से हवा भी स्वच्छ होगी। इसके अलावा जापान में प्राचीन काल से रिसाइकल के चलन की झलक भी जापान पैवेलियन में देखने को मिली।

हर देश ने अपने देश में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंडपो में भविष्य में परिवहन के साधन कैसे होंगे, चिकित्सा का स्वरूप कैसा होगा, समाज में रोबोट और मानव का सह-अस्तित्व जैसी बातें लोगों को अचंभित कर रही हैं।

अंत में, जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो था जापानी लोगों का व्यवहार, उनका स्व-अनुशासन। लोग घंटों तक कतारों में खड़े रह कर, शांति से अपनी बारी का इंतज़ार करते दिखे। कहीं कोई विवाद नहीं, कोई चीखमचिल्ली नहीं। इतने बड़े आयोजन स्थल में कहीं पर भी कचरा फैला हुआ नहीं दिखा। हर चीज़ बहुत ही व्यवस्थित। मौका मिले तो ओसाका एक्स्पो 2025 देखने ज़रूर जायें। कमाल का अनुभव रहेगा।

Art

Maa Durga
Sushmita Pal

The Sheikh
Mimi Dhar

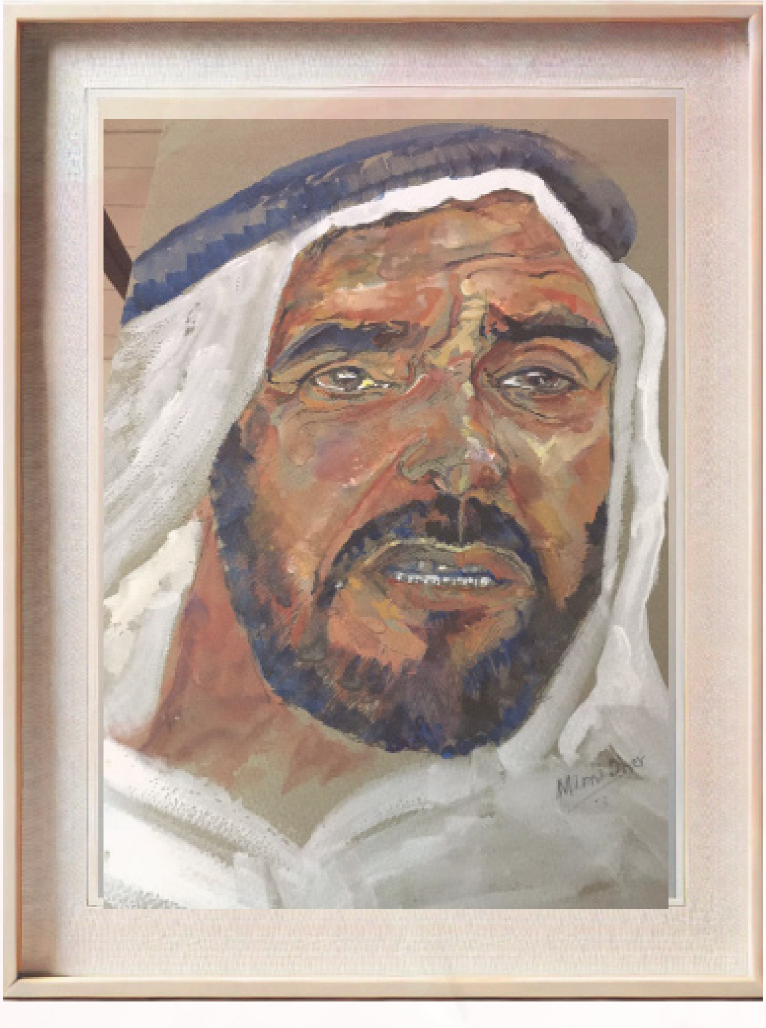

Crimson gold hues of Autumn
Sohini Mathur

Summer Moon - Sukrishna Ishii

Maa Durga
Subho Sarkar

Moharaja Tomare Selam
Ipsita Biswas

Pichwai Art (Rajhastan) using natural dyes- Paromita Roy

Kali Yantra
Bipasha Majumdar

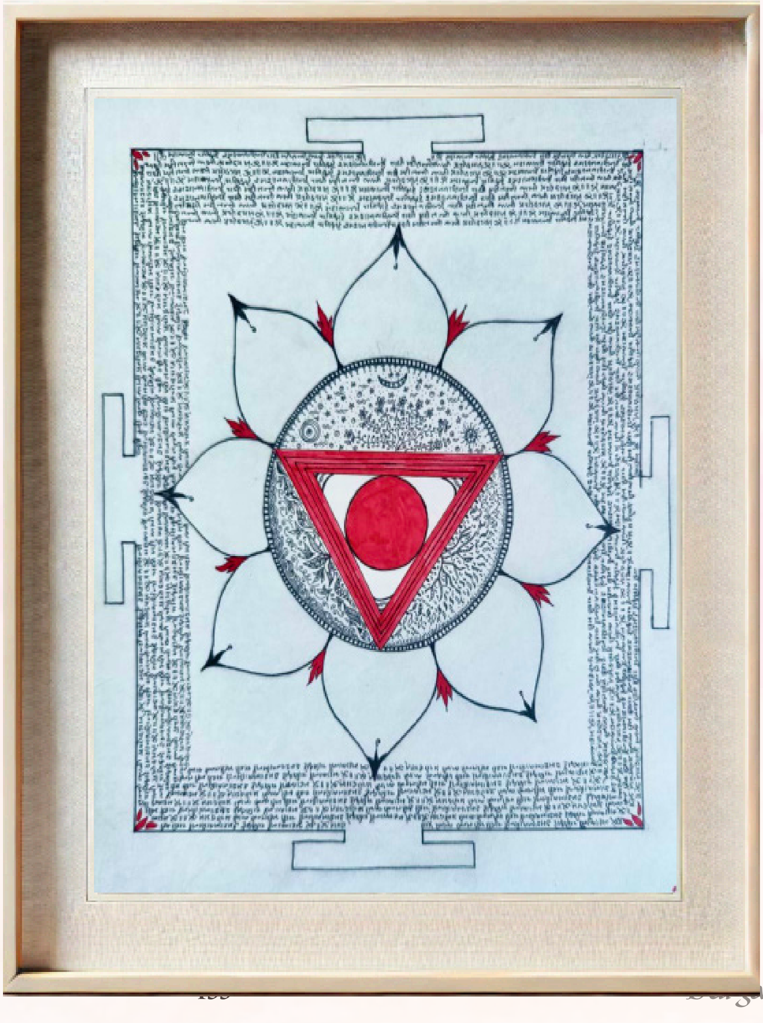

Lord Krishna - Bhaswati Ghosh

Kids Art

Under Sea
Neal Ghosh Sharma
4 Yrs

Colorful Whispers of my mind
Reyansh Neelesh Pimprika
5 Yrs

Ganesha With Mother
Aaditya Das
7 Yrs

Colours
Kiaan Ghosh
9 Yrs

Big Bright Bloom
Shasha Kar
10 Yrs

বরণ
Aadvika Ghosh
13 Yrs

Organic Sikkim - Aditya Shankar- 13 Yrs

Timeless Beauty
Aaron Chatterjee
13 Yrs

Maa Durga
Saptasree Dhar
4 yrs

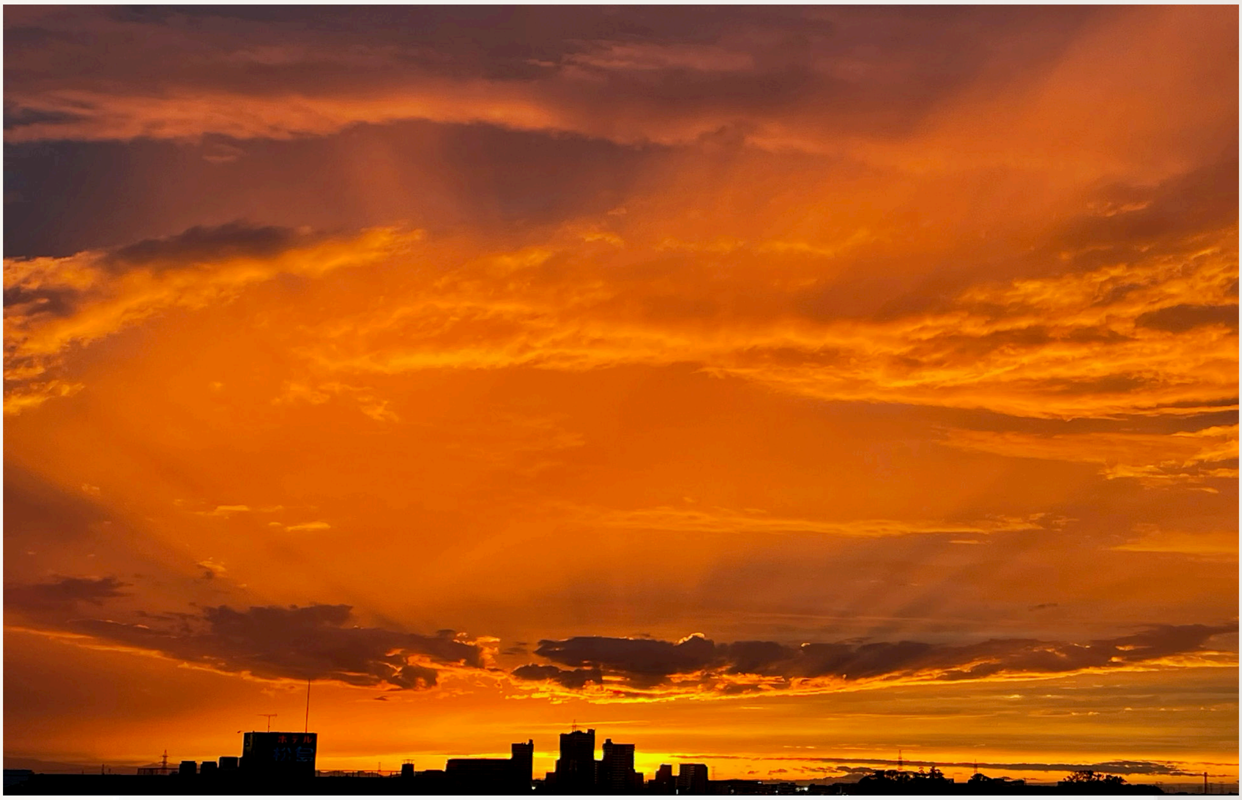

Golden Hour- Gandharbee Misra

Photography

Dolomites, Italy - Moitrayee Majumder

Tasman Lake Glacier, New Zealand- Mayukh Datta

Photography

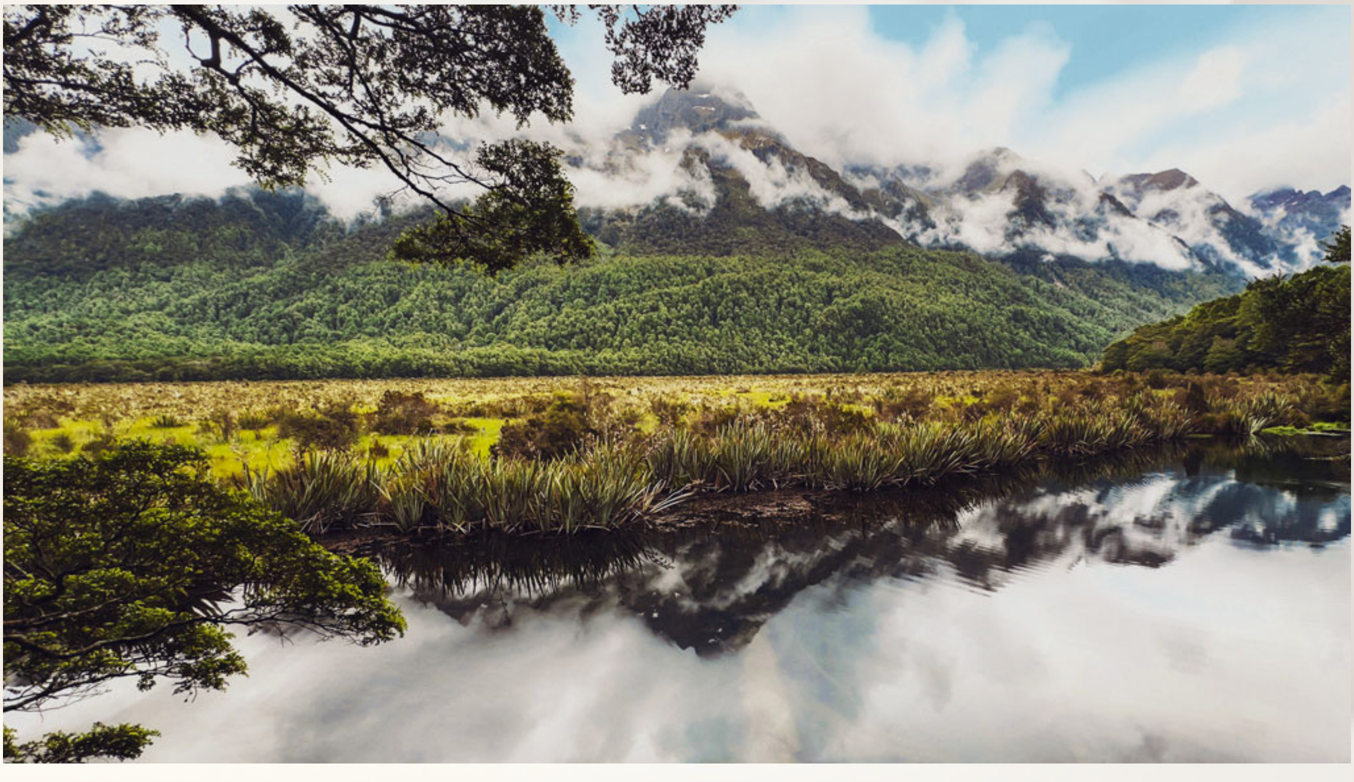

Mirror Lake, New Zealand - Purbita Datta

BENGALI ASSOCIATION OF TOKYO, JAPAN (BATJ)
STATEMENT OF ACCOUNT FOR 2024-2025

INCOME		EXPENDITURE	
ITEM	**AMOUNT**	**ITEM**	**AMOUNT**
Opening Balance on Aug 31,2024 (from 2023-2024) In bank a/c Cash in hand	Yen 1,220,472 Break Up- Yen 746,624 Yen 473,848	Expenses for Durga Puja and Anjali Magazine, Saraswati Puja, Rabindra Jayanti, Storage of Durga Pratima, and Miscelleneous Others	Yen 2,819,222
Collection by Subscriptions, Pronami, advertisements in Anjali and Donations	Yen 2,516,678	Closing balance on Aug31, 2025(Carried forward to 2025-2026) In Bank a/c Cash in hand	Yen 917,928 Break up- Yen 746,583 Yen 171,345
TOTAL	Yen 3,737,150	TOTAL	Yen 3,737,150

SINCERE THANKS from
Bengali Association Of Tokyo, Japan

www.batj.org

Donations for Durga Puja on October 13th, 2024

1. Anirvan & Srabani Mukherjee: Bhog
2. Biswanath & Chaitali Paul: Dry Fruits & Nuts
3. Krishana & Moitrayee Das: Fresh Fruits
4. Ranjan & Abantika Das: Fresh Fruits, & Sweets
5. Partha & Lia Kumar: Sweets
6. Punit & Paromita Tyagi: Banner
7. Snehashish & Joyita Dutta- Fruits
8. Abhishek & Priyanka Ghosh: Namkeens
9. Prabir & Tuli Patra: Flowers
10. Lakshman & Sophiya Hazra: Sweets
11. Sunil Viswanathan & Sangeetha Krishnamoorthy: Flowers
12. Hemlatha Anand & Family : Flowers

Donations for Saraswati Puja on February 9th, 2025

1. Anirvan & Srabani Mukherjee: Bhog
2. Biswanath & Chaitali Paul: Dry Fruits & Nuts
3. Krishana & Moitrayee Das: Fresh Fruits
4. Ranjan & Abantika Das: Fresh Fruits & Sweets
5. Partha & Lia Kumar: Sweets
6. Pranesh & Chandrima : Sweets
7. Ashoke & Aparna Karmokar: Chocolates
8. Sunil Viswanathan & Sangeetha Krishnamoorthy: Flowers

Acknowledgement

We are pleased to present the 2025 edition of Anjali, with the highest regard and sincere gratitude to all who made this publication possible.The continued success and evolution of this publication are a direct testament to the unwavering dedication and generous support of our esteemed patrons and well-wishers, whose enduring commitment imbues each volume with vitality and purpose. Every edition stands as a curated testament to the richness of global cultural expression—an intricate and dignified mosaic of voices united through the universal language of art, thought, and creativity.

We are profoundly grateful to all contributors who have so graciously entrusted us with their work. In particular, we extend our sincerest appreciation to our international contributors, whose cross-cultural offerings have elevated the reach and resonance of Anjali far beyond geographical boundaries.

We further wish to acknowledge, with deep gratitude, the sustained patronage of our longstanding sponsors and advertisers. Their continued support has been instrumental in facilitating the ongoing publication of Anjali, and it is a matter of genuine satisfaction to witness the steady and meaningful expansion of our digital readership.

Throughout this endeavor, we have been the beneficiaries of invaluable guidance, thoughtful counsel, and scholarly insight from numerous individuals, whose contributions have significantly shaped the character and integrity of this publication. To all who have accompanied us on this journey, we extend our most profound thanks and enduring regard.

Editorial Team

Biswanath Paul
Joyita Basu Dutta
Moitrayee Majumder
Chaitali Paul
Purbita Datta
Krishana

Cover concept and ArtWork

Meeta Chanda

Magazine Design and Collage

Moitrayee Majumder

WARMEST WISHES FOR
DURGA PUJA
Ambika
BRINGING INDIA CLOSER
Creating joyful times for
LOVERS OF
INDIAN FOOD
300+
PRODUCTS
BASMATI RICE
FRESHNESS • PURITY • QUALITY
Ambika
VEG & VEGAN
SHOP
SINCE
1998
IN JAPAN
Marketed in Japan by
Ambika
Corporation
www.ambikajapan.com

online store
BATICROM FOODS
An Enterprise of Diamond Trading Ltd.

Japan's Trusted Halal Store Since 1992

For more than 30 years, BATICROM FOODS has proudly served Japan with premium Halal-certified products. We specialize in importing quality frozen fish, fresh vegetables, daily essentials, and also produce some of the finest traditional sweets in Japan.

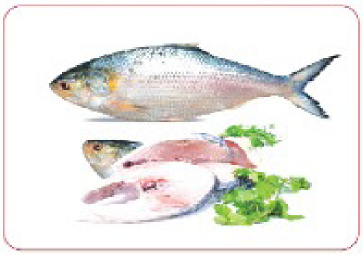

Our Tokyo store and online shop serve a diverse community—shops, restaurants,and families who trust us for quality and service. With 24/7 online orders and friendly in-store support, we ensure a smooth and reliable shopping experience.

CONTACT US
115-004, Tokyo, Kita Ku, Akabane Minami 2-16-11, Diamond Building. (Near JR Akabane Station)
Tel: 03-3902-1442, 03-6682-8323. Mobile: 090-3913-4440 (Line, Whatsapp, Viber). Fax: 03-6680-2179.

www.baticrom.com

online store
BATICROM
An Enterprise of Diamond Trading Ltd
SINCE 1992

Enterprise of Diamond Trading Ltd.

BATICROM AUTO
BUSINESS ON WHEELS

WISHING ALL
A VERY JOYOUS
DURGA PUJA
- Amitava
From
Amitava Ghosh
(080 3177 6563)

Best Wishes From

Since 1972

Rokko Sarees & Fabrics Co., Ltd.

Famous for Japanese and Indian Sarees and Fabrics

Batra Insurance

Agents for THE NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD.

Comprehensive Fire, Comprehensive Automobile, Personal and Public Liability,
Overseas Travel Personal Accident Insurance and
Reverse OTPA for Short Term Medical Insurance needs for your relatives visiting Japan.

Tokyo Office (JR Ebisu St. East Exit)

Pine Crest 1Fl., 1-7-3, Hiro-o,
Shibuya-ku, Tokyo. 150-0012
Tel.: 03-3400-6887 Fax: 03-3400-6889
Mobile: 090-9848-4373

e-mail: rokko_sarees@f02.itscom.net
batra-insurance@f02.itscom.net

Heartiest Puja Greetings

Reasonably Priced Quality Food

適正価格で最高の料理

インド料理
シャグン
Shaghun
Indian Restaurant

Contact Information:

Address: 1-18-12 Mizonokuchi
Takatsu-ku,Kawasaki-shi,
Kanagawa 213-0001 Japan

〒213-0001
神奈川県、川崎市、高津区、溝の口1-18-12
www.shaghun.jp
e-mail:shaghunjp@gmail.com
Phone/Fax: 044-813-0102

শারদ শুভেচ্ছায়

॥শ্রী॥

Priya *The Indian Restaurant*

インド料理プリヤ

5-2-25 Hiroo, Hongoku Building, 3rd Floor,Shibuya-Ku, Tokyo, Japan 150-0012
東京都渋谷区広尾 5−2−25 本国ビル、3F 〒150-0012
Ph.: 03-5941-6996

https://priyajapan.com/

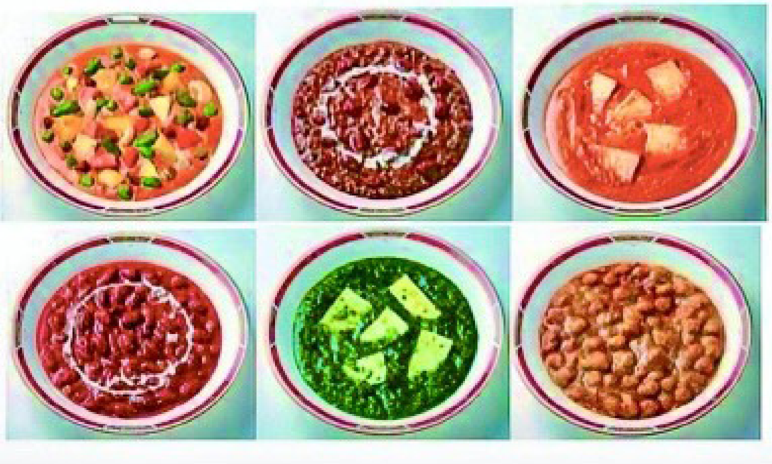

SARTAJ

Taste The Real Origin

since 2006

Importer & Distributor of Indian Spices and Grocery

Bringing best of Indian Brands to Japan

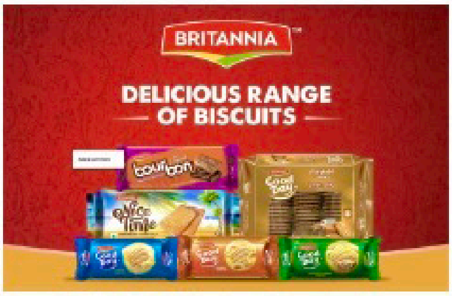

Shop Online in Categories of:

• Spices • Beans • Pulp & Juices • Herbs • Dry Leaves • Non-Food
• Oil & Ghee • Atta • Rice • Dry Fruits • Chutneys • Alcohol
• Ready-to-Eat • Snacks & Biscuits • Pickles • RTC • Frozen
• Cosmetics • Healthcare • Superfood • General

Easy-to-shop Online | **Nation-wide Delivery** | **Great Weekly Deals**

HI-QUALITY ASSURED

- All our products are 100% Veg and suitable for vegetarians.
- Vegan products are also available online at Sartaj Foods.
- Also shop variety of cosmetics, beauty, & health products.
- We offer fast and secure delivery to all the regions of Japan.

〒563-0043 Osaka-fu, Ikeda-shi, Kouda 2-10-23 • Tel: 072-751-1975 • Fax: 072-751-1976

www.sartajfoods.jp • email: info@sartajfoods.jp

Heartiest Greetings from

NIA

The New India Assurance Co. Ltd.

Japan Regional Office: 22F, STEC Joho Bldg.
1-24-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku TOKYO 160-0023

75 Years of Japan Operations

OUR PRODUCTS

- Fire Insurance
- Householders Insurance
- Shopkeepers Insurance
- Earthquake Insurance
- Vehicle Insurance
- Movable All Risks Insurance
- Personal Accident Insurance
- Overseas Travel PA Insurance
- Liability Insurance
- Marine Cargo

NEW INDIA ASSURANCE

AN INDIAN MULTI-NATIONAL SINCE 1919 WITH PRESENCE IN 25 COUNTRIES

YOUR RELIABLE INSURER IN JAPAN FROM 1950

ENSURES LASTING CUSTOMER RELATIONSHIP

RESOURCE PERSON FOR RELATIONSHIP

Mr. P. S Amos Victor

CEO, Japan Operations

080-8191-6899

Branches: Tokyo, Osaka, Nagoya, Hiroshima, Sapporo, Okayama, Gifu

Sub Branches: Fukuyama, Iwakuni, Shimonoseki, Himeji

Please visit us at www.newindia.co.jp

Heartiest Felicitations on Durga Puja Celebration

PURE RATNAGIRI ALPHONSO MANGO

ALPHONSO MANGO PULP · SLICE · JUICE

100% PURE ALPHONSO MANGO

- マンゴーパルプ（缶）
- スライス（缶）
- ジュース（ビン入）

3689 FPO PRODUCT OF INDIA

MANUFACTURED BY DESAI BROTHER'S PAWAS CANNING PAWAS DIST RATNAGIRI (INDIA)

DESAI'S Vijay

Melghat Hunting Honey

INDIAN WILD BLACK HONEY
- THE GIFT OF THE FOREST -

This rare black honey,
harvested from the deep forests of India,
is collected by wild bees from plants
within a protected natural reserve.

With its bold earthy taste and herbal notes,
this 100% pure honey delivers
the true spirit of the wild in every drop.

sole Distributor of VIJAY ALPHONSO MANGO Products in Japan

SITAR Ltd.

Online Shopping　Home

Indian Restaurant SITAR

TEL 043-272-7050　FAX 043-272-7075

https://sitar.co.jp/　https://www.e-sitar.jp/　info2@sitar.co.jp

1-106-16, Kemigawa-cho, Hanamigawa-ku, Chiba 262-0023

STATE BANK OF INDIA

We offer the following services:

- Fixed deposits in USD & JPY at attractive rates.
- Remittance facilities to Individuals / Corporates / Institutional accounts with competitive Exchange rates for remittances in USD & INR
- Opening of current accounts in Japan.
- NRE/NRO account-related service.

Remittances To India

- SBI Tokyo provides remittance services in six currencies, i.e. INR, USD, GBP, EURO, JPY and Nepali Rupee at attractive exchange rates.
- Remittance services can be availed by account holders as well as walk-in customers.

ADDRESS

Tokyo Branch

Tokyo Tatemono Nihonbashi Building
4th Floor, 1-3-13 Nihonbashi
Chuo-ku, Tokyo
(B9-Exit @ Nihonbashi Station)

CONTACT DETAILS

E-mail: rem.tokyo@statebank.com
avprem.tokyo@statebank.com
Phone: 03-3517-3720/03-3517-3711

State Bank of India

With Best Wishes

Bank of India

Relationship beyond banking

Please contact us for:

1) Remittance Services

2) Deposit Services

3) Trade-related Services

4) Foreign Exchange

Tokyo	Osaka
Marunouchi Nakadori Bldg. 2-2-3, Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Phone: 03-3212-0911 e-mail: boitok@gol.com	OAK Sakaisuji Honmachi Bldg. 1-8-12, Honmachi Chuo-ku, Osaka 541-0053 Phone: 06-6261-4035 e-mail: boi.osaka@bankofindia.co.in

Please visit us at https://www.boijapan.com

ORYXPEER

Join the Future with Oryxpeer

Your Gateway to Exciting Careers in IT & Technology

Oryxpeer is a dynamic recruitment company based in Tokyo, connecting talented professionals with leading organizations worldwide. We specialize in IT, software engineering, and multilingual technical talent to power global businesses.

Positions Available

Software Engineers
AI / IoT Specialists
Bilingual Technical Interpreters
Full-Stack Developers
Cloud & Infrastructure Engineers
Project Managers

Why Join Oryxpeer?

✔ Exciting global career opportunities
✔ Work with cutting-edge technologies
✔ Bilingual & multicultural environment
✔ Support for career growth and relocation

Apply Now!

📧 info@oryxpeer.com
🌐 www.oryxpeer.com
📍 Tokyo, Japan

With Best Wishes From :

Indo Bazaar

A Complete Shopping Center

Authentic Indian Groceries Delivered Across Japan

Customer Care
090-6043-7125

Contact
Email: indobazaarjapan@gmail.com
Website : http://www.indobazaar.com

Kamata shop:
144-0052, Kamata, Ota-Ku, Tokyo 5-20-6

Indian Restaurant: Lucknow Café
Pacific Palace B1F, Miyamoto-Cho, Kawasaki-Ku
Kawasaki-Shi , Kanagawa
Tel: 044-589-5201

New Open

Indobazaar Sakuragicho
231-0064 Kanagawa , Yokohama, Naka Ward, Nogecho
3 Chome-160-4, Cheru , Noge , 1F

LUNCH BUFFET (ALL BRANCHES)

AWARDED BEST RESTAURANT IN JAPAN FOR 6 YEARS CONSECUTIVELY.

Make any occassion special with our large scale booking - Birthday, Marriage, Anniversary, Festivals and more. Ladies Day, every Tuesday. Free Lassi/Mango Lassi for Ladies.

Akasaka
3F,2-14-31
Wind Akasaka Building
Akasaka, Minato Ku,
Tokyo 107-0052
Phone-03-5797-7786

Ariake
3F,TOC Ariake Bldg
Ariake 3-5-7, Koto -ku
Tokyo 135-0063
Phone-03-6426-0651

Kamiyacho
2F, Oote Building
Toranomon 3-19-7
Minato Ku,
Tokyo 105-0001
Phone-03-3433-1217

Toranomon
B1F, Toranomon
Jitsugyo Kaikan
Toranomon 1-1-20
Minato ku ,
Tokyo 105-0001
Phone-03-5510-7875

Nirvanam Ginza
Ginza 2-4-6
Velvia Kan 7F
Chuo ku ,
Tokyo 104-0061
Phone-03-6271-0957

Nirvanam Kawagoe
UPLACE 1F, 8-1
Wakatihoncho
Kawagoe , Saitama
350-1123
Phone-0492 65 4343

Atago
Nirvanam Atago Hills
3F , Atago Green Hills
2-5-1 Atago,
Minato ku
Tokyo 105-6203
Phone-03-6403-0710

Tokyo Big Sight
2F, TFT Building
East Tower
3-6-11 Ariake , Koto Ku
Tokyo 135-0063
Phone-03-3599-531

20% OFF

nirvanam

SPECIAL DINNER DISCOUNT COUPON

- Present this coupon at any of our branches to avail the offer
- Cash payments only
- Not valid with any other offer/coupon
- 20% OFF per bill.
- To avail this offer, reservation is required.
- No reservations for Lunch.
- Valid Up to : Dec 31, 2025

HAPPY BIJOYA

DIYA

INDIAN RESTAURANT

Roppongi Hills Hillside B1 03-6438-1177

6-10-1 Roppongi, Tokyo

Tokyo Hibiya Midtown 2F 03-6550-8765

1-1-2 Yurakucho, Tokyo

May Maa Durga's Blessings Bring Peace and Harmony to All

- A well wisher

Carica Celapi

Carica is a powerful and delicious food supplement made of fermented papaya. Papaya has been called "golden tree of life" and has been a favourite substance from ancient times. Carica is produced from papaya by excellent world renowned Japanese fermentation technology.

Carica Celapi PS501 is made from unripened papayas which have been selected carefully. After taking the skin, seed and juice from the fruit without oxidation, they are fermented and ripened, then dried naturally. There is no process of extracting just one component or chemical treatment. Also there are no additives such as vitamins or calcium. The manufacturing process is natural and holistic.

a. "Carica Celapi PS-501", 100 sachets (3grams each) 26500 YEN
b. "Carica Celapi PS-501", 40 sachets (3grams each) 12500 YEN

For more information or order

0120-65-8631 (free call)

Free catalogs (in Japanese) is available

Ayurveda, Jyotish, Gandharva-veda, Amrit Kalash

Amrit, Inc. (有限会社アムリット)
〒510-0815 三重県四日市市野田1－2－23
TEL 059-340-5139 FAX 059-340-5175
E-mail: info@amrit.jp
URL: http://www.amrit.jp

アーユルヴェーダ
インド占星術
太古インド音楽
ヴェーダ天文台

Amrit, Ghee, Incenses,
Aroma oils, Herbal teas, Spices,
Ancient Indian Music CD, Books,
Indian Astrology, Ayurveda,
本物研究所代理店

KOHANA
INTERNATIONAL SCHOOL
PASSION • CREATIVITY • VALUES

ADMISSIONS OPEN

One of the BEST and MOST AFFORDABLE CAMBRIDGE SCHOOLS in JAPAN

KAWASAKI CAMPUS

- PRE SCHOOL
- GRADE 8, CAMBRIDGE IGCSE, AND A LEVELS

TSURUMI CAMPUS

- GRADES 1-7

SCHOOL FEATURES

- BENQ 75" SMART PANELS IN ALL CLASSROOMS
- CAMBRIDGE TRAINED AND EXPERIENCED TEACHERS
- ENGLISH AND JAPANESE LANGUAGE SUPPORT AVAILABLE
- EXTENDED & AFTER SCHOOL PROGRAMS
- LEARNING MANAGEMENT SYSTEM FOR ENGLISH, MATH, SCIENCE, STEM, CODING, ETC.
- UNIVERSITY AND COLLEGE PLACEMENT COUNSELLING
- E-DIGITAL LIBRARY

SCHOOL FACILITIES

- SCHOOL LIBRARY
- SCHOOL BUS AND BENTO SERVICES
- ACTIVITY AREA
- SCIENCE LABORATORY
- WELLNESS ROOM
- FUJITSU STADIUM ACTIVITIES
- MEGALOS SPORTING ACTIVITIES - TENNIS

Proud to deliver THE DUKE OF EDINBURGH'S INTERNATIONAL AWARD

BridgeU

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

IPC

TAIP

UCAS
Universities and Colleges Admissions Services

FOR MORE DETAILS

Phone
045-642-8628 Tsurumi
044-276-9494 Kawasaki

Mail
office@kohanainternationalschool.com

Website
www.kohanainternationalschool.com

BOOK A SPACE NOW

TokyoMithaiWala

Handcrafting Sweet Traditions since 2019.

www.tokyomithaiwala.jp
03-6808-0777

visit our website

SEINAN GROUP

IN 22 PREFECTURES IN JAPAN, HMI HOTEL GROUP OPERATES 41 HOTELS

HMI HOTEL GROUP

HOKKAIDO	Hotel Pearl City Sapporo
TOHOKU	Hotel Pearl City Hachinohe Hotel Pearl City Akita Kawabata, Hotel Pearl City Akita Kanto Odori, Hotel Pearl City Morioka, Hotel Pearl City Kesennuma, Hotel Kameya, Hotel Pearl City Tendo, Hotel Pearl City Sendai
KANTO	Ginza Creston, Shibuya Creston Hotel, Chofu Creston Hotel, Mikazuki sea park hotel Katsuura, Mikazuki sea park hotel Awa Kamogawa, Hotel Nankaiso
TOKAI	Hotel Ravie Kawaryo, Daisenya, Tsumagoi Resort Sai no Sato, Hotel Crown Palais Hamamatsu, Grand Hotel Hamamatsu, Mikawa Bay hills Hotel, Irago Resort & Convention Hotel Hotel Crown Palais Chiryu
HOKURIKU	Hotel Wellness Notoji
KANSAI	Hotel Heian no Mori Kyoto, Hotel Crown Palais Kobe, Hotel Pearl City Kobe
CHUGOKU	Misasa Royal Hotel, Hoseikan, Ryotei Yamanoi, Yumoto Kanko Hotel Saikyo
SHIKOKU	The Crown Palais New Hankyu Kochi
KYUSHU	Hotel Crown Palais Kitakyushu, Hotel Crown Palais Kokura, Yatsushiro Grand Hotel, Nagasaki Nisshokan, Nisshokan Shinkan Baishokaku, Nisshokan Bettei Koyotei, Hotel Kirishima Castle,
OKINAWA	Rizzan Sea-Park Hotel Tancha-Bay, Motobu Green-Park Hotel

https://hmihotelgroup.com

HOTEL MANAGEMENT INTERNATIONAL CO.,LTD.
10F Yamaman Bldg., 6-1 Nihonbashi-koami-cho, Chuo-ku,
Tokyo 103-0016, Japan

Seles Office:

Tokyo	TEL 03-5623-3008	FAX 03-5614-0376
Sendai	TEL 022-267-0821	FAX 022-262-8720
Nagoya	TEL 052-264-7671	FAX 052-249-3637
Osaka	TEL 06-6210-4145	FAX 06-6210-4146
Fukuoka	TEL 092-483-3811	FAX 092-483-3821